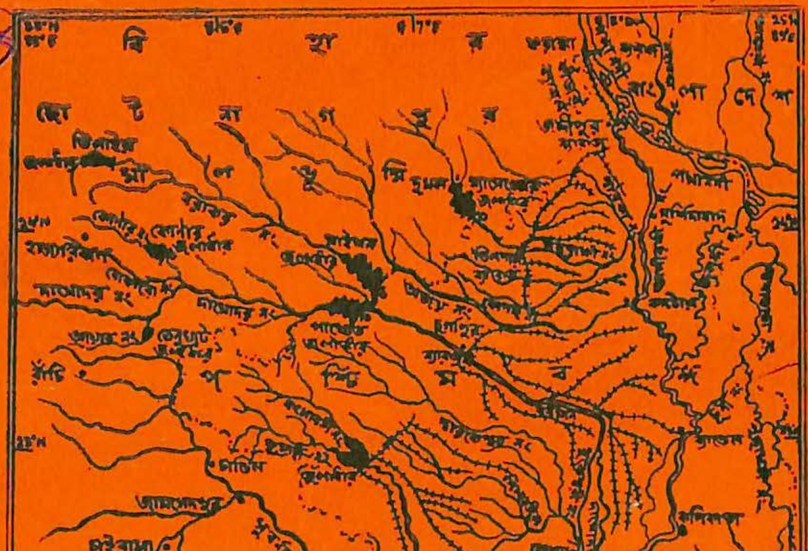
নদীবিজ্ঞানের কথা



অধ্যাপক শিবরাম বেরা

নদীবিজ্ঞানের কথা

[নদী, নদীপরিকল্পনা ও বন্যানিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা]

অধ্যাপক শিবরাম বেরা
পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা।

পরিবেশক—শরৎ বুক হাউস
18বি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700073.

প্রকাশক—শ্রীমতী ভারতী বেরা,
10 রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006.

প্রথম প্রকাশ—জানুয়ারী, 1984.

মূল্য 12 টাকা 50 পয়সা মাত্র।

মুদ্রণ—গুপ্তপ্রেশ,
37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-700009

ব্লক—ডাইনামিক প্রসেস্,
37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-700009.

গ্রন্থন—দত্ত বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্,
101 বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-700009.

নিবেদন

1978 সালের 26শে সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের নীল আকাশ হঠাৎ ঢেকে গেল কাজল-কালো মেঘে, শুরু হল অঝোর ধারায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, এভাবে তিনদিন চলল অবিরাম বৃষ্টিধারা। একে একে ডুবে যেতে লাগল কৃষকের সবুজ ক্ষেতের ফসল ; ডুবল পথঘাট, সড়ক ও রেলপথ ; ভেঙে পড়ল নদীর দু'তীরে গড়া বাঁধ ; জলস্রোতে ভেসে গেল কয়েক লক্ষ ঘরবাড়ি, গৃহপালিত পশু আর সহস্র সহস্র মানুষ। কোটি কোটি সর্বহারা গৃহহারা নিরন্ন মানুষের বুকফাটা কান্না আর চোখের জলের বন্যা মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেল বন্যার জলের সঙ্গে। এমনি করেই গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে সেদিন নেমে এসেছিল শতাব্দীর প্রবলতম প্লাবন, যে প্লাবন মনে করিয়ে দেয় পুরাণ বা বাইবেলে লিখিত মহাপ্রলয়ের কথা। দুঃস্বপ্নের মত সেই দিনগুলি আজও গ্রামবাংলার মানুষের স্মৃতিতে অমলিন হয়ে আছে।

সেই দুঃস্বপ্নের দিনে একটি কথা সবার মত আমার মনকে দোলা দিল। মনে হতে লাগল এই অভিশাপ থেকে কি কোন মুক্তি নেই ? অন্তত এই প্লাবনকে কি আমরা বহুলাংশে কমাতে পারতাম না, যদি ঐ বিপুল জলরাশিকে নদীপথ বেয়ে দ্রুততর গতিতে ও স্বল্পতর সময়ে সাগরে পৌঁছে দিতাম ? ঐ সর্বনাশা প্লাবন কি শুধু প্রকৃতির নিছক খেয়াল—যার কাছে আমরা একান্ত অসহায় ? পিছু ফিরে দেখলাম আমাদের নদী পরিকল্পনাগুলির দিকে। সেদিন নতুন করে উপলব্ধি করলাম নদীর কথা—যে নদী আমাদের অকাতরে দেয় জল, দেয় উর্বর পলি, গড়ে তোলে শস্যশ্যামল ধরিত্রীকে। সেই নদীকে কি আমরা ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছি ? আর তারই কি প্রতিক্রিয়া আজকের এই প্লাবন ? এমনি অনেক প্রশ্ন। নিজের কাছে যে উত্তর খুঁজে ফিরলাম, তারই প্রতিচ্ছবি নিয়ে লেখা আমার এই গ্রন্থ।

বর্তমানে এদেশের প্রধান বন্দর এবং পূর্বভারতের শিল্প ও সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা এমনি এক নদী হুগলীর তীরে গড়ে উঠেছে। সেই হুগলী নদী দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে বলে আমরা গঙ্গার বুকে গড়ে তুলেছি ফরাক্কা ব্যারাজ, যার সাহায্যে হুগলী নদীপথে কিছুটা গঙ্গাজল আনা সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, ঐ সামান্য জলে হুগলী নদী কি বাঁচবে, না কলিকাতা বন্দর আরও দ্রুত বিলুপ্ত হবে ? কিংবা ফরাক্কা ব্যারাজ কি গঙ্গাকে [illegible]

তবে মুক্তি কোথায় ? হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবন কিভাবে সম্ভব ? তখন মনে পড়ে সেই দূর অতীতের কথা—যখন পৃথিবীর কোন নদীপথে কোন ব্যারাজের অস্তিত্বই ছিল না, তখন ভাগীরথী-হুগলী সাবলীলভাবে বয়ে যেত কেমন করে ? আজই বা সেই পথে হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবন সম্ভব হবে না কেন ?

আমাদের নদীপরিকল্পনাগুলি প্রধানত গড়ে উঠেছে গত 50 বা 60 বৎসরের সামান্য তথ্যের ভিত্তিতে ও পরীক্ষাগারে (Laboratory-তে) নদীপথের নক্সা (Model) তৈরি করে। কিন্তু নদনদীর জীবন তো 50 বা 60 বৎসরে সীমাবদ্ধ নয় আর পরীক্ষাগারে কোন নদীর স্বাভাবিক পরিবেশ ও ব্যাপ্তির লক্ষাংশ গড়ে তোলা কখনই সম্ভব নয়। ফলে ঐ সব লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে রচিত পরিকল্পনাগুলি ভুল হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। কিন্তু যুগে যুগে নদী তার চলার পথে প্রাকৃতিক কারণে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে আর তাদের অতীত ও বর্তমান পথসকল সেইসব পরীক্ষার ফলাফল বহন করে চলেছে। সেই সব পথের চিহ্ন ধরে বৈজ্ঞানিক সূত্র দ্বারা বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনাগুলি রচিত হলে তা সঠিক হওয়া সম্ভব। এই কারণেই নদনদীর অতীত ও বর্তমান পথসকলের বিশ্লেষণই আমার সকল পরিকল্পনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছি।

বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় আংশিকভাবে জ্ঞান ও বিজ্ঞান, উৎসমানুষ, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, দৈনিক সত্যযুগ এবং আজকাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সেজন্য উক্ত পত্রিকাগুলির সম্পাদক ও কর্মীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আলোচনার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার জন্য সেগুলি একসূত্রে গ্রথিত করা আবশ্যক। তাই নিবন্ধগুলি প্রয়োজনমত সংস্কার করে ও কিছু অপ্রকাশিত নিবন্ধ নিয়ে গড়ে উঠেছে বর্তমান এই সংকলন। যে সকল গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা না হলে এ গ্রন্থটি রচনা করা সম্ভব হত না, সেগুলির উল্লেখ তথ্যসূত্রে রইল। ঐ সকল সুধী লেখকদের ও প্রকাশকদের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করছি। সর্বশ্রী রতনমোহন খাঁ, নলিনীরঞ্জন মিত্র, অমরচাঁদ দে প্রমুখ যে সকল বন্ধু-বান্ধবের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য পুস্তকটি প্রকাশ করা সম্ভব হল, তাঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

যদি এই লেখা কোনদিন বন্যায় সর্বহারা মানুষের মনে এতটুকু আশার আলো আনতে পারে, যদি কখনও তাদের সুন্দর জীবনকে প্রকৃতির রুদ্ররোষ থেকে সামান্য মুক্তি দিতে পারে, তবে বুঝব আমার চিন্তা ও স্বপ্ন বিফলে যায়নি।

1লা জানুয়ারী, 1984.
10 রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট,
ফ্ল্যাট—17, কলিকাতা-700006.

নিবেদক
শ্রীশিবরাম বেরা।

সূচীপত্র

তথ্যসূত্র

The changing Face of Bengal, Radhakamal Mukherjee, C.U., '38.
Rivers of Bengal Delta, S. C. Majumdar, C.U. '42.
বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা, কপিল ভট্টাচার্য, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, '59.
বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব (1ম), নীহাররঞ্জন রায়, সাক্ষরতা প্রকাশন, '80.
দামোদর পরিকল্পনা, চন্দ্রশেখর ঘোষ, বিশ্বভারতী, বাংলা সন 1355.
ভারতের বিদ্যুৎ সমস্যা, রবি মুখার্জি, প্রকাশক—স্বরাজ চক্রবর্তী, '78.
Eight years of D.V.C., ডি. ভি. সি.-র ইস্তাহার '56.
পশ্চিমবঙ্গে বন্যা, বারোমাস, আজকাল সমিতি, নভেম্বর '78.
বন্যা সংখ্যা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ফেব্রুয়ারী '79.
'পশ্চিমবঙ্গ' পশ্চিমবঙ্গ সরকার, 27 অক্টোবর, 3 নভেম্বর '78, 5 সেপ্টে. '80.
বিশেষ বন্যা সংখ্যা, উৎস মানুষ, জুলাই-আগস্ট '82
I.G.A. Review, No.-5, Indo German Association'79.
How to avoid Dam Failures, Science Reporter, Nov. '78.
দামোদরকে বেঁধেও রেহাই নেই কেন ? যুগান্তর, 10 অক্টোবর, '78.
ডি. ভি. সি.—কেন, আরও কী করা যায় ? আনন্দবাজার, 28 অক্টোবর '78.
হিংলো থেকে ফিরে, দেশ, 16 ডিসেম্বর '78.
গাঙ্গেয় অববাহিকায় বন্যাসমস্যা, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী '79
সেচদপ্তর অসাধ্য সাধন করেছে, সত্যযুগ, 22 জুন '79.
আটাত্তরের বন্যা ও ডি. ভি. সি.-র গোপন রিপোর্ট, পরিবর্তন, 1 আগষ্ট '79.
কলিকাতা-হলদিয়া বন্দর ও ফরাক্কা প্রকল্প, বারোমাস, আগষ্ট '78.
Farakka Barrage Project, D. Mookerjea, Proc. Inst. Civ. Engrs. London (58) I, Feb. '75
গঙ্গা হাতছাড়া হতে চলেছে, ফরাক্কাও বিপন্ন ; পরিবর্তন, 18 মার্চ '81.
ফরাক্কা বাঁধ ও ভাগীরথী প্রবাহ, বারোমাস, জুন '80.
The Withering River, Amrita Bazar, 13 Feb '81.
বাংলাদেশের সংগে গঙ্গাজল চুক্তি, আজকাল, 15-16 জানুয়ারী '82.
Exploiting the Ganga, Statesman, 14-15 June '82.
বৃহৎ জলাধার, পরিবেশ ও সস্তা শ্রমিক, আজকাল, 18-19 অক্টোবর '83.
1978 ও 1980 সালের বন্যার সময় আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্রের সংবাদ।
National Atlas of India, No. 4, 5, 15, 33, 85, 140, 295.

নদীবিজ্ঞানের কথা

প্রথম অধ্যায়

নদী ও নদীপরিকল্পনার কথা

নদীতীরে সভ্যতার বিকাশ—আমাদের এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর তিনভাগ জল ও একভাগ স্থল। সূর্য্যকিরণের প্রখর উত্তাপে মহাসাগর, সাগর, নদনদী প্রভৃতি জলাশয় থেকে যে বিপুল জলরাশি বাষ্প হয়ে নীল আকাশে ওঠে, তাই পূঞ্জীভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে। সেই মেঘরাশি বাতাসে ভাসতে ভাসতে নীলাকাশ দিয়ে এগিয়ে চলে দূরে দূরান্তরে। তারপর উপযুক্ত পরিবেশে মেঘপুঞ্জের অসংখ্য জলকণা একত্রিত হয়ে বৃষ্টিরূপে ঝরে পড়ে পৃথিবীর সর্বত্র—কখনও সাগরে, কখনও পাহাড়ে-পর্বতে, কখনও বা সমভূমিতে। পাহাড়, পর্বত, উচ্চভূমিতে যে বৃষ্টিধারা ঝড়ে পড়ে, তারই বেশীর ভাগ নদী হয়ে বয়ে চলে সমভূমির উপর দিয়ে আবার সাগরে। এইভাবে সুনীল সাগর, কালো মেঘপুঞ্জ আর রূপালী নদনদী মিলে পৃথিবীর বুকে গড়ে তোলে এক জলচক্র। কিন্তু জল ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব তো সম্ভব নয়। তাই ঐ জলচক্রের নদনদীগুলি হল স্থলভূমির জীবনের প্রধান অবলম্বন। ফলে নদীতটভূমিতে জন্ম নিয়েছে বিশাল সবুজ অরণ্য, বিস্তীর্ণ শস্যশ্যামল প্রান্তর আর মানব সভ্যতার গ্রাম ও শহর। এই নদীতটভূমিই হল পৃথিবীর শতকরা 75 ভাগ মানুষের বাসভূমি।

যুগে যুগে মানুষের সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল নদীতীরে। এশিয়া মাইনরের ইউফ্রেটিস ও তাইগ্রিস নদীদুটির অববাহিকায় সুমের সভ্যতা, আফ্রিকার নীলনদের তীরে মিশরের সভ্যতা, ভারতে সিন্ধুনদের কূলে সিন্ধুসভ্যতা ও সরস্বতী নদীতীরে বৈদিক সভ্যতা এবং হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীদুটির অঞ্চল ঘিরে চীনের আদি সভ্যতা হল এরূপ কয়েকটি উদাহরণ। আদিম যাযাবর মানুষ যে কয়টি কারণে নদীতটভূমিকে বেছে নিয়েছিল তার বসতি স্থাপনের জন্য, সেগুলি হল—(1) জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জল সেখানে সহজপ্রাপ্য ছিল। (2) নদী থেকে কৃষিকার্যের জন্য জল সহজে পাওয়া যেত। (3) নদীতটভূমির উর্বর ও নরম পলিমাটিতে প্রচুর গাছপালা জন্মাত ও স্বল্পায়াসে ফসল ফলত। (4) খাদ্য হিসাবে বিপুল পরিমাণ মাছ নদীতে পাওয়া যেত। (5) ঘরবাড়ি তৈরীর জন্য যে মাটি বা ইট ব্যবহৃত হত, তাতে নদীর পলি খুবই

উপযোগী। (6) নৌকা বা ছোট ছোট জাহাজ করে নদীপথে বা নদী থেকে সাগরপথে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের সুবিধা হত। (7) জলপথে পণ্যবহন করা সহজ ছিল বলে ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব সুবিধা হত। (8) নদীতীরবর্তী অঞ্চলের আবহাওয়া সুন্দর ও মনোরম থাকত।

এই সকল সুবিধার জন্য মানুষ তার জৈব প্রয়োজন মিটিয়ে প্রচুর অবকাশ পেত তার চিন্তা, সংস্কৃতি ও ভাবধারার প্রসারের জন্য। তাই নদীতীরে মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্ভব হয়েছিল।

নদনদীর কথা—বর্ষার কাজলকালো মেঘ থেকে যখন বৃষ্টির অবিরল ধারা পর্বতগাত্রে, মালভূমিতে বা কোন উচ্চভূমিতে ঝরে পড়ে, তখন সেই বিপুল জলরাশি পাহাড়-পর্বত বা মালভূমির গা বেয়ে অজস্র ধারায় নেমে আসে এক একটি রূপালী ঝর্ণারূপে। এরূপ শত শত ঝর্ণাধারা মিলিত হয়ে একটি নদীর জন্ম হয়। এছাড়া পর্বতশীর্ষে জমা শুভ্র তুষাররাজি যখন হিমবাহরূপে ধীরে ধীরে নেমে আসে, তখন তা জলে রূপান্তরিত হয় এবং সেই সুশীতল জলও ছুটে চলে নদীপথ বেয়ে। যেমন হিমালয়ের কোলে গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে পুণ্যসলিলা গঙ্গা এবং যমুনোত্রী হিমবাহ থেকে কৃষ্ণসলিলা যমুনা নদী উৎপন্ন হয়েছে। আবার কখনও সুবিশাল এক হ্রদের সঞ্চিত জল থেকে নদীর উৎপত্তি হতে পারে। যেমন মানস সরোবর হল সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র নদদুটির উৎসস্বরূপ। তবু মনে রাখা দরকার হিমবাহের তুষারগলা জল বা হ্রদের সঞ্চিত জল নদীপথ বেয়ে নেমে এলেও বর্ষার প্রবল বর্ষণের পর যে বিপুল জলরাশি বন্যারূপে নদীতে নেমে আসে, সেই বন্যাই নদীকে সৃষ্টি করে থাকে চিরকাল।

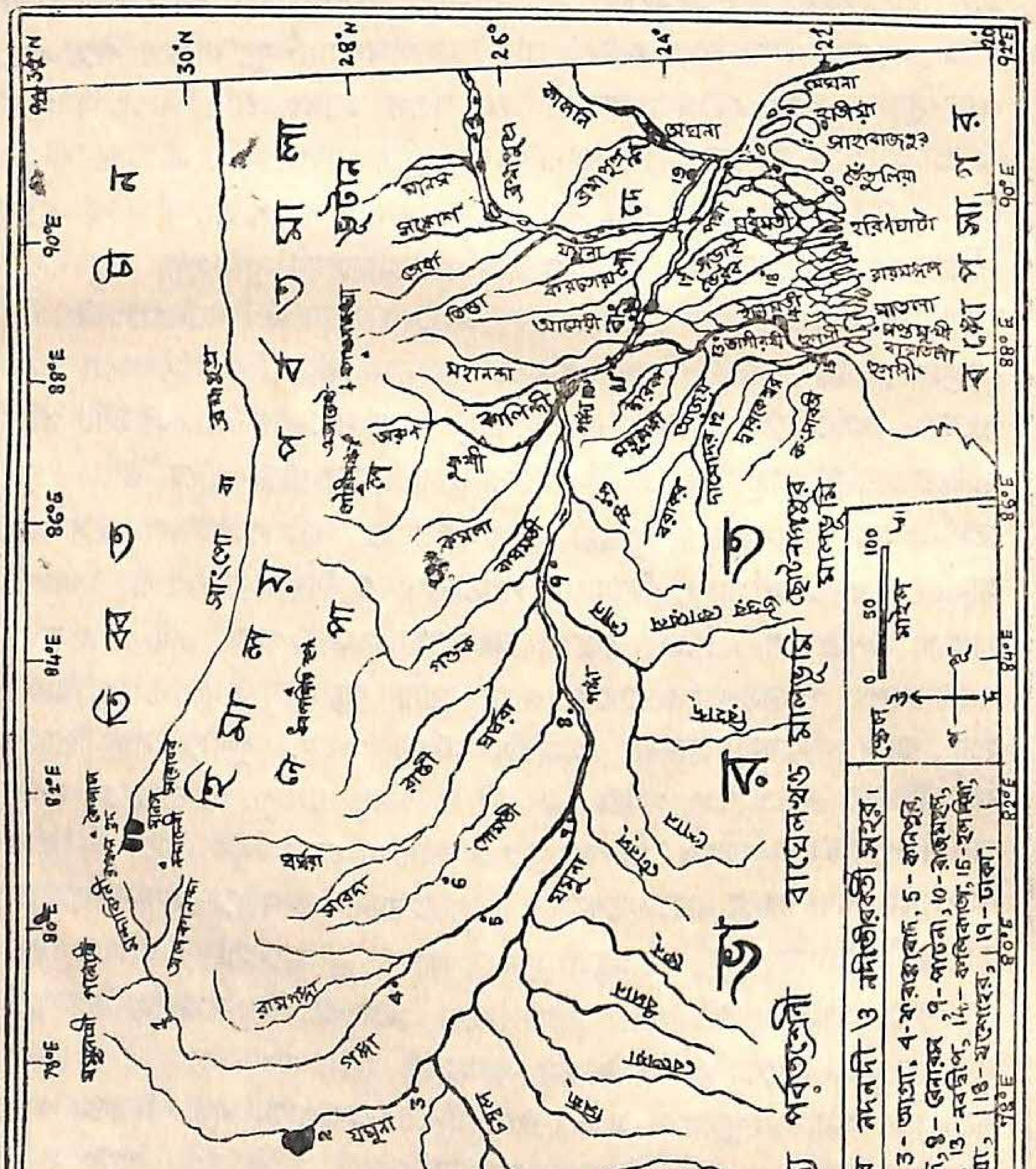
নদীর উচ্চ-প্রবাহ—অসংখ্য চঞ্চলা ঝর্ণা নিয়ে যখন একটি নদীর সৃষ্টি হয়, তখন তার পাহাড়ী পথে ঢাল খুব বেশী থাকায় সে এগিয়ে চলে সুতীব্র গতিতে। নদী তার পথের উপর পড়ে থাকা অজস্র শিলা, উপলখণ্ড, বালুকারাশি, গাছপালা প্রভৃতি সব কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে প্রবল স্রোতে। নদীখাতের সংগে, জলের সংগে আর পরস্পরের সংগে সংঘর্ষে ঐ সব শিলা, উপলখণ্ড ক্ষয়প্রাপ্ত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে থাকে। কখনও বা পাহাড়ী ধস নেমে নদীপথে বাধার সৃষ্টি হয়, আবার সেই বাধা ভেঙে নদী এগিয়ে চলে। বৃষ্টি আর জলস্রোতে তখন পাহাড়ের কোলে কোলে চলে শুধু ভাঙার খেলা। এখানে নদী কখনও ঝরঝর শব্দে দশদিক মুখরিত করে, কখনও বা প্রচণ্ড গর্জনে ঝরে পড়ে জলপ্রপাতরূপে আবার কখনও বা কুলুকুলু শব্দে অজস্র শিলা-ছড়ানো পথের উপর ছুটে চলে। তাই এই উচ্চ-প্রবাহে নদী নাব্য নয়। সে পাহাড়ের মধ্যেকার নিম্নভূমি দিয়ে একটি সুগভীর খাত সৃষ্টি করে প্রবল গতিতে এগিয়ে চলে সমভূমির দিকে আর নদীর সেই খাত সাধারণত অপরিবর্তিত থাকে যুগ যুগ

ধরে। গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে হিমালয়ের কোলে অবস্থিত হরিদ্বার পর্যন্ত গঙ্গার এই উচ্চ-প্রবাহ। এই উচ্চপ্রবাহে বহু খরস্রোতা পাহাড়ী নদী এসে মূল-নদীকে পুষ্ট করে থাকে। যেমন মন্দাকিনী, অলকানন্দা প্রভৃতি নদীগুলি উচ্চ-প্রবাহে গঙ্গার সংগে মিলিত হয়েছে।

নদীর মধ্য-প্রবাহ—পাহাড়-পর্বত ও মালভূমি থেকে নেমে এসে নদী বয়ে চলে বহু সহস্র বৎসর আগে তারই পলিতে গড়ে ওঠা প্রায় সমতল উপত্যকা দিয়ে। নদী উপত্যকার মাইল প্রতি ঢাল যখন 5 ফুটের চেয়ে কমে যায়, তখন সুরু হয় নদীর এই মধ্যপ্রবাহ। এই অংশে জলের গতি কমে যাওয়ায় উচ্চপ্রবাহ থেকে নদীস্রোতে বয়ে আসা পাথর, নুড়ি, বালি প্রভৃতি নদীগর্ভে সঞ্চিত হয়। আবার যখন প্রবল বন্যা নেমে আসে, তখন ঐ সব পাথর, নুড়ি ও বালি এগিয়ে চলে জলস্রোতে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে রূপান্তরিত হয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুকণায়। নদীর জলে মিশে থাকা রাসায়নিক ও জৈব পদার্থের সংমিশ্রণে ঐ মিহি বালুকণা অতি উর্বর পলিতে পরিণত হয় এবং সেই পলি নদীর জলে মিশে থাকে। বর্ষায় হঠাৎ নেমে আসা বন্যাগুলি প্লাবন ডেকে এনে ঐ উর্বর পলি ছড়িয়ে দেয় দু'তীরভূমিতে, তারই ফলে সমভূমি যেমন ধীরে ধীরে উন্নত হয়, তেমনি হয় শস্যশ্যামল। এমনিভাবে মধ্যপ্রবাহে নদীপথে কখনও চলে ক্ষয়, আবার কখনও সঞ্চয়। হিমালয় পর্বতমালা ও বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণীর মধ্যকার গাঙ্গেয় উপত্যকায় হরিদ্বার থেকে রাজমহল পর্যন্ত গঙ্গার এই মধ্যপ্রবাহ। আশেপাশের পাহাড়-পর্বত থেকে নেমে আসা বহু নদনদী মূলনদীতে মিলিত হয়ে থাকে। যেমন যমুনা, গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কুশী, শোন প্রভৃতি নদনদী হল মধ্যপ্রবাহে গঙ্গার উপনদী। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি যে সকল নদনদী তুষারগলা জলে কিংবা হ্রদের সঞ্চিত জলে পুষ্ট থাকে, তারা মধ্যপ্রবাহে সারা বৎসর নাব্য থাকে। কিন্তু অন্যান্য নদনদী, যেমন দামোদর, কংসাবতী ইত্যাদি শুধু বর্ষাকালে নাব্য থাকে ঐ অংশে। মধ্যপ্রবাহে নদী বহু দূরে অবস্থিত দুই পার্বত্যভূমির মধ্যে গড়ে ওঠা প্রায় সমভূমি দিয়ে ছুটে চলে বলে বড় ধরণের খাত পরিবর্তন সাধারণত হয় না। তবে তার চলার পথে গড়ে ওঠা বাঁকগুলিকে সরল করে নিয়ে ছোটখাটো খাত পরিবর্তন করে থাকে মাঝে মাঝে। এরই ফলে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ সৃষ্টি হয়ে থাকে নদীর এই মধ্য সমভূমিতে।

নদীর নিম্ন প্রবাহ—নদী পাহাড় থেকে যতই সাগরের দিকে এগিয়ে চলে, নদী-উপত্যকার মাইল প্রতি ঢাল ততই কমতে থাকে। এভাবে যখন মাইল প্রতি ঢাল প্রায় 6 ইঞ্চিতে নেমে আসে, তখনই সুরু হয় নদীর নিম্ন-প্রবাহ। নদীর মধ্যপ্রবাহে সৃষ্ট অতি উর্বর পলি এই নিম্নপ্রবাহে বন্যার সময় দু'কূল

প্লাবিত করে ছড়িয়ে পড়ে দু'তীরভূমিতে আর অন্য সময় ঐ পলি নদীগর্ভে সঞ্চিত হয়। এই নিম্নপ্রবাহে নদীর নিজস্ব খাতে চলে পর্যায়ক্রমে সঞ্চয় ও ক্ষয়, কিন্তু তীরভূমিতে বা প্লাবনভূমিতে চলে শুধু সঞ্চয়। নদীর এই পলি খুবই উর্বর ও অতি নরম থাকায় নদী তীরবর্তীভূমিতে স্বল্পায়াসে প্রচুর ফসল ফলে।



অবশ্য মাঝে মাঝে প্লাবনের ফলে বিপুল ক্ষতিও হয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাগীরথীর উৎসস্থান থেকে গঙ্গার নিম্নপ্রবাহ আরম্ভ এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের গাঙ্গেয় উপত্যকা প্রধানত গঙ্গার নিম্নপ্রবাহে সঞ্চিত পলি দ্বারা গঠিত। এখানে কালিন্দী, মহানন্দা, আত্রেয়ী, করতোয়া, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা প্রভৃতি উত্তর থেকে এসে গঙ্গা বা পদ্মাবক্ষে তাদের বিপুল জলরাশি ঢেলে দিয়েছে, অন্যদিকে গঙ্গা বা পদ্মাও অজস্র ধারায় বিভক্ত হয়ে সেই বিপুল জলরাশি নিয়ে ছুটে চলেছে বঙ্গোপসাগরের পানে। এইরূপে ভাগীরথী, জলঙ্গী, মাথাভাঙা, গড়াই, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি গঙ্গার অজস্র শাখা-প্রশাখা গড়ে উঠছে। নিম্নপ্রবাহের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হল, এর মাইল প্রতি ঢাল 6 ইঞ্চির কম থাকায় নদী-উপত্যকাটি প্রায় অনুভূমিক (Nearly horizontal) হয়ে ওঠে। ফলে ঢালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নদী শুধু যে বিভিন্ন দিকে বয়ে যেতে পারে তাই নয়, এই সমভূমি অতি নরম পলির দ্বারা গঠিত হওয়ায় নদী সহজেই হানাপথ কেটে নিতে পারে। সেই কারণে নদী যেমন অজস্র শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দিতে পারে, তেমনি নদী ও তার শাখা-প্রশাখাগুলি সহজেই খাত পরিবর্তিত করতে পারে। ফলে এখানে নিয়তই নদনদীর জন্ম-মৃত্যু চলতে থাকে। এখানে মাইল প্রতি ঢাল 6 ইঞ্চির কম হাওয়ায় ঢাল নদীর জলে নতুন গতি সঞ্চার করে না বললেই চলে। ফলে উচ্চ ও মধ্য-প্রবাহ থেকে যে গতি নিয়ে নদী বয়ে আসে, সেই অর্জিত গতিই নদীর চলার সবচেয়ে বড় পাথেয় হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই উচ্চ ও মধ্য-প্রবাহে জলের অর্জিত গতিকে যতদূর সম্ভব বজায় রাখাই নদীর নিম্নপ্রবাহকে গড়ে তোলার উপায়। [দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত] এছাড়া উচ্চ ও মধ্যপ্রবাহে লব্ধ গতি যদি কোন শাখানদীতে সঞ্চারিত না হয়, তবে সেই শাখানদীটি দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে। এইভাবে গত কয়েক শতাব্দীতে ভাগীরথী, ভৈরব, জলঙ্গী, মাথাভাঙা প্রভৃতি গঙ্গার শাখানদীগুলি যেমন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, অন্যদিকে গড়াই-মধুমতী ও কীর্তিনাশা পদ্মার খাত নতুন করে জন্মলাভ করেছে। [ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত]

নদীর **ব-দ্বীপ প্রবাহ**—নদী যখন সাগরে এসে মেশে, তখন তার বিপুল জলরাশির সঙ্গে পলির একাংশ সাগরে ঢেলে দেয়। জলের গতি স্তিমিত হয়ে এই পলি নদীমুখ বা মোহানার কাছে সাগরের বুকে জমা হতে থাকে। ফলে নদী-মোহানায় সাগরবক্ষ ক্রমাগত ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে পড়ে এবং অবশেষে একটি নতুন দ্বীপের জন্ম হয়। নদী তখন ঐ দ্বীপটির দু'পাশ দিয়ে তার জলধারা বইয়ে দেয় এবং দ্বীপটি দেখতে একটি মাত্রাহীন 'ব'-এর মত হয়। মোহানার সন্নিকটে নদীর এই প্রবাহকে 'ব-দ্বীপ প্রবাহ' বলা যেতে পারে। এই ব-দ্বীপ প্রবাহে মাইল প্রতি ঢাল 3 ইঞ্চির কম থাকায় নদী নিয়তই তার পথ

পরিবর্তিত করে। এছাড়া নিম্নপ্রবাহ থেকে নদী বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে অজস্র ধারায় সাগরে এসে পতিত হয় বলে সাগর-উপকূলে নদনদীগুলির মোহানায় এরূপ বহু ব-দ্বীপের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। হুগলী মোহানা থেকে মেঘনা মোহানা পর্যন্ত বিশাল সুন্দরবন এলাকা গঙ্গানদীর বদ্বীপ অঞ্চল। সমুদ্র থেকে স্থলভাগ সৃজিত হওয়ার সময় সমুদ্রের কিছু অংশ সম্পূর্ণ ভরাট না হয়ে স্থলভাগের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত রয়ে যায়, আর সমুদ্রের ঐ অংশগুলিকে খাড়ি (Estuary) বলা হয়। গঙ্গার এই ব-দ্বীপ অঞ্চল অজস্র খাড়িতে বিভক্ত এবং এগুলি প্রধানত বর্তমান বা অতীত কোন নদীর মোহানা। এই খাড়িগুলি গড়ে ওঠার পিছনে যেমন নদীপথে নেমে আসা বন্যার ভূমিকা আছে, ঠিক তেমনি জোয়ার-ভাঁটার এক বিশেষ ভূমিকা আছে। [ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত] যদি নিম্নপ্রবাহে কোন অংশে শাখানদীর মৃত্যু ঘটে, তবে সেই অংশে খাড়িগুলিও দ্রুত মজে যায়। ফলে একদিকে গঠনকার্য ও অন্যদিকে জলনিকাশী ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ায় ঐ অঞ্চলটি অস্বাস্থ্যকর জলাভূমিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন হুগলী, মাতলা, বিদ্যাধরী, ইছামতী প্রভৃতি নদনদীগুলি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলায় পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ-পরগণা জেলায় গঙ্গার বদ্বীপ অঞ্চল ধীরে ধীরে জলাভূমিতে পরিণত হতে চলেছে। এখানে মনে রাখা দরকার, সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার প্রভাবে খাড়িগুলি সারা বৎসর নাব্য থাকে।

নদীর উপকূল-প্রবাহ—নদনদীর জলপ্রবাহ তার ব-দ্বীপ অঞ্চলে এসে সম্পূর্ণ থেমে যায় না, সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এই প্রবাহ বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে চলে। ফলে মোহানার নিকট পলি জমা হয়ে বদ্বীপ গড়ে তুললেও নদীর জলে বয়ে আসা রাসায়নিক ও জৈব পদার্থগুলি নদী-মোহানার নিকট সাগর উপকূলে নানা ধরণের প্লাঙ্কটন (Plankton) জন্মাতে সাহায্য করে, যা মাছের প্রধান খাদ্য। তাই সমুদ্রের মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে নদী-মোহানার কাছে ছুটে আসে খাদ্যের সন্ধানে বিশেষত বর্ষাকালে। এছাড়া রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি কার্পজাতীয় (Carp) মাছ বর্ষাকালে নদীর ঢলের বিপরীতে ছুটে চলে তাদের ডিম ছাড়ার জন্য। সুস্বাদু ইলিশ মাছও বর্ষাকালে খাদ্যের আশায় সাগর থেকে উঠে আসে নদীতে। এভাবে প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাদ্য মাছের বংশবৃদ্ধি ও উৎপাদনে নদনদীগুলি এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। আজ ঐ সকল মাছের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য নদীবক্ষে গড়ে তোলা জলাধারগুলি অনেকাংশে দায়ী।

এখানে উল্লেখ করা দরকার নদীর উচ্চপ্রবাহে জলের গতি প্রবল থাকায় বিস্তারের তুলনায় নদীখাত হয় গভীর। মধ্যপ্রবাহে নদীতে জলের গতি কমে যাওয়ায় নদীখাত যত না গভীর হয়, তার চেয়ে অধিক হয় তার বিস্তার।

নিম্নপ্রবাহে জলের গতি আরও কমে যাওয়ায় গভীরতার তুলনায় নদীখাত খুবই বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এতে বোঝা যায় যে, জলের তীব্র গতি নদীখাতকে গভীর করতে সাহায্য করে।

পশ্চিমবঙ্গের নদনদী—আমাদের এই বঙ্গভূমি নদীমাতৃক দেশ। এই দেশের শস্যশ্যামল ভূ-ভাগের অধিকাংশ নদনদীর পলি জমে সুনীল সাগর থেকে উঠে এসেছে শত সহস্র বৎসর ধরে। তারপর নদনদীগুলি তাকে মায়ের মত লালন করেছে। ঐ সকল নদনদী আমাদের জল দিয়েছে, অন্ন দিয়েছে, সম্পদ দিয়েছে। তাই নদীকে আমরা মায়ের মত ভালোবেসেছি। নদীকে নিয়ে আমাদের কত গান, কত কথা, কত গাথা। নদীতীরের তীর্থে তীর্থে আমাদের দেবতার দেউল। নদীর জল আমাদের কাছে পুন্যসলিল, সর্বপাপহর। নদীপথ বেয়ে আমাদের দূর দূরান্তরে পাড়ি, সাগরযাত্রা এবং বাণিজ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রসার। এই নদীগুলি আমাদের যেমন দিয়েছে অনেক, আবার তেমনি কখনও বা সর্বনাশা প্লাবন ডেকে এনে সবকিছুই ধ্বংস করেছে। তবুও এই নদীই আমাদের সকল প্রাণশক্তির উৎস।

যে নদীটিকে আমাদের বঙ্গভূমি তথা আর্যাবর্তের প্রাণধারা বলা চলে তা হল গঙ্গা-পদ্মা। বঙ্গভূমির অন্য প্রায় সব নদীই এই গঙ্গা-পদ্মায় এসে মিলিত হয়েছে অথবা গঙ্গা-পদ্মা থেকে বহির্গত হয়ে সাগরে পতিত হয়েছে। হিমালয় পর্বতমালা আর বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী প্রায় 3 লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত এক সুবিশাল ভূভাগে যে বৃষ্টির জল ঝরে পড়ে, তা এই গঙ্গা-পদ্মা দিয়েই বয়ে আসে ; অর্থাৎ গঙ্গা-পদ্মার আবহক্ষেত্র হল 3 লক্ষ বর্গমাইল। এছাড়া হিমালয়ের উত্তরে তিব্বত-চীন ও ভারতের পূর্বাঞ্চল থেকে আরও 3 লক্ষ বর্গমাইল এলাকার জল ব্রহ্মপুত্র-যমুনার পথ বেয়ে শেষ পর্যন্ত এই গঙ্গা-পদ্মাতেই এসে পড়ে। সেই গঙ্গা-পদ্মা বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যাঞ্চলে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার সীমানা দিয়ে বয়ে চলেছে বাংলাদেশে আর পশ্চিমবঙ্গকে উত্তর ও দক্ষিণ দু'ভাগে বিভক্ত করেছে।

এরপর দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যভাগ দিয়ে তার দুতীরভূমিকে শস্যশ্যামল করে বয়ে চলেছে ঐ গঙ্গা-পদ্মার শাখানদী ভাগীরথী-হুগলী। এই ভাগীরথীকে দূর অতীতে গঙ্গার প্রধান ধারা ছিল বলে অনেকেই অনুমান করেন। এই ভাগীরথী-হুগলীর তীরে কলিকাতা বন্দর ও তার শিল্পাঞ্চল শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, সমগ্র পূর্বভারতের প্রাণকেন্দ্র। বিহারের ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে যে সকল নদী ভাগীরথী-হুগলীতে এসে মিলিত হয়েছে, তারা হল যথাক্রমে ব্রাহ্মণী-ময়ূরাক্ষী-বক্রেশ্বরসহ দ্বারকা নদী, কুনুরসহ অজয়, বরাকরসহ দামোদর,

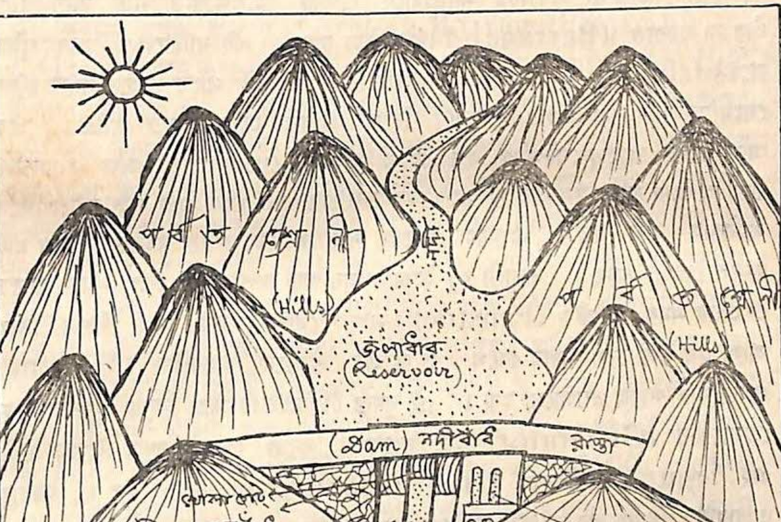
দ্বারকেশ্বর-শিলাবতীসহ রূপনারায়ণ, কংসাবতী-কালিয়াঘাইসহ হলদী নদী। [মানচিত্র দ্রষ্টব্য] এদের মধ্যে দামোদরের আবহক্ষেত্র সবচেয়ে বেশী। [যে বিস্তীর্ণ ভূভাগের জল এসে কোন নদীতে পতিত হয়, সেই ভূভাগকে নদীটির আবহক্ষেত্র বলে।] এই দামোদরের তীরে রয়েছে কয়লা ও লৌহ আকর-সমৃদ্ধ অঞ্চল। ফলে সেখানে গড়ে উঠেছে দুর্গাপুর ও আসানসোলের শিল্পাঞ্চল, যাকে ভারতের রূঢ় (Ruhr) আখ্যা দেওয়া যায়। [রূঢ় হল পশ্চিম জার্মানীর বৃহত্তম শিল্পাঞ্চল।] এছাড়া ময়ূরাক্ষী, দামোদর ও কংসাবতী নদী-পরিকল্পনায় ঐসব নদীতে বা তাদের উপনদীতে অনেকগুলি জলাধার নির্মিত হয়েছে, যে জলাধারের সঞ্চিত জল সেচ, বিদ্যুত-উৎপাদন, শিল্পে জল সরবরাহ, মৎস্য চাষ প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পূর্বদিক থেকে গঙ্গার শাখানদী জলঙ্গী আর মাথাভাঙার একাংশ চূর্ণী এসে মিশেছে ভাগীরথীতে। এছাড়া ভাগীরথীর অধুনালুপ্ত শাখানদী আদিগঙ্গা, যমুনা-বিদ্যাধরী প্রভৃতির দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল চব্বিশ-পরগণা জেলার ব-দ্বীপ অঞ্চলের নদনদী—যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মাতলা, পিয়ালী, গোসাবা ও সপ্তমুখী। তাছাড়া মাথাভাঙার অন্য অংশ ইছামতী-কালিন্দী কখনও পশ্চিমবঙ্গ, কখনও বা বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। উত্তরবঙ্গের নদনদীগুলি প্রধানত হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কোনটা পদ্মায়, কোনটা ব্রহ্মপুত্রে এসে পড়েছে। এখানে পদ্মার উপনদীগুলির মধ্যে কালিন্দী, নাগর-পুর্ণভবাসহ মহানন্দা আর আত্রেয়ী প্রধান এবং তিস্তা, ধরলা, তোর্ষা, সঙ্কোশ হল ব্রহ্মপুত্রের উপনদী। এসব নদীর মধ্যে তিস্তাই প্রধান।

এখানে মনে রাখা দরকার নদী কোন রাস্ত্র বা দেশের সীমা মেনে চলে না। তাই নদনদীর আলোচনায় প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের নদনদী নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন দেখা দেবে এবং সেই আলোচনা ষষ্ঠ অধ্যায়ে করা হবে। আজ ভারত ও বাংলাদেশ আলাদা রাষ্ট্র হলেও পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ তো একই নদনদীর দান একথা ভুললে চলবে না। ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও উত্তরবঙ্গের নদীগুলি ছাড়া বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য নদনদী হল যমুনা, করতোয়া, মেঘনা, ধলেশ্বরী, গড়াই, মধুমতী, ভুবনেশ্বর ও ভৈরব।

বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা—বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে নদনদীকে মানুষের কল্যাণে লাগাবার জন্য যে নতুন চিন্তাধারার উদ্ভব হয়েছে, তারই ফলশ্রুতি হল বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় নদীর উচ্চপ্রবাহে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে নদীর উপর খুব উঁচু এক আড়াআড়ি বাঁধ বা ড্যাম (Dam) নির্মাণ করা হয়। ফলে

ঐ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী নদী-উপত্যকায় বিপুল পরিমাণ জল সঞ্চিত রাখা হয় বর্ষাকালে, অর্থাৎ বিশাল হ্রদের ন্যায় একটি জলাধার (Reservoir) গড়ে ওঠে। ঐ নদীবাঁধে বা ড্যামে অনেকগুলি স্লুইস্ (Sluice) থাকে যেগুলি ইচ্ছামত খোলা বা বন্ধ করা যেতে পারে ঘোরানো কপাট বা রিভলভিং



~: একটি বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার চিত্ররূপ :~

গেটের (Revolving gate) সাহায্যে অথবা খাড়া ওঠা-নামা করতে পারে এরূপ কপাট বা স্লুইস্-গেটের (Sluice-gate) সাহায্যে। নদীবাঁধের গেটগুলি খুলে বা বন্ধ করে জলাধার থেকে প্রয়োজনমত জল নীচের নদীপথে

ছেড়ে দেওয়া হয়। এভাবে একদিকে জলাধারে জল ধরে রেখে বর্ষায় নেমে আসা হঠাৎ বন্যা (discharge) নিয়ন্ত্রিত করা হয়, অন্যদিকে বর্ষাকালে জলাধারে সঞ্চিত জল নানা কাজে লাগানো হয়। বর্ষার সময় ও পরে জলাধার থেকে নদীপথে ছেড়ে দেওয়া জল যাতে সরাসরি সাগরে চলে যেতে না পারে, সেজন্য নদীটির মধ্যপ্রবাহে একটি অপেক্ষাকৃত নীচু আড়াআড়ি বাঁধ বা ব্যারাজ (Barrage) নির্মাণ করা হয়। এই ব্যারাজেও অনেকগুলি স্লুইস্ (sluice) ও স্লুইস্-গেট (sluice-gate) থাকে, যাতে বর্ষায় হঠাৎ নেমে আসা বিপুল জলরাশি নদী দিয়ে সাগরে চলে যেতে পারে। তবে অন্য সময় স্লুইস্-গেটগুলি বন্ধ রেখে জলাধার থেকে ছাড়া জল ব্যারাজের ঊর্ধে আটকে রাখা হয় এবং দু'পাশে কাটানো সেচখাল পথে সেই জল কৃষিজমিতে সরবরাহ করা হয়। এভাবে সেচের সাহায্যে চাষ করায় বৎসরে দু'তিন বার ফসল তোলা সম্ভব। এছাড়া বহু উঁচুতে অবস্থিত জলাধারের জল নীচে ছেড়ে দেওয়ার সময় পেনস্টক (Penstock) নামক মোটা নলের মধ্যে দিয়ে নিয়ে আসা হয় উচ্চ চাপ বজায় রেখে এবং জলের শক্তিকে টারবাইন (Turbine) ঘোরানোর কাজে লাগানো হয়। ঐ ঘুরন্ত টারবাইনের সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম জেনারেটর (Generator) যুক্ত থাকে। ফলে প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই বিদ্যুৎকে জলবিদ্যুৎ (Hydro-electricity) বলা হয়। আবার জলাধার ও ব্যারাজের মধ্যবর্তী নদীপথে সারা বৎসর জলপ্রবাহ বজায় রাখা হয়। সেজন্য ঐসব অঞ্চলে নদীতীরে গড়ে ওঠা শিল্পে বা সহরে জল সরবরাহ করা যায় কিংবা জলপথে পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। এগুলি ছাড়া জলাধারের সঞ্চিত জলে মৎস্য চাষ করা যেতে পারে। সব মিলিয়ে বহুমুখী নদীপরিকল্পনার সুফলগুলি হল—(1) বন্যা নিয়ন্ত্রণ (2) সেচ ব্যবস্থা (3) বিদ্যুৎ-উৎপাদন (4) শিল্পে বা সহরে জল সরবরাহ (5) জলপথ পরিবহন ও (6) মৎস্য চাষ।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, জলাধারগুলির দ্বারা বন্যানিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে এদের ব্যবহারের মধ্যে একটা বিরোধ থেকে গেছে। যেমন বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য জলাধারগুলি যতদূর সম্ভব খালি রাখা একান্ত প্রয়োজন; আবার সেচের জল, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও মৎস্যচাষ প্রভৃতির জন্য জলাধারগুলি ভরে নেওয়া আবশ্যক। এছাড়া জলাধারগুলির দ্বারা বন্যাকে (Discharge) নিয়ন্ত্রণ করার ফলে নদীখাতের বিপুল ক্ষতি হয়। কাজেই বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা যদি নদীসংস্কারের মত অন্য ব্যবস্থা [দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত] গ্রহণ করি, তাহলে জলাধারগুলির পূর্ণ ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে বহুগুণ সুফল পাওয়া সম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গের নদীপরিকল্পনা—আমাদের পশ্চিমবঙ্গে রূপায়িত নদী-পরিকল্পনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—(1) দামোদর উপত্যকা প্রকল্প (Damodar Valley Project), (2) ময়ূরাক্ষী প্রকল্প (Mayurakhshi Project), (3) কংসাবতী প্রকল্প (Kansabati Project), (4) তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্প (Tista Barrage Project) ও (5) ফরাক্কা ব্যারাজ প্রকল্প (Farakka Barrage Project)।

(1) দামোদর উপত্যকা সংস্থা বা ডি. ভি. সি. গঠিত হয় 1948 খৃস্টাব্দের 7ই জুলাই। দামোদর নদের ভয়াবহ বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ, ঐ উপত্যকায় সেচের জল সরবরাহ, দুর্গাপুর, আসানসোল, বোকারো প্রভৃতি বিরাট এক শিল্পাঞ্চলে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। দামোদর নদ বিহারের পালামৌ জেলার ছোটনাগপুর মালভূমির 3,450 ফুট উঁচু খামারপত শৃঙ্গ থেকে প্রস্রবণরূপে নেমে এসেছে। তারপর আয়ার, বোকারো, কোণার, বরাকর প্রভৃতি নদনদীগুলির সঙ্গে মিলিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। এই নদ বর্ধমান জেলার শক্তিগড় পর্যন্ত পূর্বমুখী বয়ে এসে হঠাৎ দক্ষিণমুখী পথে হুগলী ও হাওড়া জেলার মধ্য দিয়ে এসে ফলতার অপর পারে ভাণ্ডারদহ নামক স্থানে হুগলী নদীতে পড়েছে। নদটির দৈর্ঘ্য প্রায় 370 মাইল এবং আবহক্ষেত্র 9000 বর্গমাইল, যার মধ্যে 7500 বর্গমাইলই হল পার্বত্য অঞ্চল। ঐ পার্বত্য অঞ্চলে হঠাৎ প্রচুর বৃষ্টি হলে যে বিপুল জলরাশি নেমে আসে, তা নিম্ন-উপত্যকায় সর্বনাশা প্লাবন ডেকে আনে। এজন্য দামোদরকে পশ্চিমবঙ্গের দুঃখের নদ বলে অভিহিত করা হত। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনায় প্রথমে দামোদর ও তার উপনদীগুলিতে আটটি জলাধার নির্মাণ করার কথা ছিল, যাদের মোট জলধারণ ক্ষমতা 45 লক্ষ একরফুট। [1 একর জমির উপর 1 ফুট গভীর জল দাঁড়ালে যতটা জল হয়, তাকে 1 একরফুট বলে।] ঐ জলধারণ ক্ষমতার মধ্যে 29 লক্ষ একর-ফুট বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে স্থির হয়। [বন্যানিয়ন্ত্রণে সংরক্ষিত অঞ্চল বলতে জলাধারের সেই অংশটি বুঝায়, যা সাধারণত খালি রাখা থাকবে। শুধু হঠাৎ প্রবল বৃষ্টি হলে ঐ অংশ জলে ভরে বন্যাকে নিয়ন্ত্রিত করা হবে এবং আকাশ পরিষ্কার হলে ঐ অংশের জল ছেড়ে দেওয়া হবে জলাধারটিকে পরবর্তী বন্যার জন্য খালি রাখতে।]

কিন্তু পরবর্তীকালে দামোদর উপত্যকা প্রকল্পে চারটি বাঁধে চারটি জলাধার নির্মিত হয়। বাঁধগুলি হল 1953 সালে নির্মিত বরাকর নদের উপর 1180 ফুট দীর্ঘ ও 100 ফুট উঁচু তিলাইয়া বাঁধ, 1955 নির্মিত কোণার নদের উপর 14,600 ফুট দীর্ঘ ও 155 ফুট উঁচু কোনার বাঁধ,

1957 সালে নির্মিত বরাকর নদের উপর 15,600 ফুট দীর্ঘ ও 300 ফুট উঁচু মাইথন বাঁধ এবং 1959 সালে নির্মিত দামোদর নদের উপর 21,800 ফুট দীর্ঘ ও 275 ফুট উঁচু পাঞ্চেত বাঁধ। তিলাইয়া, কোণার, মাইথন ও পাঞ্চেত বাঁধগুলির উর্ধাংশে নদী-উপত্যকায় যে বিশাল জলাধার বা হ্রদ গড়ে ওঠে, তাদের উপরিতলের আয়তন যথাক্রমে 23, 10, 41 ও 59 বর্গমাইল। তিলাইয়া ও কোণার বিহারে এবং মাইথন ও পাঞ্চেত পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সীমান্তে অবস্থিত। প্রধান দুটি জলাধার মাইথন ও পাঞ্চেতে যে পার্বত্য-অঞ্চলের জল নেমে আসে বা ওদের আবহক্ষেত্র, তা হল 2400 বর্গমাইল ও 4200 বর্গমাইল। মাইথন বাঁধে জলনির্গমণের 12টি গেট আছে, যাদের সাহায্যে জলতল 65 ফুট পর্যন্ত ওঠানামা করা যায়। অনুরূপভাবে পাঞ্চেত বাঁধের 13টি গেট দিয়ে জলাধারের জলতল 57 ফুট পর্যন্ত পরিবর্তিত করা যায়। ঐ সব গেটগুলির প্রত্যেকটির জলনির্গমন ক্ষমতা 50,000 কিউসেকের কাছাকাছি, অর্থাৎ প্রতিটি গেট দিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে 50,000 ঘনফুট হারে জল বের করা সম্ভব। ডি. ভি. সি-র উল্লিখিত চারটি জলাধারের ব্যবহারযোগ্য [গেটের নিম্নাংশে জলাধারে (Dead Storage area) সঞ্চিত জল ব্যবহার করা যায় না।] মোট জলধারণ ক্ষমতা 29·4 লক্ষ একরফুটের মধ্যে 15 লক্ষ একরফুট বন্যানিয়ন্ত্রণে সংরক্ষিত রাখার কথা। কিন্তু মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধারদুটির জন্য যে 100 বর্গমাইল নিমজ্জিত করা প্রয়োজন, তার মধ্যে 28 বর্গমাইল এলাকা অধিগ্রহণ ও লোক অপসারণ না হওয়ায় মাইথন জলাধারের উপরাংশে 5 ফুট ও পাঞ্চেত জলাধারের উপরাংশে 20 ফুট সর্বদা খালি রাখতে হয়। ফলে জলাধারগুলির বর্ত্তমান জলধারণ-ক্ষমতা 22 লক্ষ একরফুটের মধ্যে বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য 10·5 লক্ষ একরফুট সংরক্ষিত রাখা হয়। ডিসেম্বর 1979 সালের একটি খবরে বলা হয় যে, 13 কোটি টাকা ব্যয়ে 76টি গ্রামের লোক অপসারণ করে জলাধার দুটির পূর্ণ ক্ষমতা কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা হবে এবং বন্যানিয়ন্ত্রণে 15 লক্ষ একর ফুট অংশে সংরক্ষিত থাকবে ভবিষ্যতে। অবশ্য এই অধিগ্রহণের ফলে কয়েকটি কয়লাখনি ডুবে যাবে এবং সিন্ধ্রি সার কারখানা বিপন্ন হবে, যা অভিপ্রেত নয়।

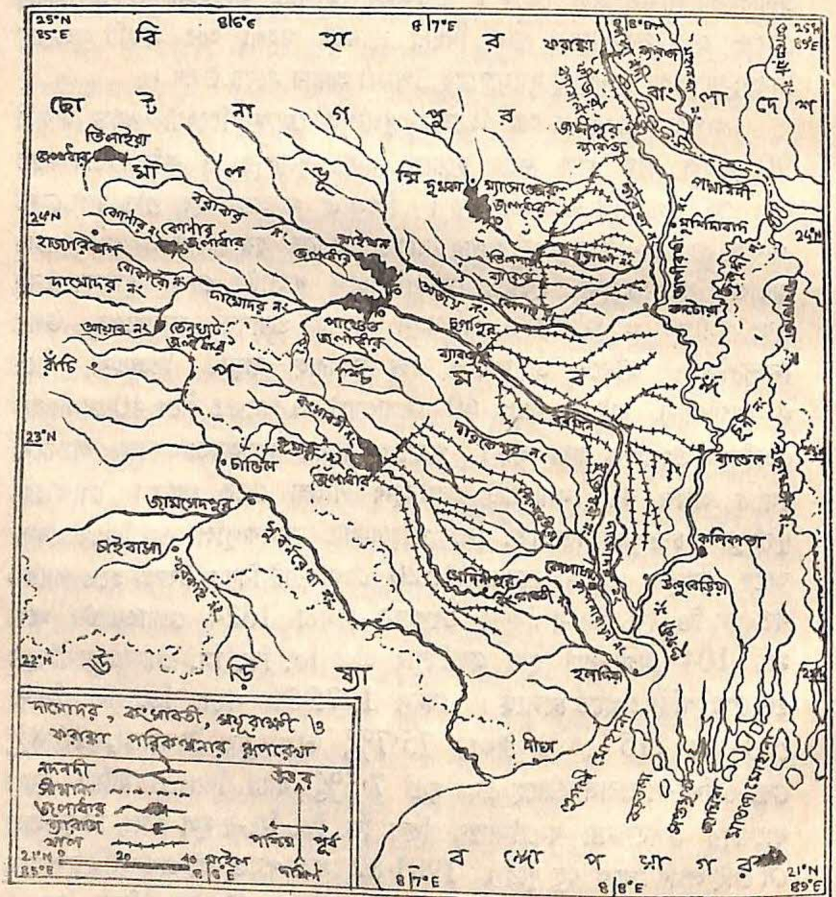
কৃষিজমিতে ও শিল্পে জলসরবরাহের জন্য 1955 সালে বর্ধমান জেলায় দুর্গাপুরে 2260 ফুট দীর্ঘ ও 36 ফুট উঁচু একটি ব্যারাজ নির্মিত হয় দামোদরের উপর। বর্ষাকালের অতিরিক্ত জল নির্গমনের জন্য ব্যারাজে 16 ফুট থেকে 19 ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট 34টি স্লুইস-গেট আছে, যাদের প্রত্যেকটির বিস্তার 60 ফুট। জলাধারগুলি থেকে নেমে আসা জল দুর্গাপুর ব্যারাজে আটকে রেখে তার দু'পাশে কাটানো বহু শাখা-প্রশাখাযুক্ত

1550 মাইল দীর্ঘ সেচখালের সাহায্যে বর্ধমান, বাঁকুড়া ও হুগলী জেলায় 3·8 লক্ষ হেক্টর [1 হেক্টর=2·47 একর=7·3 বিঘা] জমিতে সেচের জল দেওয়া হয়। এছাড়া দামোদরের দু'তীরবর্তী বিহারের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের কয়লাখনি অঞ্চলে, দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে, বিভিন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ও বহু শহরে সারা বৎসর জল সরবরাহ করা হয় ঐসব জলাধারের সঞ্চিত জল থেকে। বোকারো ইস্পাত কারখানা ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে জল সরবরাহের জন্য বিহার সরকার অবশ্য আর একটি জলাধার নির্মাণ করেছেন তেনুঘাটে দামোদরের উপনদী আয়ার নদের উপর।

জলপথ পরিবহনের অঙ্গ হিসেবে দুর্গাপুর থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত একটি 90 মাইল দীর্ঘ খাল কাটা হয়েছে, যাতে দুর্গাপুর ও কলিকাতার মধ্যে জলপথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। কিন্তু ঐ খালের মাইল প্রতি ঢাল বেশী থাকায় এতে 24টি লক্‌গেট রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। ফলে নৌ-চলাচল অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ হওয়ায় নৌ-পরিবহনে খালটির কোন ভূমিকা নেই এবং দুর্গাপুর ও কলিকাতা পরিবহন ব্যবস্থা প্রধানত স্থলপথের উপর নির্ভরশীল। জমিতে ও শিল্পে জল সরবরাহ ছাড়াও তিলাইয়া বাঁধে 4 মেগাওয়াট, মাইথন বাঁধে 60 মেগাওয়াট ও পাঞ্চেত বাঁধে 40 মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। পাঞ্চেত বাঁধের পূর্ণক্ষমতা কাজে লাগানো গেলে আরও 40 মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে। বোকারো, দুর্গাপুর ও চন্দ্রপুরায় ডি. ভি. সি. পরিচালিত অনেকগুলি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে, যেগুলি থেকে সর্বোচ্চ 1520 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে। বর্তমানে ডি. ভি. সি.-র বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা 1624 মেগাওয়াটের মধ্যে মাত্র 104 মেগাওয়াট হল জলবিদ্যুৎ এবং ডি. ভি. সি. প্রধানত তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পে পরিণত হতে চলেছে। যেমন 1975-76 সালে ডি. ভি. সি.-র মোট ব্যয় 215 কোটি টাকার 75·7% তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে, 16·8% সেচ ও শিল্পে জলসরবরাহে এবং মাত্র 7·5% বন্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যয়িত হয়। দামোদর উপত্যকায় বন্যানিয়ন্ত্রণ ছিল ডি. ভি. সি.-র মূল লক্ষ্য, কিন্তু আজ সে সেই লক্ষ্য থেকে বহু দূরে। 1981-82 সাল পর্যন্ত এই প্রকল্পটি রূপায়নে খরচ হয়েছিল 540 কোটি টাকা, যার মধ্যে 120 কোটি টাকা ছিল বিদেশী সাহায্য।

(2) পশ্চিমবঙ্গে নদী-পরিকল্পনাগুলির মধ্যে ময়ূরাক্ষী প্রকল্প প্রথমে রূপায়িত হয়। ময়ূরাক্ষী নদী বিহারের সাঁওতাল-পরগণার রাজমহল পাহাড়ের পশ্চিমাংশে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণমুখী পথে বীরভূম জেলায় পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে এবং পরে পূর্বদিকে বয়ে দ্বারকা নদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

এই মিলিত ধারা প্রায় 30 মাইল ভাগীরথীর সমান্তরাল দক্ষিণমুখী পথে চলে কান্দী শহরের কাছে ভাগীরথীতে পড়েছে। উত্তর থেকে ব্রাহ্মণী ও দ্বারকা এবং দক্ষিণ থেকে কোপাই ও বক্রেশ্বর এসে মিশেছে ময়ূরাক্ষীতে। এই প্রকল্পে বীরভূম জেলায় তিলপাড়ায় 1000 ফুট দীর্ঘ একটি ব্যারাজ নির্মিত হয় 1951 সালে ময়ূরাক্ষী নদীর উপর। পরে কানাডা সরকারের



সাহায্যে বিহারে মেসেঞ্জোরে 2160 ফুট দীর্ঘ ও 155 ফুট উঁচু কানাডা বাঁধ নির্মিত হয় 1955 সালে। ঐ বাঁধের আড়ালে 26 বর্গমাইল পরিমিত 5 লক্ষ একরফুট জলধারণক্ষমতাসহ একটি জলাধার গড়ে ওঠে, যার আবহক্ষেত্র 720 বর্গমাইল। কানাডা বাঁধে জলনির্গমনের 21টি গেট আছে। জলাধার থেকে ময়ূরাক্ষী নদীতে নেমে আসা জল 1013 ফুট দীর্ঘ তিলপাড়া

ব্যারাজে আটকে শাখা-প্রশাখাযুক্ত 1050 মাইল দীর্ঘ সেচখাল পথে পাঠানো হয়। ফলে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া জেলার 2·3 লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের জল দেওয়া হয়। সেচখালগুলি ছোট ছোট ব্যারাজের সাহায্যে ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, বক্রেশ্বর ও কোপাই নদী অতিক্রম করে গেছে দূর দূরান্তরে সবুজ ফসল ফলাতে। সেচের জল ছাড়াও কানাডা বাঁধের জল থেকে 4 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই প্রকল্পে 21 কোটি টাকা ব্যয়িত হয়।

(3) কংসাবতী নদী পুরুলিয়া জেলায় পশ্চিমাংশের উচ্চ মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে বাঁকুড়া জেলার মধ্য দিয়ে দক্ষিণমুখী পথে নেমে এসেছে। পরে মেদিনীপুরের কাছ থেকে পূর্বমুখী পথে 35 মাইল চলার পর আবার দক্ষিণমুখী হয়ে কালিয়াঘাই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে হলদী নামে পতিত হয়েছে হুগলী নদীতে বর্তমান হলদিয়া বন্দরের কাছে। এর প্রধান উপনদী হল কুমারী নদী। কংসাবতী প্রকল্পে কুমারী ও কংসাবতী নদীদু'টির সংযোগস্থলে বাঁকুড়া জেলার মুকুটমণিপুরে 135 ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট 4 মাইল দীর্ঘ বাঁধ নির্মিত হয়, যার উজানে ঐ দু'টি নদীবক্ষে 48 বর্গমাইল একটি জলাধার গড়ে ওঠে, যাতে 8·4 লক্ষ একরফুট জল ধরে রাখা যায়। উক্ত বাঁধের আবহক্ষেত্র 1400 বর্গমাইল। ঐ জলাধারে সঞ্চিত জলে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলায় 2·4 লক্ষ হেক্টর জমিতে বর্তমানে সেচের জল দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে এই প্রকল্পে 3·4 লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হবে। এই প্রকল্পে খরচ পড়ে 64 কোটি টাকা। এখানে উল্লেখ করা দরকার ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী প্রকল্পে বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য কোন অংশ সংরক্ষিত রাখা হয়নি। তবে কংসাবতী জলাধারে 2 লক্ষ একরফুট বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য রাখার কথা বর্তমানে বিবেচনাধীন।

1977-78 সালে উপরোপ্ত তিনটি বৃহৎ প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গে খরিফ মরশুমে 7·7 লক্ষ হেক্টর, রবি মরশুমে 33 হাজার হেক্টর ও বোরো মরশুমে 67 হাজার হেক্টর জমিতে সেচের জল দেওয়া হয়। এই সকল নদীপরিকল্পনা রূপায়নের ফলে ঐ সময় পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজমির শতকরা 30 ভাগ সেচের আওতায় আসে। সেচ ছাড়াও উন্নত ধরণের বীজ ও সারের প্রয়োগে দেশে সংঘটিত হয় সবুজ বিপ্লব। যেমন 1951-52 খৃস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে ধান ও গমের উৎপাদন ছিল 35 লক্ষ টন ও 40 হাজার টন, সেখানে 1975-76 খৃস্টাব্দে ধান ও গমের উৎপাদন দাঁড়ায় যথাক্রমে 69 লক্ষ টন ও 10 লক্ষ টন। এই কৃষি বিপ্লব আমাদের দেশের অন্নসমস্যার সমাধানে সাহায্য করেছে।

(4) বর্তমানে উত্তরবঙ্গে তিস্তা প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে। হিমালয়ের তুষাররাজ্যের গহনকোণে অবস্থিত কোন এক অজানা হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে তিস্তানদী সিকিমের মধ্য দিয়ে এক গভীর গিরিখাত কেটে নেমে এসেছে পশ্চিমবঙ্গে। হিমালয় থেকে নেমে আসা অনেক পাহাড়ী নদী যথা রঙ্গিত, রংপো, রিলি, রইং, সেবক এসে মিশেছে এই তিস্তাতে। দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে তিস্তা বাংলাদেশে এবং শেষে ব্রহ্মপুত্র নদে মিলিত হয়েছে। দু'শ বৎসর আগে অবশ্য তিস্তা নিম্নাংশে তিনটি ধারায় যথা পুর্ণভবা, আত্রেয়ী ও করতোয়ায় বয়ে যেত পদ্মায় মিলিত হতে। তিস্তা প্রকল্পের কাজ শুরু হয় 1976 খৃস্টাব্দে। এই প্রকল্পে জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তাবাজারের নিকট গাজলডোবায় 45টি স্লুইস্‌গেট-বিশিষ্ট একটি ব্যারাজ নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হতে চলেছে। এর দুপাশে কাটানো মোট 2,300 মাইল দীর্ঘ অসংখ্য খাল দিয়ে উত্তরবঙ্গের চারটি জেলার যথা জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর মালদহ ও কোচবিহারের 9·2 লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের জল দেওয়া সম্ভব হবে। তিস্তা প্রকল্পের 190 মাইল দীর্ঘ মূল খাল ব্যারাজের সাহায্যে মহানন্দা ছাড়াও উত্তরবঙ্গের কয়েকটি নদীকে পার হতে হবে। এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের প্রথম স্তরের প্রথম উপস্তরে খরচ পড়বে 217 কোটি টাকা, যাতে 3·0 লক্ষ হেক্টর ভূমিতে সেচের সুবিধা দেওয়া যাবে। তিস্তা ও মহানন্দা ব্যারাজ দুটি প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। খাল কাটার কাজ চলছে। এ প্রকল্পে 67·5 মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। যেহেতু তিস্তানদী সারা বৎসরই হিমালয়ের তুষারগলা জলে পুষ্ট থাকে, সেহেতু এই প্রকল্পে জলাধারের আবশ্যক হয়নি।

উত্তরবঙ্গে দার্জিলিঙ সহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কাগ্‌ঝোরার জল থেকে কিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। জাপানের সহযোগিতায় জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে বর্তমানে 18 মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, ভবিষ্যতে আরও 9 মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন আরও একটি টারবাইন ও জেনারেটর বসবে এখানে। এছাড়া রম্মাম [তিস্তার উপনদী রঞ্জিত, তার উপনদী রম্মাম।] জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে 4টি 12·5 মেগাওয়াট টারবাইন বসানোর কাজ চলছে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে উত্তরবঙ্গের নদীগুলি থেকে 1325 মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে পারে বলে একটি সমীক্ষায় জানা যায়। কিন্তু এ যাবৎ ঐ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিশেষ কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নি।

(5) আমাদের সবচেয়ে বিচিত্র নদী-পরিকল্পনা হল ফরাক্কা ব্যারাজ প্রকল্প। এই প্রকল্পে ফরাক্কায় গঙ্গার উপর 156 কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ব্যারাজ নির্মিত হয় 1970 খৃষ্টাব্দে। তারপর 26 মাইল দীর্ঘ ফরাক্কা-

জঙ্গীপুর ফীডার ক্যানাল দিয়ে অবিরাম 40 কিউসেক জলপ্রবাহ বইয়ে দেওয়া হয় ভাগীরথীতে 1975 খৃস্টাব্দ থেকে। [সেকেণ্ড 1 ঘনফুট জল বয়ে গেলে প্রবাহমাত্রা 1 কিউসেক বলা হয়] সেই জল যাতে আবার ভাগীরথী থেকে পদ্মায় ফিরে না যায়, সেজন্য জঙ্গীপুরে ভাগীরথীর উপর অপর একটি ব্যারাজ নির্মাণ করা হয়। সমগ্র প্রকল্পে 200 কোটি টাকার মত খরচ হয়। এই প্রকল্পের সাহায্যে 40 হাজার কিউসেক গঙ্গাজল ভাগীরথীতে বইয়ে দিয়ে হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবন করে কলিকাতা ও হলদিয়া বন্দরকে রক্ষা করা যাবে বলে দাবী করা হয়। এ প্রকল্প সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হবে চতুর্থ অধ্যায়ে। [তিস্তা ও ফরাক্কা প্রকল্পের মানচিত্র চতুর্থ অধ্যায়ে]

উল্লিখিত পরিকল্পনাগুলি ছাড়া বর্তমানে যে সব নদীপরিকল্পনা রূপায়নের কাজ আরম্ভ হয়েছে বা নতুন করে রচিত হচ্ছে, সেগুলি হল—(1) সুন্দরবন উন্নয়ন প্রকল্প (Sundarban Developement Scheme)—অসংখ্য নদনদী, খাল ও খাড়িতে ভরা সুন্দরবন অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা জোয়ারের সময় সাগরের লবণাক্ত জলে ডুবে যায় এবং জমি চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ে। সেজন্য ঐ সব নদনদী ও খালের দু'পাড়ে বাঁধ দিয়ে নোনা জমি উদ্ধার করে কৃষিকার্য ও মৎসচাষের উপযোগী করা হবে। এতে খরচ হবে 32 কোটি টাকা। বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় এই প্রকল্প রূপায়িত হবে। এছাড়া সুন্দরবন অঞ্চলের কয়েকটি খাল ও নদী সংস্কার করে একটি নাব্য জলপথ গড়ে তোলা হবে কাকদ্বীপ থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত 12 কোটি টাকা ব্যয়ে। (2) উচ্চ তিস্তা প্রকল্প (upper Tista Project)—এই পরিকল্পনায় সিকিমের সন্নিকটে হিমালয়ের কোলে দার্জিলিং জেলায় সেবকের কাছে এলখোলায় তিস্তানদীর উপর 700 ফুট উঁচু একটি বাঁধ নির্মিত হবে। বহু উচ্চে অবস্থিত ঐ জলাধারের জলের প্রবল চাপকে কাজে লাগিয়ে একদিকে যেমন 600 মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হবে, অন্যদিকে অতিরিক্ত 3 লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের সুবিধা দেওয়া যাবে, এতে খরচ পড়বে 600 কোটি টাকার মত। (3) উচ্চ কংসাবতী প্রকল্প (upper Kansabati Project)—এই প্রকল্পে পুরুলিয়া জেলার মানবাজারে কংসাবতীর উচ্চ প্রবাহে 28 কোটি টাকা ব্যয়ে একটি জলাধার নির্মিত হবে যাতে পুরুলিয়া জেলার 45 হাজার হেক্টর জমিতে সেচের সুবিধা দেওয়া হবে। (4) সুবর্ণরেখা প্রকল্প (Subarnarekha Project)—এই পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্যদুটি উপকৃত হবে। এতে বিহারে চাণ্ডিলের নিকট সুবর্ণরেখায় একটি ও চাইবাসায় সুবর্ণরেখার উপনদী খরকাইতে একটি জলাধার নির্মিত হবে। এছাড়া দুটি ব্যারাজ নির্মিত হবে, যার

একটি হবে পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলায় ভোসরাঘাটে সুবর্ণরেখা নদীর উপর। সমগ্র প্রকল্পের অনুমিত ব্যয় 360 কোটি টাকা। এতে পশ্চিমবঙ্গে ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে 90 হাজার হেক্টর জমিতে জলসেচ দেওয়া যাবে। এছাড়া শিলাবতী প্রকল্পে মেদিনীপুর জেলায় 20 হাজার হেক্টর, দ্বারকেশ্বর জলাধার প্রকল্পে বাঁকুড়া জেলায় 56 হাজার হেক্টর ও টাঙন ভ্যালী প্রকল্পে পশ্চিমদিনাজপুরে 45 হাজার হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা হবে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নদীসংস্কার প্রকল্প—নানা কারণে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নদীখাত দ্রুত মজে যাওয়ায় জলনিকাশী ব্যবস্থা ও বন্যানিয়ন্ত্রণের যে অসুবিধা দেখা দিয়েছে, তাতে নদীসংস্কারের যে সকল পরিকল্পনা রচিত হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল—(1) ঘাটাল মাষ্টার প্ল্যান (Ghatal Master Plan) – মেদিনীপুর জেলায় কংসাবতী নদী তার খাত পরিত্যাগ করে বর্তমানে নতুন কংসাবতী ও শিলাবতীর পথ ধরে রূপনারায়ণে এসে পড়ছে এবং ঘাটাল শহর ও অঞ্চলকে বারবার প্লাবিত করছে। সেজন্য কংসাবতী ও নতুন কংসাবতীর সংযোগ স্থলে একটি ব্যারাজ নির্মাণ করে এবং কংসাবতীর পুরানো খাত সংস্কার করে ঐ নদীর বন্যার জল উভয় খাতে সামঞ্জস্য-পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের অনুমিত ব্যয় 49 কোটি টাকা। (2) নিম্ন দামোদর নিকাশী প্রকল্প (Lower Damodar Drainage Scheme)—বর্তমানে দামোদরের মূল প্রবাহ হুগলী জেলায় মুণ্ডেশ্বরীর পথ ধরে রূপনারায়ণে পতিত হচ্ছে এবং হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার ব্যাপক অঞ্চলে বন্যার কারণ হয়ে উঠেছে। দামোদরের বন্যার জল যাতে দ্রুত নেমে যেতে পারে, সেজন্য মুণ্ডেশ্বরী ও রূপনারায়ণের খাতকে সংস্কার করা হবে এবং এদের পাড়বাঁধ (Embankment) মজবুত করা হবে প্রায় 40 কোটি টাকা ব্যয়ে। (3) কান্দী মাষ্টার প্ল্যান (Kandi Master Plan)—মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দী মহকুমা অঞ্চলকে ময়ূরাক্ষী ও তার উপনদীগুলি বন্যার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য ঐ সকল নদীর খাতকে গভীর করা হবে। এতে খরচ পড়বে 51 কোটি টাকার মত। (4) কুন্তী বেসিন নিকাশী প্রকল্প (Kunti Basin Drainage Scheme)—হুগলী জেলায় ঘিয়া, কুন্তী বা সরস্বতী নদীর মজা খাতকে পুনরুদ্ধার করা হবে জলনিকাশী ব্যবস্থার জন্য। এতে খরচ হবে 6 কোটি টাকা। (5) যমুনা বেসিন নিকাশী প্রকল্প (Jamuna Basin Drainage Scheme) নদীয়া জেলায় ভাগীরথীর শাখানদী যমুনা এককালে বিশাল নদী ছিল। এখন সে নদীর চিহ্ন প্রায় নেই। ফলে ঐ অঞ্চলের জলনিকাশী ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে। এই প্রকল্পে প্রাচীন যমুনা নদীর খাতকে সংস্কার করা হবে

6·5 কোটি টাকা ব্যয়ে। (6) হাওড়া জেলায় দামোদর যেখানে হুগলী নদীতে পড়েছে, সেখানে 2 কোটি টাকা ব্যয়ে 48 কপাটের একটি স্লুইস নির্মিত হয়েছে। কিন্তু দামোদর এতই মজে গেছে যে এ স্লুইস্ কোন কাজে লাগে নি। এটা একটা সেতুরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। (7) গঙ্গা বেসিন প্রকল্প ও গঙ্গা ভাঙনরোধ প্রকল্প—ফরাক্কা ব্যারাজের উর্ধাংশে গঙ্গার খাত দ্রুত ভরাট হয়ে যাচ্ছে পলি জমে এবং ব্যারাজের বামতীরের অর্ধেক স্লুইস্-গেট অকেজো হয়ে পড়ছে। নদীকে তার স্বাভাবিক খাতে ফিরিয়ে আনতে যে বিশাল চর কাটতে হবে তাতে প্রায় 45 কোটি টাকা ব্যয়িত হবে। এছাড়া ফরাক্কা ব্যারাজের উজানে বামতীরে ও ভাঁটিতে ডানতীরে গঙ্গা ক্রমাগত ভাঙন সৃষ্টি করে নতুন পথে চলে যেতে চাইছে। গঙ্গার এই ভাঙনরোধের জন্য নদীর পাড়বাঁধ পাথর ও কংক্রীট দিয়ে গড়ে তোলা হবে 294 কোটি টাকা ব্যয়ে। লক্ষ্যণীয় যে ফরাক্কা ব্যারাজের উঁচু কংক্রীট ভিতের জন্য গঙ্গানদী তার খাতকে পরিবর্তিত করে চলেছে এবং ঐ ভাঙন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। বিষয়টি আলোচিত হবে চতুর্থ অধ্যায়ে। (8) হুগলী নদী ড্রেজিং প্রকল্প (Hooghly Dredging Scheme)—ফরাক্কা প্রকল্প রূপায়িত হওয়া সত্ত্বেও হুগলী নদীকে জাহাজ চলাচলের উপযোগী রাখার জন্য নদীকে ড্রেজিং বা তলকর্ষণ করতে হয়। এ বাবদ প্রতি বৎসর 10 কোটি টাকার মত ব্যয়িত হয়। কিন্তু তবুও হুগলী নদীর গভীরতা দ্রুত কম যাচ্ছে। ফলে কলিকাতা বন্দরে বড় জাহাজ আসতে পারছে না, এমন কি হলদিয়া বন্দরে জাহাজ-চলাচলের পথের গভীরতা (Navigable Depth) 40 ফুট থেকে কমে 28 ফুটে এসে দাঁড়িয়েছে গত 18 বৎসরে। ঐ গভীরতাকে 36 ফুটে পরিণত করার জন্য জাহাজ-চলাচলের পথকে ড্রেজিং করতে হবে আনুমানিক 30 কোটি টাকা ব্যয়ে। আমাদের নদীপরিকল্পনার ফলে বিভিন্ন নদীখাতের যে বিরাট ক্ষতি হয়েছে, তা সাময়িকভাবে কাটিয়ে ওঠার জন্য উপরোক্ত নদী সংস্কার প্রকল্পগুলি রচিত হয়েছে। কিন্তু নদীখাতের সামগ্রিক উন্নতির জন্য নদনদী সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন।

নদীপরিকল্পনা রচনাকালে বিবেচ্য বিষয়সমূহ—আমাদের নদী-পরিকল্পনাগুলি রূপায়নের ফলে বৎসরের পর বৎসর আমরা বিপুল পরিমাণ শস্য ও সম্পদ লাভ করেছি। কিন্তু প্রকৃতির উপর ঐ হস্তক্ষেপের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তা ঠিকমত বিবেচিত না হওয়ায় আমরা ডেকে এনেছি নদনদীর মৃত্যু, কলিকাতা ও হলদিয়া বন্দরের ধ্বংস আর প্রলয়ঙ্কর প্লাবনের ফলে সমগ্র নদী-উপত্যকার বিনাশ। নদীপরিকল্পনা রচনাকালে যে বিষয়গুলি বিশেষভাবে বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল, সেগুলি হল—(1) বর্ষায় নেমে

আসা হঠাৎ বন্যাগুলিই নদীকে সৃষ্টি করে, তুষারগলা জল বা হ্রদের সঞ্চিত জলের প্রবাহ নয়। (2) যেহেতু নদীর উচ্চ ও মধ্য প্রবাহে নেমে আসা বন্যার তীব্র গতি নদীকে সজীব ও প্রাণবন্ত রাখে, সেহেতু বিবেচনা না করে উচ্চ বা মধ্যপ্রবাহে বন্যাকে নিয়ন্ত্রণের অর্থই হল নিম্নপ্রবাহে নদীর মৃত্যু। এভাবে জলাধারগুলির দ্বারা দামোদরের বন্যানিয়ন্ত্রণ শুধু যে দামোদর নদের ক্ষতি করেছে তাই নয়, হুগলী নদীর মোহানা ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠেছে। ফলে একদিকে স্বল্প বৃষ্টিতে নিম্ন উপত্যকা প্রবল প্লাবনের কবলে পড়ছে, অন্যদিকে কলিকাতা ও হলদিয়া বন্দর দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। (3) অতীতে জোয়ারের সময় নদীজলের সঙ্গে বিপুল পরিমাণ পলি সুন্দরবনের বদ্বীপ অঞ্চলের জমিতে সারা বৎসর ধরে ছড়িয়ে পড়ত, আজ সেই সব জমি বাঁধ (Dyke) দিয়ে ঘিরে নেওয়ায় ঐ পলি হুগলী মোহানাসহ সুন্দরবনের খাড়িগুলিকে দ্রুত ভরাট করে দিচ্ছে। (4) আমাদের হিমালয় পর্বতশ্রেণী ভঙ্গিল পাললিক শিলা ও বিন্ধ্য পর্বতমালা ক্ষয়িষ্ণু প্রাচীন শিলা দ্বারা গঠিত। আবার এদেশে মুষলধারায় বৃষ্টি সেই শিলাকে দ্রুত ক্ষয় করে বলে ভারতের উত্তরাঞ্চলের নদনদীতে বিপুল পরিমাণ পলি আসে। (5) জলাধার ও ব্যারাজ মধ্যপ্রবাহে জলের গতি স্তব্ধ করে সেই পলি ঝরিয়ে দিয়ে দ্রুত নদীখাত ভরাট করতে সাহায্য করে। এতে জলাধারগুলি যেমন মজে যাচ্ছে, তেমনি ব্যারাজের উজানে অর্থাৎ ব্যারাজ-পণ্ডে (Barrage Pond) জমা পলি বিপদের কারণ হয়ে উঠছে। ভবিষ্যতে ব্যারাজ-পণ্ডে জমা বিশাল চরের জন্য সেখানে প্রয়োজনীয় জল নির্গমন করা সম্ভব হবে না। ফলে পথকে পরিবর্তিত করে নদী এক বিশাল অঞ্চল ধ্বংস করে দেবে। (6) আমাদের দেশে এক একটি নিম্নচাপ হঠাৎ বিপুল পরিমাণ বৃষ্টি ঝরিয়ে দিতে পারে, যাতে ড্যাম কিংবা ব্যারাজের সর্বোচ্চ জলনির্গমন ক্ষমতার [ড্যাম ও ব্যারাজের সকল গেট সম্পূর্ণ খুলে দিলে প্রতি সেকেণ্ডে যে জল বাহির হতে পারে, তাকেই সর্বোচ্চ জলনির্গমন ক্ষমতা বলে।] অতিরিক্ত জল এসে ড্যাম বা ব্যারাজ-সংলগ্ন বাঁধ ভেঙে মুহূর্তে বিশাল এলাকা প্লাবিত করতে পারে। (7) প্রলয়ঙ্কর প্লাবন রোধে জলাধারগুলির ক্ষমতা অতি সীমিত এবং নদীখাতের সামগ্রিক উৎকর্ষসাধনই প্লাবনকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। কিন্তু নদীখাতের উন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থা পরিকল্পনাকালে নেওয়া হয়নি। (8) নদীর দু'তীরে গড়ে তোলা সমান্তরাল বাঁধগুলি (Embankment) নদীখাতে দ্রুতহারে পলি জমতে সাহায্য করে, যে পলি ছোটখাটো প্লাবনের ফলে প্রতি বৎসর দু'তীরভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে নদীকে গভীর রাখত অতীতে। (9) নদীর অতীত ও বর্তমান পথের বিশ্লেষণই নদীর পথ চলার উপযুক্ত পরিবেশের সন্ধান দিতে পারে।

নদীবিজ্ঞানের কথা

দ্বিতীয় অধ্যায়

বন্যানিয়ন্ত্রণে পরিকল্পিত নদীসংস্কার

সূচনা—1978 খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে, তথা সারা উত্তর ভারতে যে প্রলয়ঙ্কর প্লাবন হয়ে গেল, যে বিপুল পরিমাণ শস্য ও সম্পত্তির ক্ষতি হল ও শত শত জীবনহানি ঘটল* তাতে স্বভাবতই ভবিষ্যতে প্লাবন-নিয়ন্ত্রণে নতুন পথের সন্ধান করা একান্ত কর্তব্য। বর্তমান অধ্যায়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। প্লাবনের মূল কারণ অবশ্য প্রচুর বৃষ্টিপাত। তাই উত্তর ভারতে বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করব।

মে-জুন থেকে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পর্যন্ত জলীয় বাষ্পপূর্ণ মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে সমগ্র উত্তর ভারতে বৃষ্টি হয়। ঐ সময় বেশ কয়েকটি নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড় বঙ্গোপসাগর থেকে উত্থিত হয়ে হঠাৎ এক একটি অঞ্চলের উপর প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। 1978 সালে নিম্নচাপগুলির ফলে প্রথমে উত্তর ভারতে ও পরে পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। 1977 সালে হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশে ও তামিলনাড়ুতে। এদের নিয়ন্ত্রণের কোন পথ জানা নেই। কাজেই এই বৃষ্টিকে মেনে নিয়েই প্লাবন-নিয়ন্ত্রণের দুটি পথ সম্পর্কে আলোচনা করব—(1) জলাধার নির্মাণ করে বাড়তি জল ধরে রাখা ও (2) নদীপথে বাড়তি জল সাগরে বের করে দেওয়া।

জলাধার নির্মাণ—সাধারণত নদীর উৎসমুখে পার্বত্য উপত্যকায় নদীপথে বাঁধ দিয়ে জলাধার নির্মাণ করা হয় এবং বর্ষায় জল ধরে রেখে পরে সেচের কাজে লাগানো হয়। এইভাবে দামোদর, বরাকর, ময়ূরাক্ষী ও

---

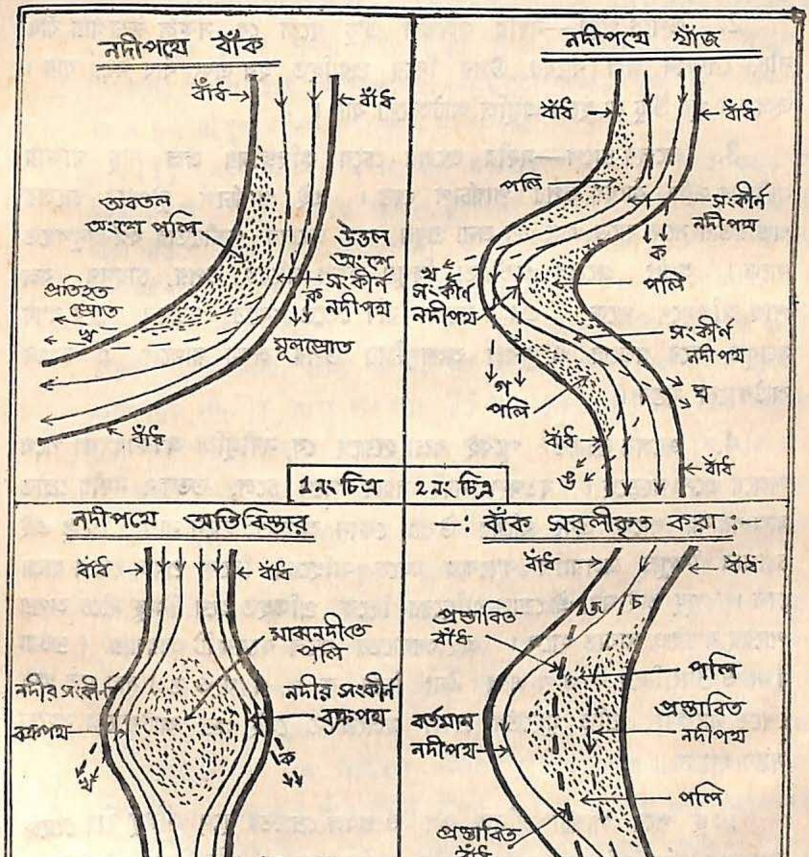
*পশ্চিমবঙ্গে 1978 সালের বন্যায় প্রায় একহাজার মানুষের জীবনহানি হয়েছিল, 2 লক্ষাধিক গবাদি পশু ভেসে গিয়েছিল 11 লক্ষ বাসগৃহ নিশ্চিহ্ন ও 8 লক্ষ বাসগৃহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে 2 কোটি মানুষ নিরাশ্রয় হয়েছিল আর 34 লক্ষ একর জমির ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছিল। এতে মোট ক্ষতির পরিমাণ এক হাজার কোটি টাকার অধিক। ঐ বন্যায় নদীর বাঁধে 12000 জায়গায় ফাটল দেখা গিয়েছিল। 1600 মাইল নদীর পাড়বাঁধসহ 2800 মাইল পাকা রাস্তা ও রেলপথ ভেসে যাওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়েছিল। এছাড়া দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলসহ আসানসোল-রাণীগঞ্জের 80টি কয়লাখনি ডুবে গিয়েছিল।

কংসাবতী নদীগুলির উপর কয়েকটি জলাধার নির্মাণ করাও হয়েছে। কিন্তু তবুও এই ভয়ঙ্কর প্লাবন হল কেন? দামোদর ভ্যালী করপোরেশন বা ডি. ভি. সি.-র কথাই ধরা যাক। এর তিলাইয়া, কোনার, মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধারগুলির জলধারণ ক্ষমতার 10·5 লক্ষ একরফুট বর্তমানে বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য সংরক্ষিত রাখা আছে এবং দামোদর ও তার উপনদী-গুলি দিয়ে যে পার্বত্য অঞ্চলের জল এসে জলাধারগুলিতে জমা হয়ে থাকে তা হল 6620 বর্গমাইল বা 42 লক্ষ একর। কিন্তু ঐ 42 লক্ষ একর পার্বত্যভূমি থেকে মাত্র 3 ইঞ্চি জল গড়িয়ে এলে তারও পরিমাণ হবে হবে 10·5 লক্ষ একরফুট। অর্থাৎ উক্ত উপত্যকার গড়িয়ে আসা (run-off) মাত্র 3 ইঞ্চি বৃষ্টিজলেই জলাধারগুলির বন্যা-নিয়ন্ত্রণে সংরক্ষিত অঞ্চলটি পূর্ণ হয়ে যাবে। অতএব কোন নিম্নচাপের ফলে যদি ঐ পার্বত্য-অঞ্চলে 16 বা 20 ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়, তবে গড়িয়ে আসা 12 বা 15 ইঞ্চি বৃষ্টিজলের শতকরা মাত্র 25 বা 20 ভাগ জলাধারগুলি ধরে রাখতে সক্ষম। ফলে বৃষ্টিজলের শতকরা 75 বা 80 ভাগই জলাধারগুলি থেকে দামোদর নদে ছেড়ে দিতে হবে। এছাড়া জলাধারগুলির নীচে প্রায় 1000 বর্গমাইল আধা-পার্বত্য অঞ্চল আছে, যার সমস্ত জলই দামোদরে নেমে আসবে। কাজেই জলাধারগুলি থাকা সত্ত্বেও প্রলয়ঙ্কর প্লাবন হবে দামোদরের নিম্ন উপত্যকায়। এতেই বোঝা যায়, এরূপ প্রবল বর্ষণে প্লাবন-নিয়ন্ত্রণে জলাধারগুলির ক্ষমতা অতি সীমিত।

তুলনামূলক বিচারে সমতলভূমির যেখানে ধান ও পাট চাষ হয়, তার জলধারণ-ক্ষমতা অনেক বেশী। কারণ সেখানে 16 ইঞ্চি বা 20 ইঞ্চি বৃষ্টি হলেও তা সমভাবে (বা কিছু বেশী ডাঙাগুলির জন্য) ছড়িয়ে পড়ায় ধান ও পাট চাষের বা সম্পত্তির কোন ক্ষতি করে না। প্রমাণস্বরূপ এবার যেখানে বাঁধ ভেঙে নদীজল যায় নি, সেখানে শস্য ভালই হয়েছে। তাহলে বাড়তি জল, বিশেষত পার্বত্য অঞ্চলের গড়িয়ে-আসা জলই নদীপথে দ্রুত সাগরে পৌঁছে দেওয়াই প্লাবন নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত পথ।

নদীপথ—আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সমতলভূমি সাধারণভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণে ঢালু হওয়ায় নদীগুলি মোটামুটি দক্ষিণবাহিনী হলেও এদের পথ অনেক আঁকাবাঁকা। ঐ বাঁকগুলিই নদীর জলপ্রবাহ ব্যাহত করে। যেমন কোন গাড়ী বা কোন চলমান বস্তু সরলরৈখিক পথে যে গতিতে চলতে পারে, বাঁক থাকলে সে গতিতে চলতে পারে না। গাড়ীর ক্ষেত্রে ব্রেক কষে গতি কমানো হয়। এখানে জলপ্রবাহকে বাঁকের উত্তল অংশে বা বাহিরের দিকে বাঁধের উপর ধাক্কা দিয়ে গতি কমাতে হয়। ফলে জলের প্রবাহমাত্রা যথেষ্ট কমে

যায়। এছাড়া সকল বস্তু সরলরৈখিক পথে চলতে চায় বলে বাঁকগুলির বাহিরের দিকে জলের স্রোতে ক্ষয় হতে থাকে এবং অপর পারে বাঁকের অবতল অংশে স্রোত না থাকায় পলি জমতে থাকে। এইভাবেই নদী এক কূল ভাঙে আর অন্য কূল গড়ে। (1নং ও 2নং চিত্র দ্রষ্টব্য) ফলে নদীপথ ক্রমাগত



বর্ষায় প্রবল জলস্রোতে ক,খ,গ,ঘ ও ঙ অংশে বাঁধে অতি দ্রুত ক্ষয় ও ভাঙন।

সংকীর্ণ হতে থাকে ও প্রবাহমাত্রা আরও কমে যায়। প্রতিহত স্রোতে বাঁকের নীচে অপর পারে আরও বাঁকের সৃষ্টি হয় এবং বাঁকগুলির মাত্রা ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকে। এইভাবে বাঁকের সংখ্যা ও মাত্রা বাড়তেই থাকে, যতক্ষণ না নদী একটি বা দুটি অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ সৃষ্টি করে নতুন ও সরল পথে চলতে সুরু করে।

পাড়বাঁধ ভাঙে কেন ও কোথায়—সাধারণতঃ চারটি কারণে নদীর বাঁধ ভাঙে।

1. ফাটল—নদীর বাঁধে কোন ফাটল সৃষ্টি হলে তার মধ্য দিয়ে জল বেরিয়ে ফাটলকে বাড়িয়ে তোলে এবং পরে বাঁধ ভেঙে যায়। সতর্ক দৃষ্টি রাখলে এটি সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করা যায়।

2. উপচে পড়া—নদীর জলতল উঁচু হলে যে সকল জায়গায় বাঁধ নীচু, সেখানে জল বাঁধের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং বাঁধ ক্ষয়ে যায়। জলতল খুব উঁচু না হলে এগুলি আটকানো যায়।

3. জলের চাপে—নদীর জলের চেয়ে কৃষিজমির জল নীচু থাকায় নদীজল সর্বত্র বাঁধের উপর পার্শ্বচাপ দেয়। এই পার্শ্বচাপ দু'পারে জলের গভীরতার সঙ্গে বাড়ে এবং এর জন্য প্রযুক্ত বল জলের গভীরতার বর্গ-অনুপাতে বাড়ে। অর্থাৎ জলের গভীরতা দ্বিগুণ হলে বাঁধের উপর চারগুণ বল পার্শ্ব অভিমুখে পড়ে। এর ফলে বাঁধ ভেঙে যেতে পারে। তবে বাঁধ মজবুত করে গড়লে ও দুর্বল অংশগুলির উপর লক্ষ্য রাখলে এ ভাঙন আটকানো সম্ভব।

4. জলের স্রোতে – পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নদীগুলি আঁকাবাঁকা পথে সাগরে এসে পড়েছে। যতক্ষণ নদী সরল পথে চলে, ততক্ষণ নদীর স্রোত মাঝ-বরাবর থাকে এবং বাঁধের উপর কোন আঘাত হানে না। কিন্তু এই চলমান বিপুল জলরাশি বাঁকের কাছে বাহিরের দিকে প্রবল বেগে ধাক্কা দেয়। শুধু তাই নয়, ঐ স্রোত বাহিরের দিকে প্রতিহত হয়ে কিছু নীচে অপর পারের বাঁধেও আঘাত হানে। এই আঘাতের ফলে কয়েকটি জায়গায় (দ্রষ্টব্য 1নং ও 3নং চিত্রে ক ও খ এবং 2নং চিত্রে ক, খ, গ, ঘ ও ঙ) বাঁধ দ্রুত ক্ষয় পেতে থাকে। প্রতি মুহূর্তের প্রবল জলস্রোতে সেই ক্ষয় আটকানো সহজে সম্ভব হয় না।

কিছু পরে পার্শ্বচাপজনিত বল ও প্রবল স্রোতের মুখে ক্ষয়িষ্ণু বাঁধ ভেঙ্গে জলস্রোত দুর্বার গতিতে, অর্থাৎ নদীর মাঝ-বরাবর যে গতি ছিল, সেই গতিতে সব কিছুই মুহূর্তের মধ্যে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এই কারণে যে বন্যা হয় তা অপ্রতিরোধ্য। আর জলবৃদ্ধির হার ও স্রোত প্রবল হওয়ায় ক্ষতি অনেক বেশী হয় এবং দুর্গতদের উদ্ধার বা ত্রাণের কাজ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। মনে হয় যেন সমস্ত নদীটাই মাঠ ও জমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নদী এইভাবে পথও পরিবর্তন করে। যদি উপযুক্তভাবে অনুসন্ধান করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, এই কারণই অধিকাংশ অর্থাৎ প্রায় শতকরা 75 ভাগ বাঁধ ভাঙা ও প্রবল বন্যার জন্য দায়ী।

পরিকল্পিত নদী-সংস্কারের মূলকথা

প্রথম অংশ—সরলরৈখিক পথ—উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, নদীর বাঁকগুলিই (1) জলপ্রবাহ ব্যাহত হওয়া, (2) বাঁকের বাহিরের দিকে বাঁধ ক্ষয়ে যাওয়া, (3) বাঁকের ভিতরের দিকে পলি পড়ে নদীপথ সংকীর্ণ হওয়া, (4) জলপ্রবাহ কমে জলস্ফীতি হওয়া এবং (5) চতুর্থ কারণে জলের স্রোতে বাঁধ ভেঙে প্রবল বন্যা হওয়া ইত্যাদির জন্য দায়ী। সুতরাং বন্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় হল নদীপথকে এমনভাবে সংস্কার করা যাতে বাঁকগুলি না থাকে। এইরূপ পরিকল্পিতভাবে নদীসংস্কার করলে,—

(1) নদীর বাঁক কমে যাওয়ায় জলপ্রবাহে বাধা কম হবে, ফলে প্রবাহ-মাত্রা বাড়বে, (2) নদীপথ পূর্বের তুলনায় সংক্ষিপ্ত হওয়ায় ঢাল বেড়ে প্রবাহ-মাত্রা বাড়বে। (যেমন মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় ভাগীরথী ও জলঙ্গীর পথ অনেক সংক্ষিপ্ত হয়ে ঢাল বাড়বে।), (3) নদী মোটামুটি মাঝ-বরাবর বইবে, এর পথের এক অংশে পলি পড়ে পথ সংকীর্ণ হবে না, ফলে প্রবাহমাত্রা বাড়বে, (4) নদীর স্রোত মাঝ-বরাবর থাকায় চতুর্থ কারণে বাঁধ ভেঙ্গে প্রবল বন্যা হবে না, যে বন্যা শতকরা 75 ভাগ ক্ষেত্রে ঘটে এবং প্রায় অপ্রতিরোধ্য, (5) পথ সরলরৈখিক হওয়ায় এবং বাঁকের ভিতরের অংশে যে পলি জমত তা না জমায় নদী সহজে মজে যাবে না, (6) নদীর জলের স্রোত নদীখাতমুখী হওয়ায় যেটুকু পলি পড়বে তার অনেকটা বর্ষায় ধুয়ে যাবে, (7) বাঁক না থাকায় প্রতিহত স্রোতে নতুন নতুন বাঁকের সৃষ্টি হবে না, (8) নদীর স্রোত বাঁধের উপর আঘাত না হানায় বাঁধের ক্ষয় কম হবে এবং বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ সহজ হবে, (9) পথ সরলরৈখিক হওয়ায় ভবিষ্যতে নদীর পথ পরিবর্তনের সম্ভাবনা কমে যাবে এবং (10) পথ ছোট হওয়ায় পুরান পথের বেশী জমি পাওয়া যাবে। (11) জলের গতি বেশী হওয়ায় বন্যার জল স্বল্প সময়ে সাগরে পৌঁছে যাবে।

সরলরৈখিক পথ সর্বোত্তম হলেও নদীপথ সর্বত্র সরলরেখা বরাবর করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বাঁকগুলির সংখ্যা ও মাত্রা কমিয়ে এনে নদীপথকে প্রায় সরলরৈখিক করে দিতে হবে। সহজভাবে বলতে গেলে যেমন গাড়ীর দ্রুতগতি বজায় রাখার জন্য জাতীয় সড়কগুলিকে ছোট বাঁক ও খাঁজমুক্ত করে প্রায় সরলরৈখিক করে গড়া হয়েছে, ঠিক তেমনি জলের দ্রুতগতি বজায় রাখার জন্য নদীপথগুলিকে সকল ছোট বাঁক ও খাঁজমুক্ত করে এক একটি জাতীয় জলপথরূপে গড়ে তুলতে হবে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় ভাগীরথী ও জলঙ্গীর পথে অজস্র বাঁক থাকায় নদীর বাঁধ 1978 খৃস্টাব্দের বন্যায় অসংখ্য স্থানে ভেঙেছে, কিন্তু চন্দননগরের দক্ষিণে হুগলীতে, কুলগাছিয়ার দক্ষিণে

দামোদরে এবং কোলাঘাটের দক্ষিণে রূপনারায়ণে বাঁকের সংখ্যা ও মাত্রা কম হওয়ায় নদীর বাঁধ বিশেষ কোথাও ভাঙে নি। এতেই বোঝা যায় যে, বাঁকের সংখ্যা ও মাত্রা কম হলে বা বাঁকগুলির বক্রতা-ব্যাসার্ধ [Radius of curvature] কয়েক মাইল হলে বাঁধ ভাঙার সম্ভাবনা কমে যাবে, কারণ বক্রতা-ব্যাসার্ধ বাড়লে জলের দ্বারা বাঁধের উপর প্রযুক্ত অপকেন্দ্রিক বল (Centrifugal force) কম হবে।

দ্বিতীয় অংশ—বিস্তার ও গভীরতা—নদীপথগুলি কোথাও বেশ সংকীর্ণ, আবার কোথাও বা অতি বিস্তৃত। সংকীর্ণ পথে নদীর যে গতি থাকে, জল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ায় বিস্তৃত পথে সেই গতি শুদ্ধ হয়ে যায়। এতে বিস্তৃত পথের সর্বত্র বিশেষ করে মাঝনদীতে পলি জমতে থাকে ও ঐ অঞ্চলের নদীখাত উঁচু হয়ে ওঠে। ওখানে নদী দু'ধারে বক্রপথে প্রবাহিত হয় এবং বাঁধ ভেঙে প্লাবনের সম্ভাবনা থাকে (দ্রষ্টব্য 23 পৃষ্ঠায় 3নং চিত্রে ক ও খ)। এটাই গঙ্গা, পদ্মা প্রভৃতি নদীর ভাঙনের কারণ। অনুরূপভাবে গভীরতার তারতম্যও নদীখাতে পলি জমতে সাহায্য করে। কাজেই নদীকে প্রায় সমবিস্তৃত ও গভীর করা দরকার। আবার যেহেতু জলের গতি নদীর তীর ও তলদেশ থেকে দূরত্বের সঙ্গে বাড়ে, সেহেতু নদীর বিস্তার কমিয়ে ও গভীরতা বাড়িয়ে বিস্তার ও গভীরতার অনুপাতকে কমিয়ে আনতে হবে।

তৃতীয় অংশ—ঢাল—মনে রাখতে হবে ঢাল নদীতে গতি সঞ্চার করে। কাজেই যেখানে নদীপথে ঢাল কম বা নেই, সেখানে নদীকে নতুন পথে বা অন্য কোন নদীখাতে ঘুরিয়ে দিতে হবে। কারণ পাহাড়ী পথ থেকে দ্রুতগতিতে নেমে আসা বিপুল জলরাশি ঐ সব প্রায় ঢালহীন পথে জমে যাওয়ায় নদী স্ফীত হয়ে উঠবে ও বাঁধ উপচে প্লাবন হবে। এছাড়া গতি শুদ্ধ হওয়ায় নদীখাতের সর্বত্র পলি পড়বে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ সাধারণভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণে ঢালু হওয়ায় কয়েকটি নদীর পূর্ববাহিনী অংশে, যেমন মেদিনীপুর জেলায় কংসাবতী ও শিলাবতী এবং বর্ধমান জেলায় দামোদর ও অজয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে, **এরূপ নদীপথের সন্ধান করা দরকার, যাতে নদীটির গতিমুখ ও অঞ্চলটির ঢাল পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।**

সহজভাবে বলতে গেলে যেমন জাতীয় সড়কগুলিকে বিভিন্ন শহরের মধ্যে অনাবশ্যক ঘুরপথ পরিহার করে সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত পথে যোগ করা হয়েছে, ঠিক তেমনি জাতীয় জলপথগুলিকে প্রয়োজনমত নতুন পথ কাটিয়ে সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত ঢালুপথে সাগরে পৌঁছে দিতে হবে। এই পথটি এমনভাবে খুঁজে নিতে হবে, যেন নদী তার পাহাড়ী পথে অর্জিত দ্রুতগতি যতদূর সম্ভব বজায় রাখতে পারে। [প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য] বিষয়টি পরে আলোচিত হবে, শুধু মনে রাখতে হবে যে

সংক্ষিপ্ততর নদীপথই অপেক্ষাকৃত ঢালু ও অধিকতর গতিসম্পন্ন।

চতুর্থ অংশ—মূলনদী ও উপনদীর পথ—অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি উপনদী মূলনদীতে প্রায় লম্বভাবে পতিত হয়েছে। এতে শুধু যে উপনদীটির জল-নির্গমনে অসুবিধা হয় তাই নয়, যে মূলনদীটি উপনদীর জল বহন করে তাতে উপনদীর জলের গতি সঞ্চারিত হয় না, পরন্তু উপনদীর জলের গতি মূলনদীর জলপ্রবাহে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে অর্থাৎ নদীদুটি পরস্পরের বিরুদ্ধে জলের প্রাচীর গড়ে তোলে। ফলে ঐ অঞ্চলে উভয় নদীতে জলের গতি স্তিমিত হওয়ায় জলস্ফীতি হয়ে প্লাবনের প্রকোপ বাড়ে এবং উভয় নদীখাতই পলি পড়ে দ্রুত মজে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, শিলাবতী দ্বারকেশ্বর নদে, হুগলী রূপনারায়ণ নদে এবং অজয় ভাগীরথী নদীতে প্রায় লম্বভাবে পতিত হওয়ায় ঐ অঞ্চলে উভয় নদীখাতই দ্রুত মজে যাচ্ছে ও বন্যার প্রকোপ বাড়ছে। সেইজন্য উক্ত নদীগুলিকে এমনভাবে পরিচালিত করা উচিত, যাতে জলনিকাশী নদীপথটির সঙ্গে উভয় নদীপথই সুসামঞ্জস্য হয়ে ওঠে। তখন উপনদী ও মূলনদী উভয়েই দ্রুতগতিতে ছুটে চলবে, নদীখাতে পলি পড়া কমবে এবং প্লাবনের সম্ভাবনা কমে যাবে। বিষয়টি পরে বিভিন্ন নদী পরিকল্পনা অংশে আলোচিত হবে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, গতিই নদীর প্রাণ ও সেই গতি সঞ্চারের জন্য চারটি জিনিষ একান্ত দরকার—(1) প্রায় সরলরৈখিক ও সংক্ষিপ্ত পথ, (2) সুষম বিস্তার ও গভীরতা, (3) সর্বত্র ঢাল ও (4) উপনদী ও মূলনদীর মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ পথ। এই চারটি জিনিষ থাকলে নদীর প্রবাহমাত্রা বহুগুণ বেড়ে যাবে, নদী তার নিজের পথ নিজেই কেটে চলবে এবং সহজে মজে যাবে না। জল দ্রুত সাগরে চলে যাওয়ায় ও বাঁধ না ভাঙায় প্লাবনের সম্ভাবনা প্রায় বিলুপ্ত হবে। এটি পরিকল্পিত নদী-সংস্কারের মূলকথা।

পঞ্চম অংশ—পলির আশীর্বাদ—পশ্চিমবঙ্গের সমতল অঞ্চলে কয়েকটি নিম্নাঞ্চল বা বেসিন আছে, যেখানে বন্যা হলে জলের গভীরতা খুব বেশী হয়। নদীর পলি দিয়ে ঐসব অঞ্চল উঁচু করা দরকার। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ধানগাছগুলি যখন 2 ফুট বা 3 ফুট হয়, অথচ শীষ আসে নি, তখন নিম্নাঞ্চলের বৃষ্টিজল পর পর কিছুদিন ভাঁটার সময় বের করে পরে জোয়ারের সময় নদীর জলে ভরে নেওয়া যায়, যদি জোয়ারের সময় ঐ অঞ্চলে নদীর জল বর্ষাকালে লবণাক্ত না থাকে। অথবা নিম্নাঞ্চলের বৃষ্টিজল ঐ সময় প্রথমে জলনিকাশী পথে এক নদীতে বের করে পলিসমেত অন্য নদীজলে পূর্ণ করা যায়। যেমন (1) হাওড়া জেলায় আমতা নিম্নাঞ্চলের বৃষ্টিজল কেঁদুয়া খাল দিয়ে হুগলীতে বের করে পরে দামোদরের জলে

ভরে নেওয়া যায় ; (2) মেদিনীপুর জেলায় দাসপুর নিম্নাঞ্চলের বৃষ্টিজল রূপনারায়ণে বের করে পরে শিলাবতীর জলে ভরে নেওয়া যেতে পারে। অনুরূপভাবে অন্যান্য নিম্নাঞ্চল উদ্ধার করার সম্ভাবনা বিবেচনা করতে হবে। অবশ্য এজন্য নদী ও কৃষি-জমির জলতলের উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ দরকার। কয়েক বৎসর বারবার এরূপ করলে শুধু যে নিম্নাঞ্চলগুলি উঁচু ও উর্বর হয়ে উঠবে তাই নয়, নদীতে পলির পরিমাণও কমবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য অঞ্চলও উর্বর করা যেতে পারে। আবার যেহেতু নদীর পলির সঙ্গে অসংখ্য মাছের ডিম ও ছোট্ট মাছ মিশে থাকে, সেহেতু ঐসব অঞ্চলের ধানজমিতে ও তাদের সংলগ্ন জলাশয়ে প্রচুর মাছ পাওয়া যাবে। তখন নদীর পলি আমাদের কাছে অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদ হয়ে উঠবে।

আসলে প্রথম বর্ষায় নদীতে যে ঢল নামে, তাতে প্রচুর খাদ্য থাকায় সমুদ্র থেকে মাছের ঝাঁক নদীপথে উঠে আসে এবং ঐসব মাছ নদীর মিষ্টজলে ডিম ছাড়ে। কিন্তু আজ জলাধারগুলিতে জল ধরে রাখায় দামোদর, রূপনারায়ণ, কংসাবতী প্রভৃতি নদীতে আর প্রথম বর্ষার ঢল নামে না, মাছও আসে না। তাই মাছের ডিম সংগ্রহের জন্য সুবর্ণরেখার উপর নির্ভর করতে হয়। আমার মনে হয়, প্রথম বর্ষার জল জলাধারে ধরে না রেখে নদীপথে ছেড়ে দিলে শুধু যে মাছের ঝাঁক আসবে তাই নয়, প্রায় শুক্‌নো মাটির উপর হঠাৎ-আসা ঐ জলধারা নদীখাত কাটাতে সাহায্য করবে। এছাড়া নদী-উপত্যকায় বনাঞ্চল গড়ে তুললে নদীতে ও জলাধার-গুলিতে পলি কম আসবে এবং যে পলি আসবে তার উর্বরতা শক্তি বেশী হবে ও তাতে মাছের প্রচুর খাদ্য থাকবে। অতীতে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে বৃষ্টিজলের সঙ্গে নদীর ঘোলাজল মিশে চাষ হত এবং সার ছাড়া প্রচুর ফসল ও মাছ পাওয়া যেত। তাই সেদিন চাষীর ছিল গোলাভরা ধান ও পুকুরভরা মাছ, যা ছিল ঐ নদীরই দান।

ষষ্ঠ অংশ—সেতু ও ব্যারাজ নির্মাণ—যানবাহন চলাচলের জন্য নদীর উপর সেতু নির্মাণ করতে হয়, যার থামগুলি জলপ্রবাহকে যথেষ্ট বাধা দেয় ও পলি পড়তে সাহায্য করে। কাছাকাছি বাঁক থাকলে সেতুর একদিকে পলি জমায় নদীপথ আরও সংকীর্ণ হয়। ঐ সংকীর্ণ পথে নদীর প্রবল স্রোতে সেতু ভেঙে যেতে পারে। তাই কোন বাঁকের কাছে বা নদীর সংকীর্ণ অংশে সেতু নির্মাণ করা উচিত নয়। বর্তমানে যেখানে নদীর বাঁকের নিকট সেতু আছে, যেমন মহিষরেখায় দামোদরের উপর বা কোলাঘাটে রূপনারায়ণের উপর, সেখানে নদীকে এমনভাবে সংস্কার করতে হবে, যেন সেতুর দু-দিকে অন্তত পাঁচ মাইল নদীপথ প্রায় সরলরৈখিক হয়ে

উঠে। যেখানে তা সম্ভব নয় সেখানে নদীপথ যতদূর সম্ভব সরল করে বাঁকের ভিতরের অংশে জমা পলি প্রতি বৎসর সরাতে হবে। ঐ পলি ইট তৈরির উপযোগী।

নদী যেখানে সমতল ভূমিতে বয়ে গেছে, সেখানে ঢাল খুব কম। এরূপ স্থানে ব্যারাজ নির্মাণ করে সমস্ত কপাট খুলে দিলেও দু-পারের নদীর জলতলের কয়েক ফুট পার্থক্য দেখা যায়। এই জলস্ফীতি 20 মাইল বা 25 মাইল পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে এবং বাঁধ উপচে বন্যার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। আবার ব্যারাজের কপাটগুলি যখন বন্ধ রাখা হয়, তখন সমানে পলি পড়ে নদীবক্ষ দ্রুত মজে যায়। ফলে নদীর নতুন পথে চলার প্রবণতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। (চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) কাজেই সমতল অঞ্চলে ব্যারাজ, যেমন তিলপাড়া ব্যারাজ, দুর্গাপুর ব্যারাজ, ফরাক্কা ব্যারাজ প্রভৃতির ঊর্ধাংশে জমা পলি প্রতি বৎসর সরাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

এছাড়া ব্যারাজের সর্বোচ্চ জলনির্গমন-ক্ষমতা [বা সমস্ত কপাট সম্পূর্ণ খুলে দিলে প্রতি সেকেণ্ডে যে জল বেরিয়ে যেতে পারে] অপেক্ষা অধিক জলপ্রবাহ কয়েক ঘণ্টা ধরে এলে ব্যারাজ বা তার পার্শ্ব-সংলগ্ন বাঁধ নিশ্চিতভাবে ভাঙবে এবং নদীর জল তীব্র গতিতে ছুটে এসে গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে নদী নতুন পথে চলবে ও এক বিশাল অঞ্চলে ধ্বংস ডেকে আনবে। এই কারণেই 1978 সালে তিলপাড়ায় ময়ূরাক্ষী ও খয়রাশোলে হিংলো নদী দুটি কয়েক শত জীবন ও বহু সম্পত্তি ধ্বংস করে নতুন পথে চলেছিল। ময়ূরাক্ষীতে তিলপাড়া ব্যারাজের সর্বোচ্চ জল-নির্গমন ক্ষমতা প্রায় 2·9 লক্ষ কিউসেক, কিন্তু জলপ্রবাহ এসেছিল 4·2 লক্ষ কিউসেকের কাছাকাছি। হিংলো বাঁধের সর্বোচ্চ জল-নির্গমন ক্ষমতা মাত্র 60 হাজার কিউসেক, কিন্তু 1 লক্ষ 20 হাজার কিউসেক হারে জল সেখানে এসেছিল। গঙ্গায় ফরাক্কা ব্যারাজে ও দামোদরে দুর্গাপুর ব্যারাজে অনুরূপ ঘটনার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে এবং সেক্ষেত্রে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের একাংশ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। [তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত] সেইজন্য পার্বত্য অঞ্চলে জলাধার বা সমতল অঞ্চলে ব্যারাজ নির্মাণের পূর্বে তার অশুভ দিকগুলি ভালরূপে বিবেচনা করা উচিত এবং ব্যারাজের ও নদীর জল-নির্গমন ব্যবস্থা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া দরকার। সবদিক বিবেচনা করে আমার মনে হয়, পার্বত্য-অঞ্চলে যেখানে জলবিদ্যুৎ পাওয়া যাবে, শুধুমাত্র সেখানে ছোট বা মাঝারি জলাধার নির্মাণ করে সেই বিদ্যুতে গভীর ও অগভীর নলকূপ চালিয়ে সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ফলে (1) পার্বত্য অঞ্চলে ছোট কোন জলাধারের বাঁধ ভাঙলেও জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল ধ্বংস হবে না, (2) সমতল অঞ্চলে

ব্যারাজ নির্মাণের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে ও তার অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, (3) সেচখালগুলি খননের জন্য বহু কৃষিজমি নষ্ট হবে না, (4) নদীতে জলপ্রবাহ বজায় থাকায় নদী সহজে মজে যাবে না, (5) নদী-পথে সারা বৎসর জল থাকবে যা অন্য কাজে যেমন শহরে ও বিভিন্ন শিল্পে জল সরবরাহে ব্যবহার করা যাবে এবং (6) স্বল্পব্যয়ে নদীপথে পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। এইভাবে আমাদের জলসম্পদের সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে। [অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত]

সামগ্রিকভাবে বিচার করে সকল জলপথকে প্রধানত দু-ভাবে বিভক্ত করা যায়—(1) সেই সব জলপথ যেগুলির দ্বারা বর্ষায় পার্বত্য-অঞ্চল থেকে হঠাৎ-আসা বিপুল জলরাশিকে পলিসমেত অতি দ্রুত সাগরে পৌঁছে দেওয়া যাবে, অর্থাৎ নদীপথ। এগুলির পথ হবে সর্বত্র ঢালু, প্রায় সরল ও সকল বন্ধনহীন। (2) সেই সব জলপথ যেগুলির দ্বারা সমতল অঞ্চলের বাড়তি জল পূর্বোক্ত নদীপথে পৌঁছে দেওয়া যাবে অথবা প্রয়োজনমত নদীপথ থেকে জল নিয়ে সেচের সুবিধা করা যাবে, অর্থাৎ সেচখাল। এগুলির ঢাল কম থাকবে এবং এরা যেখানে নদীপথে যুক্ত হবে, সেখানে অবশ্যই মজবুত স্লুইস্-গেট থাকবে। নইলে এই খালগুলির বাঁধ ভেঙে নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গে পরিকল্পিত নদীসংস্কারের সম্ভাব্যতা—বর্ষার কয়টি মাস ছাড়া হুগলী ও রূপনারায়ণের নিম্নাঞ্চল বাদে অন্য সব নদী প্রায় শুষ্ক থাকে, যখন এদের সহজেই পরিকল্পিতভাবে সংস্কার করা যায়। বর্তমানে দু-একটি অঞ্চল ছাড়া নদীখাতগুলি এমনই মজে গেছে যে, এরা প্রায় ধানজমির সমতলে আছে। কাজেই নদীকে বাঁকমুক্ত করে পরিকল্পিতভাবে অথবা পুরনো পথে খনন করলে প্রায় একই খরচ পড়বে। অবশ্য নতুন খাত খননের জন্য কিছু জমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন হবে, কিন্তু পুরানো আঁকাবাঁকা নদীখাতে বেশী জমি পাওয়া যাবে। যাদের জমি নেওয়া হবে, তাদের ঐ জমি প্রয়োজনমত সংস্কার করে বিলি করা যেতে পারে।

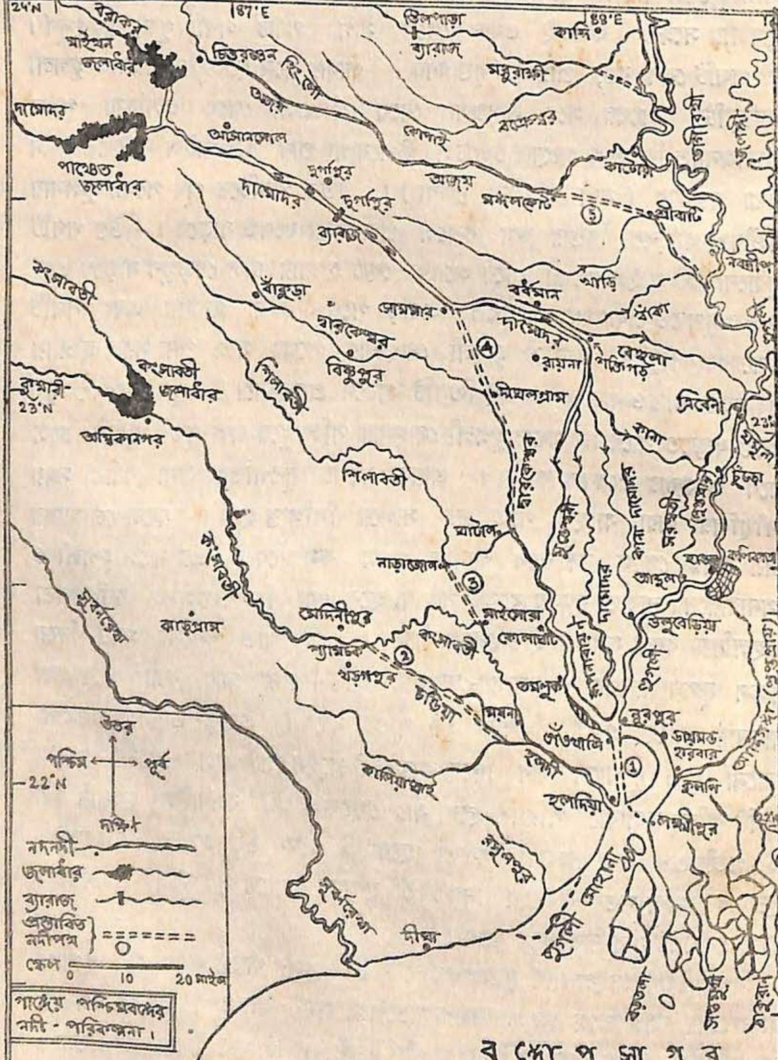
হুগলীতে ও বাক্সির পর রূপনারায়ণে সারা বছর জল থাকে। এখানে ড্রেজার দিয়ে বা অন্যভাবে পলি কেটে কয়েকটি বাঁককে (যেমন—সাঁকরাইল, উলুবেড়িয়া, মানকুর, পানিত্রাস ও কোলাঘাট) যতটা সম্ভব সরল করতে হবে। কিভাবে করা হবে তা 23 পৃষ্ঠায় 4নং চিত্রে দেখানো হল। নদীর গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ও দরকারমত বাঁধ সরিয়ে প্রথমে চ থেকে ছ পর্যন্ত একটি খাত খনন করতে হবে এবং ঐ মাটি জ ও ঝ অঞ্চলে ফেলতে হবে। কয়েকটি বর্ষার পর নদী নিজেই চ-ছ পথে চলবে ও পুরনো খাত কিছুটা মজে যাবে। গঙ্গা, পদ্মা, হুগলী ও রূপনারায়ণ কয়েক স্থানে অতি বিস্তৃত হওয়ায় মাঝ নদীতে পলি

জমছে এবং বন্যার প্রকোপ বাড়ছে। উপরিউক্তভাবে প্রথমে পলির মধ্যে পথ কেটে ও পরে বাঁধ এগিয়ে এনে নদীকে প্রায় সমবিস্তৃত ও গভীর করতে হবে। এতে মাঝনদীতে পলি পড়া কমবে ও কিছু জমিও পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন নদী-পরিকল্পনা—(1) বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বারটি জেলার ও বিহারসহ উত্তর-ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জল শেষ পর্যন্ত হুগলী নদীপথে সাগরে চলে যায়। হাওড়া জেলার দক্ষিণে দামোদর ও রূপনারায়ণ মিশেছে হুগলীর সঙ্গে। কাজেই ওখান থেকে সাগর পর্যন্ত পথটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঐ পথটি বেশ বক্র, প্রায় অর্ধ-বৃত্তাকার। আমার মনে হয় রূপনারায়ণ ও হুগলী নদীদু'টির পথের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গেঁওখালী থেকে হলদিয়া পর্যন্ত প্রয়োজনমত বিস্তৃত ও জাহাজ চলাচল উপযোগী প্রায় 12 মাইল নদীখাত খনন করা দরকার (নদী মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। নতুন পথটিতে পূর্ব পথের তুলনায় গভীরতা বাড়িয়ে বিস্তার কম করলে প্রবাহমাত্রা যথেষ্ট বাড়বে। উক্ত পথটি পুরানো 20 মাইল পথের চেয়ে অনেক ছোট হওয়ায় ঢাল দেড়গুণ বাড়বে এবং সেই অনুপাতে প্রবাহমাত্রা বাড়বে। এছাড়া পথে বাঁক না থাকায় এবং পথটি উপরের নদীদুটির ও নীচে হুগলী মোহানার পথের সঙ্গে প্রায় সরল হওয়ায় প্রবাহমাত্রা আরও বাড়বে। এই তিনটি কারণে প্রবাহমাত্রা 2 গুণ থেকে 3 গুণ পর্যন্ত বাড়তে পারে। ফলে হুগলী মোহনার পলি ধুয়ে জল দ্রুত সাগরে চলে যাবে ও বন্যার প্রকোপ কমবে। এছাড়া জলের দ্রুতগতির জন্য বর্ষার সময় নদীগুলির দ্বারা বাহিত পলি দূর সাগরে নিক্ষিপ্ত হবে। ফলে জোয়ারের সময় সাগর থেকে নদীপথে আনীত পলি কম হবে। এর ফলে হুগলী ও রূপনারায়ণের নাব্যতা রক্ষায় যথেষ্ট সাহায্য হবে এবং শিল্পাঞ্চলসহ কলিকাতা ও হলদিয়া বন্দর ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচবে। এই খাত খননের মাটি দিয়ে দক্ষিণ রূপনারায়ণের ও সাগর-মোহনার অতি-বিস্তার রোধ করা যাবে এবং মোহনার কাছে একটি বিশাল হ্রদ পাওয়া যাবে। এছাড়া ডায়মণ্ডহারবারের পুরানো খাত দু'পাশে বাঁধ দিয়ে কয়েকটি স্লুইস-গেট ও লক-গেটের সাহায্যে একটি কৃত্রিম জলাধারে পরিণত হবে, যার ক্ষেত্রফল 60 বর্গমাইল হওয়ায় 10 ফুট গভীরতার জন্য জলধারণক্ষমতা হবে 3 লক্ষ 80 হাজার একরফুট। সমুদ্র ও কলিকাতা উভয়ের নিকটবর্তী হওয়ায় এখানে পূর্বাঞ্চলের প্রতিরক্ষায় বৃহত্তম নৌঘাটি রূপায়িত করা যাবে।

যখন 100 মাইল দীর্ঘ সুয়েজ-খালকে 110 বছর আগে খনন করা হয়েছে এবং কয়েক বছর আগে বড় জাহাজ-চলাচলের জন্য আরও বিস্তৃত ও গভীর করা হয়েছে, তখন মাত্র 12 মাইল দীর্ঘ এরূপ একটি খাত খনন করা বর্তমান যুগে খুব অসম্ভব নয়।

(2) মেদিনীপুর জেলায় শ্যামচক থেকে ময়না পর্যন্ত কংসাবতী নদীর প্রায় 40 মাইল দীর্ঘ অর্ধ-বৃত্তাকার পথ আছে। আর সেই পথটিতে আছে অসংখ্য বাঁক। ঐ বাঁকগুলিতে ভাঙনই ঐ জেলায় প্লাবনের অন্যতম কারণ। কংসাবতীকে অজস্র বাঁকপূর্ণ ঐ ঘুরপথ থেকে সহজেই মুক্তি দেওয়া যায়, যদি নদীটিকে শ্যামচক থেকে চাঁওয়া নদীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। [মানচিত্র



গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের নদী - পরিকল্পনা।

দ্রষ্টব্য] অবশ্য এজন্য চাঁওয়া নদীর 25 মাইল দীর্ঘ পথকে উপযুক্তরূপে বিস্তৃত ও গভীর করার প্রয়োজন হবে। এতে কংসাবতীর একটি প্রায় সরল সংক্ষিপ্ত ঢালু পথ গড়ে উঠবে। তখন কংসাবতী তার পাহাড়ী পথের অর্জিত দ্রুত গতির সাহায্যে হলদিয়া বন্দরের কাছে জমে যাওয়া পলি সরিয়ে দেবে।

(3) তারপর শিলাবতীকে কংসাবতীর শেষ অংশে বা হলদীতে নাড়াজোল থেকে মাইসোরা পর্যন্ত প্রায় 10 মাইল পথ কেটে যোগ করলে শিলাবতীর জল হলদী নদী দিয়ে চলে যাবে। এর ফলে কংসাবতী ও শিলাবতীর জল প্রায় 25 মাইল অল্প ঢালু ঘুরপথ পরিহার করে ও পাহাড়ী পথের অর্জিত দ্রুতগতি বজায় রেখে সাগরে চলে যাবে। কংসাবতী ও শিলাবতীর মধ্যাঞ্চলগুলি, যা যুগ যুগ ধরে বন্যার জন্য দায়ী, দু-ধারে স্লুইস-গেট দিয়ে সেচখালে পরিণত হবে। ফলে মেদিনীপুর জেলা বন্যা থেকে বাঁচবে। এছাড়া কংসাবতী ও শিলাবতীর জল রূপনারায়ণে না আসায় হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া জেলায় বন্যার প্রকোপ কমবে।

(4) তারপর দ্বারকেশ্বর নদের জলবহন-ক্ষমতা বাড়িয়ে ও প্রয়োজনমত খনন করে বাঁকুড়া জেলার সোমসার থেকে দীঘলগ্রাম পর্যন্ত প্রায় 16 মাইল খাল কেটে দামোদরের জল দ্বারকেশ্বরে আনার কথা ভাবতে হবে। এতে দামোদরের ঐ অংশে প্রায় 25 মাইল বক্রপথ কমবে এবং পাহাড়ী পথের অর্জিত গতি অনেকটা বজায় থাকবে। তখন দামোদরের দ্রুতগতিই দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ ও হুগলী মোহানার নদীখাত পরিষ্কার রাখবে।

(5) অজয় নদ কাটোয়ার কাছে প্রায় লম্বভাবে ভাগীরথীতে এসে মিশেছে। ফলে অজয়ের জল ভাগীরথীকে বহন করতে হয়, কিন্তু তার গতি ভাগীরথীতে সঞ্চারিত হয় না। অজয় নদের আবহক্ষেত্র 2300 বর্গ-মাইল হওয়ায় ঐ অঞ্চলের নদীতে প্রায়ই জলস্ফীতি হয়ে বন্যা হয় এবং অজয়-বাহিত পলি ভাগীরথীতে জমে যায়। কাজেই অজয়কে মঙ্গলকোট থেকে শ্রীবাটি পর্যন্ত প্রায় 15 মাইল পথ কেটে খাড়ি নদীপথে প্রবাহিত করা দরকার। এতে অজয়ের জলরাশির পথ 20 মাইল সংক্ষিপ্ত হবে, নদীয়া জেলায় ভাগীরথীর সর্পিল পথ (যা সরল করা অত্যাবশ্যক) থেকে মুক্ত হবে এবং গতি বাড়বে। খাড়ি নদী প্রায় সরলভাবে ভাগীরথীতে পতিত হওয়ায় অজয়-বাহিত বিপুল জলরাশির দ্রুত গতিই ভাগীরথী বা হুগলীর খাত কাটাতে সাহায্য করবে এবং তখন ভাগীরথী নবদ্বীপ পর্যন্ত সুনাব্য হয়ে উঠবে। অনুরূপভাবে ময়ূরাক্ষী নদীর পথকে সংক্ষিপ্ত ও সরল করতে হবে। [মানচিত্র দ্রষ্টব্য] এতে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমা বন্যার কবল থেকে বাঁচবে।

নদীগুলিকে যে পথে যোগ করতে হবে তা নদী-মানচিত্রে দেখানো হল। এখানে 1, 2, 3, 4 ও 5 হুগলী, কংসাবতী, শিলাবতী, দামোদর ও অজয় নদীগুলির সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত পথ। নদীগুলিকে বাঁকমুক্ত করে ঐসব ঢালুপথে পরিচালিত করলে নদী নিজেই তার পথ কেটে চলবে ; সহজে মজে যাবে না, ও পথও পরিবর্তন করবে না। অনুরূপভাবে অন্যান্য নদী-পরিকল্পনা রচনা করতে হবে, যাতে পরিকল্পিত নদী-সংস্কারের মূল কথা বজায় থাকে। তাহলেই বন্যার প্রকোপ কমবে।

একটি নদীকে অন্য নদীখাতে ঘুরিয়ে দেওয়া আপাতদৃষ্টিতে কঠিন কাজ বলে মনে হলেও তা খুব শক্ত নয়, কারণ ঐ পথে একটি ছোট খাত কেটে দিলে নদী নিজেই তার পথ কেটে নেবে। ইতিহাসে অনুরূপ নজির আছে। দু'শ বৎসর পূর্বে ভাগীরথী নদী কলিকাতার পর কালীঘাট, রাজপুর, বারুইপুর, মজিলপুর, গোবিন্দপুর ও কাকদ্বীপ হয়ে সাগরদ্বীপে পৌঁছাত, যা এককালে আদিগঙ্গা নামে পরিচিত ছিল। নৌবাণিজ্যের সুবিধার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের দক্ষিণ থেকে আন্দুল পর্যন্ত একটি খাল কেটে সরস্বতী নদীর পুরাতন মজাখাতে ভাগীরথী নদীর জলধারা বইয়ে দেন নবাব আলিবর্দী। পথটিতে বাঁক কম থাকায়, সংক্ষিপ্ত হওয়ায় এবং নীচে দামোদর ও রূপনারায়ণের জলে পুষ্ট হওয়ায় ভাগীরথী নিজেই ঐ পথে আজ বিশাল হুগলী নদীতে পরিণত হয়েছে এবং আদিগঙ্গা আজ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যদি এইভাবে হুগলীর মত বড় নদীর পথ পরিবর্তিত হয়ে থাকে, তবে অন্য নদীর পথ পরিবর্তন কেন সম্ভব হবে না ? [সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

গত কয়েক দশকে নদীসংস্কারের বিশেষ কোন ব্যবস্থা হয় নি। মেদিনীপুর ক্যানাল, হিজলী ক্যানাল ইত্যাদি কয়েকটি খাল কেটে বিভিন্ন নদীর মধ্যে প্রায় ঢালহীন পথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু যখন বৃষ্টি হয় তা বিস্তীর্ণ অঞ্চলেই হয়ে থাকে এবং প্রায় সব নদীই স্ফীত হয়ে পড়ে। কাজেই বন্যা-নিয়ন্ত্রণে খালগুলির বিশেষ কোন ভূমিকা নেই। বরং এদের বাঁধ ভেঙে নতুন এলাকা প্লাবিত হয়, যদি না নদীমুখে খালের স্লুইস-গেট যথেষ্ট মজবুত থাকে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, গঙ্গা ও পদ্মার স্থানে স্থানে অতিবিস্তারের জন্য মাঝনদীতে পলি, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় ভাগীরথী ও জলঙ্গীর অজস্র বাঁক, মেদিনীপুর জেলায় কংসাবতী ও শিলাবতীর প্রায় ঢালহীন পথ, হাওড়া ও হুগলী জেলায় উপরের তুলনায় দামোদরের সংকীর্ণ পথ, কোলাঘাটে সেতুগুলির কাছেই রূপনারায়ণের কয়েকটি বাঁক এবং হুগলী মোহানায় অর্ধ-বৃত্তাকার পথের জন্য জমে যাওয়া পলিই গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে

বন্যার মূল কারণ। এই কারণগুলি দূর করলে বন্যার সম্ভাবনা কমে যাবে। আর তা না করে নদীকে শুধুমাত্র পুরানো পথে খনন করলে প্রবাহমাত্রা বিশেষ বাড়বে না, আবার পলি জমবে ও বন্যা হবে।

উপসংহার—পরিকল্পিত নদীসংস্কারের জন্য কয়েক শত কোটি টাকার প্রয়োজন হবে সত্য, তবু বন্যার ফলে হাজার কোটি টাকার শস্য ও সম্পত্তির ক্ষতি এবং কয়েক কোটি মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের কথা ভেবে তা সর্বাগ্রে রূপায়িত করা প্রয়োজন। এছাড়া কয়েকটি নদীবাঁধ বা সেচবাঁধ নির্মাণ করতে যে কয়েক শত কোটি টাকা লাগবে, সেই টাকায় পরিকল্পিত-ভাবে নদীসংস্কার করলে বন্যানিয়ন্ত্রণে অনেক বেশী সুফল পাওয়া যাবে এবং ভবিষ্যতে জলাধারের বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকায় প্লাবনের সম্ভাবনা থাকবে না।

পরিকল্পিত নদীসংস্কারের জন্য বহু যন্ত্রপাতি বা প্রচুর মালমসলার প্রয়োজন হবে না, শুধু প্রয়োজন হবে শ্রমশক্তি যা আমাদের দেশে প্রতিনিয়তই অপচিত হচ্ছে। এছাড়া নদীসংস্কার-কার্য সহজেই কাজের বিনিময়ে খাদ্য-প্রকল্পে যুক্ত করা যাবে। আবার যেহেতু এই কাজগুলি এমন সময়ে হবে, যখন গ্রামের অধিকাংশ মানুষই বেকার থাকে, সেহেতু তা গ্রামের জনজীবনে ও অর্থনীতিতে অনুকূল প্রভাব ফেলবে।

বর্তমান নিবন্ধটি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলির পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হলেও পরিকল্পিত নদীসংস্কারের মূলকথা সকল নদীক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মূল কথাগুলি বজায় রেখে নদী-পরিকল্পনার সাহায্যে দেশ থেকে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু, কেরালা ও মহারাষ্ট্রের ন্যায় উপকূলবর্তী রাজ্য থেকে বন্যার সম্ভাবনা অনেকাংশে কমানো যাবে। বন্যা-নিয়ন্ত্রণের দুটি পথের মধ্যে অস্থায়ী ও সীমিত ক্ষমতা-বিশিষ্ট পথকে অর্থাৎ জলাধার নির্মাণকে আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছি, কিন্তু স্থায়ী ও কার্যকরী পথটিকে অর্থাৎ নদীপথ সংস্কারকে সম্পূর্ণ অবহেলা করেছি। তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি পশ্চিমবঙ্গে 1978-এর সর্বনাশা বন্যা। আমি আশা করি ভবিষ্যতে জলাধার-নির্মাণ ও নদী-পরিকল্পনা এই দুটি পথের সুষ্ঠু সমন্বয়ে গড়ে উঠবে সত্যিকারের বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও সেচ-ব্যবস্থা এবং দেশ সমৃদ্ধ ও শস্যপূর্ণ হয়ে উঠবে।* [অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত]

---

*দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ফেব্রুয়ারী 1979 সংখ্যায় প্রকাশিত।

নদীবিজ্ঞানের কথা

তৃতীয় অধ্যায়

দুঃখের নদ দামোদর

সূচনা—বিহারের পার্বত্য উপত্যকা থেকে যে সকল নদী পশ্চিমবঙ্গের সমতল অঞ্চলে প্রবাহিত হয়েছে, তাদের মধ্যে দামোদর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নদীটির পার্বত্য অববাহিকা যথেষ্ট বড় হওয়ায় বর্ষাকালে দামোদর প্রচুর জলধারা নিয়ে আসে এবং চলার পথে পশ্চিমবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রায়ই প্লাবন ডেকে আনে—যাদের মধ্যে বিংশ শতাব্দীতে 1901, 1905, 1913, 1916, 1923, 1927, 1935, 1943, 1956, 1959, 1971 ও 1978 সালের প্লাবনগুলি উল্লেখযোগ্য। 1943 সালে যুদ্ধের সময় দামোদর বর্ধমানের কাছে বামতীর ভেঙে পূর্ব রেলপথ ও গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড চুরমার করে গ্রামের পর গ্রাম ভাসিয়ে সোজা পূর্বমুখী হয়ে বেহুলা নদীপথ ধরে এগিয়ে চলে ত্রিবেণীর কাছে হুগলীতে মিলিত হওয়ার জন্য। ঐ সময় প্রায় দু'মাস পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে কলিকাতার রেল ও সড়ক পথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন যুদ্ধোপকরণ চলাচলে বিঘ্ন হওয়াতেই ব্রিটিশ সরকার দামোদরের বন্যা-নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর দামোদর উপত্যকায় বহুমুখী প্রকল্প, যথা বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, সেচের জন্য জল সরবরাহ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য 1948 সালের 7ই জুলাই দামোদর ভ্যালী করপোরেশন বা ডি. ভি. সি. গঠিত হয়। আমেরিকার টেনেসী ভ্যালী অথরিটির ইঞ্জিনীয়ার মি. ভরডুইন দামোদর উপত্যকায় 10 লক্ষ কিউসেকের প্রবাহকে 2·5 লক্ষ কিউসেকে কমিয়ে আনার জন্য আটটি জলাধার নির্মাণ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু পরবর্তীকালে 1953 সালে বরাকর নদের উপর তিলাইয়া, 1955 সালে কোণার নদের উপর কোণার, 1957 সালে বরাকর নদের উপর মাইথন ও 1959 সালে দামোদর নদের উপর পাঞ্চেত—এই চারটি জলাধার নির্মিত হয়, যাদের দ্বারা 6·5 লক্ষ কিউসেকের প্রবাহকে 2·5 লক্ষ কিউসেকে কমিয়ে আনা যাবে বলে অনুমান করা হয়। সেচের জল সরবরাহের জন্য 1955 সালে দুর্গাপুরে দামোদর নদে একটি ব্যারাজ বা সেচবাঁধ নির্মাণ করা হয়। [12 পৃষ্ঠায় আলোচিত] তবুও 1958, 1959, 1971 ও 1978 সালে দামোদর উপত্যকায় প্রবল বন্যা হয়, যাদের মধ্যে 1978 সালের বন্যা সকল পূর্ব-ইতিহাসকে ছাপিয়ে গেছে। কাজেই জলাধারগুলির বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

জলাধারগুলির বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা—ডি.ভি.সি-র উল্লিখিত চারটি জলাধারের বন্যা-নিয়ন্ত্রণে সংরক্ষিত জলধারণ ক্ষমতা বর্তমানে 10·5 লক্ষ একরফুট, যদিও মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার দুটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়িয়ে তা 15 লক্ষ একরফুট করা যায়। ঐ চারটি জলাধারে যে পার্বত্য অঞ্চলের জল এসে জমা হয় বা ওদের আবহক্ষেত্র হল 6,620 বর্গমাইল বা প্রায় 42 লক্ষ একর। [1 বর্গমাইল=640 একর।] যদি কখনও ঐ অঞ্চলে তিনদিনে গড়ে 16 ইঞ্চি হয়, তবে কিছু জল শোষিত হলে ও কিছু জল জমে থাকলেও তিনদিনের মধ্যে 10 ইঞ্চি বৃষ্টিজল নদীপথ বেয়ে জলাধারগুলিতে আসবে বলে অনুমান করা যায়। 72ঘণ্টায় প্রবাহিত-হয়ে আসা সেই জলের পরিমাণ হবে 35 লক্ষ একরফুট। ফলে প্রতি ঘণ্টায় গড়ে প্রায় 0·5 লক্ষ একরফুট জল দামোদরে নেমে আসবে, যাতে গড় প্রবাহমাত্রা হবে 6 লক্ষ কিউসেকের মত।* [ঘণ্টায় 1 একরফুট জল এলে প্রবাহমাত্রা প্রায় 12 কিউসেক দাঁড়ায়।] তখন জলাধারগুলিতে প্রবাহিত হয়ে আসা জলের অর্ধেক বা 3 লক্ষ কিউসেক হারে জল দামোদর নদীপথে ছেড়ে দিলেও জলাধারগুলি ও দুর্গাপুরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের বাড়তি জলের জন্য দুর্গাপুর ব্যারাজের কাছে দামোদর নদের প্রবাহমাত্রা দাঁড়াবে 4 লক্ষ কিউসেকের কাছাকাছি। কিন্তু অবশিষ্ট 3 লক্ষ কিউসেক হারে জল রাখায় প্রতি ঘণ্টায় জলাধারগুলির 0·25 লক্ষ একরফুট অঞ্চল ভরে যাবে। অর্থাৎ জলাধারগুলির জলধারণ ক্ষমতার মধ্যে যে 10·5 লক্ষ একরফুট বর্তমানে বন্যা-নিয়ন্ত্রণে খালি রাখা হয়ে থাকে, মাত্র 42 ঘণ্টায় তা ভরে যাবে এবং পরবর্তী 30 ঘণ্টা বন্যা-নিয়ন্ত্রণে জলাধারগুলির কোন ক্ষমতা থাকবে না, বা সব জলই নদীপথে ছেড়ে দিতে হবে। কাজেই এরূপ প্রবল বর্ষণে জলাধারগুলির দ্বারা মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্যা-নিয়ন্ত্রণের পর ওগুলি সম্পূর্ণ ভরে যাবে এবং পরবর্তী দিনগুলিতে জলাধারগুলি থেকে গড়ে 6 লক্ষ কিউসেক হারে জল নদীপথে ছাড়তে হবে। ফলে দুর্গাপুরের পর দামোদর নদে প্রায় 7 লক্ষ কিউসেক হারে জল নামবে। কাজেই জলাধার নির্মাণ নয়, দামোদরের বন্যা-নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায় হল, একে এরূপভাবে সংস্কার করা যাতে নদীটি 6 লক্ষ কিউসেক জলের প্রবাহ নিয়ে সাগরে পৌঁছে যেতে পারে।

---

*অর্থাৎ কোন পার্বত্য উপত্যকায় 72 ঘণ্টায় 16 ইঞ্চির মত বৃষ্টি হলে প্রতি 1 হাজার বর্গ মাইল আবহক্ষেত্রের জন্য প্রায় 1 লক্ষ কিউসেক হারে জলপ্রবাহ আসতে পারে এবং 36 ঘণ্টায় বা 24 ঘণ্টায় অনুরূপ বৃষ্টির জন্য প্রতি 1 হাজার বর্গমাইল আবহক্ষেত্র থেকে নদীতে যথাক্রমে 2 লক্ষ বা 3 লক্ষ কিউসেক হারে জল আসার সম্ভাবনা থাকবে।

1978 সালের বন্যায় ডি. ভি. সি.-র ভূমিকা—1978 সালের 26শে সেপ্টেম্বর সকাল থেকেই সমগ্র দামোদর উপত্যকায় প্রবল বর্ষণ সুরু হয় এবং জলাধারগুলির জলতল দ্রুতহারে বাড়তে থাকে। ঐ দিন রাত তিনটায় জলাধারগুলিতে যে হারে জল আসে, তা সর্বকালের রেকর্ড ছাপিয়ে 8·5 লক্ষ কিউসেকে দাঁড়ায়। কিন্তু ঐ হারে জল খুব অল্প সময়ের জন্য আসায় জলাধারগুলি থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ 1·6 লক্ষ কিউসেক হারে রাখা সম্ভব হয়, কারণ যদিও দামোদরের নিম্ন উপত্যকায় তিন দিনে 16 ইঞ্চি থেকে 30 ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছিল, তবুও উচ্চ উপত্যকার যে অংশের জল জলাধারগুলিতে সঞ্চিত হয়, সেখানে অঞ্চল বিশেষে তিন দিনে 4 ইঞ্চি থেকে 16 ইঞ্চি পর্যন্ত এবং গড়ে 8 ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। ফলে গড়িয়ে-আসা (run-off) আনুমানিক 4 ইঞ্চি বৃষ্টিজল জলাধারগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধারদুটির নিম্ন-অঞ্চলে তিন দিনে প্রায় 18 ইঞ্চি বৃষ্টি হওয়ায় দুর্গাপুর ব্যারাজের কাছে দামোদর নদের প্রবাহমাত্রা অতিরিক্ত 2·2 লক্ষ কিউসেক হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে দুর্গাপুর ব্যারাজ দিয়ে 26শে সেপ্টেম্বর 3·6 লক্ষ কিউসেক, 27শে সেপ্টেম্বর 3·8 লক্ষ কিউসেক ও 28শে সেপ্টেম্বর 2·5 লক্ষ কিউসেক হিসাবে বিপুল পরিমাণ জল দামোদরের পথে ছেড়ে দিতে হয়। এর পর এক সপ্তাহের মধ্যে আর একটি ঘূর্ণিঝড় আসায় 6ই, 7ই ও 8ই অক্টোবর দুর্গাপুর ব্যারাজ দিয়ে বন্যা-প্লাবিত অঞ্চলগুলিতে আবার প্রচুর জল ছাড়তে হয়। হাইড্রোগ্রাফ পদ্ধতিতে হিসাব করে দেখা যায় যে, 26শে সেপ্টেম্বর থেকে 12ই অক্টোবর পর্যন্ত দুটি বন্যার দিনগুলিতে দুর্গাপুর ব্যারাজ দিয়ে দামোদরে যে জল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তার আয়তন হল 37 লক্ষ একর-ফুট। এছাড়া দুর্গাপুর ব্যারাজের কাছেই দুর্গাপুর-বাঁকুড়া রোডের প্রায় 300 ফুট ভেঙে বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া, সোনামুখী, পাত্রসায়ার ও ইন্দাস অঞ্চলের প্রায় 25 মাইল দীর্ঘ ও 10 মাইল বিস্তৃত এলাকা সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত হয়, যাতে প্রায় 40 জনের জীবনহানি ঘটে। যদি বাঁকুড়া জেলার ঐ 250 বর্গমাইল অঞ্চলে বন্যার জলের গভীরতা প্রায় 5 ফুট ধরা হয়, তবে ঐ পথে প্রবাহিত জলের পরিমাণ হবে 8 লক্ষ একর-ফুট। আবার ডি. ভি. সি.-র উত্তর দিকের ক্যানাল পথ বেয়ে আরও কয়েক লক্ষ একর-ফুট জল বর্ধমান জেলার বিভিন্ন অঞ্চলকে প্লাবিত করে এবং যে টাম্বলা ক্যানাল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের জল বয়ে নিয়ে আসে, সে তার পথের বাধা ব্রীজ ও রাস্তা চুরমার করে ব্যারাজের নীচের অংশের দামোদরে বিপুল পরিমাণ জল ঢেলে দেয়।

সব মিলিয়ে দেখা যায় যে, 26শে সেপ্টেম্বর থেকে পরপর দুটি বন্যার সময় দামোদর ও তার সংলগ্ন ক্যানালগুলির পথ ধরে কমপক্ষে 50 লক্ষ একরফুট

জল ছুটে এসে দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী ও শিলাবতী বাহিত আরও অন্তত 10 লক্ষ একরফুট জলের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমগ্র নিম্নদামোদর উপত্যকাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে 15-20 দিন ধরে জলমগ্ন করে রেখেছে, আর আমরা ঐ সময়ে মাত্র 10 লক্ষ একরফুট জল জলাধারগুলিতে ধরে রেখে একটা বিরাট বিপর্যয় রোধ করা গেল বলে মনে করছি। আমার মনে হয় যে, 1978 সালের বন্যার সময় যে সব অঞ্চলে 7-8 ফুট জল জমেছিল, জলাধারগুলি না থাকলে তাতে অতিরিক্ত 1 ফুট জলও বাড়ত না। ফলে বন্যার ধ্বংসলীলা বা তীব্রতা এমন কিছু বেশী হত না বা দোতলা বাড়ীগুলি ডুবে যেত না।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, বর্তমান শতাব্দীর অন্য 4টি প্রবল বন্যায় দুর্গাপুর দিয়ে দামোদরের পথে যে জল নেমে এসেছে বলে জানা যায়, তার আয়তন হল 1913 সালের অগাস্টে 32 লক্ষ একরফুট, 1943 সালের অগাস্টে 22 লক্ষ একরফুট, 1950 সালের জুলাই-এ 22 লক্ষ একরফুট ও 1959 সালের অক্টোবরে জলাধারগুলিতে জল ধরে রাখার পর 21 লক্ষ একরফুট। এছাড়া 1770, 1823, 1840, 1855 ও 1882 সালগুলিতে দামোদরের উপত্যকায় প্রবল বন্যা হয় বলে জানা যায়।

মনে রাখা দরকার যে, **যেখানে নদীর জলবহন ক্ষমতা খুব কম, সেখানে বন্যায় প্লাবিত অঞ্চল সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রার চেয়ে প্রবাহিত জলের আয়তনের উপর অধিক নির্ভর করে।** যেমন 1943, 1959 ও 1978 সালের বন্যাগুলিতে দুর্গাপুরে দামোদরের সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রা যথাক্রমে 3·0 লক্ষ, 3·5 লক্ষ ও 3·8 লক্ষ কিউসেক রাখা সত্ত্বেও প্রবাহিত জলের আয়তন বেশী হওয়ায় এক বিশাল অঞ্চলে প্রবল প্লাবন হয়েছে, কিন্তু 1941 সালের বন্যায় সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রা 6·5 লক্ষ কিউসেক হলেও প্রবাহিত জলের আয়তন কম হওয়ায় বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি। তাহলে যে দামোদরে এক একটি বন্যার সময় 25-30 লক্ষ একরফুট জল নেমে আসে, সেখানে মাত্র 10 লক্ষ একরফুট জল ধরে রেখে বন্যার তীব্রতাকে কতটুকু প্রশমিত করা যাবে? পরন্তু দুর্গাপুর ব্যারাজের উজানে জমে যাওয়া বিশাল চরের জন্য আসানসোল-রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলসহ বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাংশের জল নির্গমনে বাধা হওয়াতে ঐ আধা-পার্বত্য উপত্যকা প্লাবিত হয়। অর্থাৎ যে প্লাবন অতীতে শুধু নিম্ন-উপত্যকায় সীমিত থাকত, দুর্গাপুর বারাজের জন্য তা উচ্চ-উপত্যকাতেও ছড়িয়ে পড়ে। [পথের বাধা অংশ দ্রষ্টব্য]

দামোদরের বন্যার প্রকৃত কারণ—যেহেতু দামোদরে বন্যার সময় 6 লক্ষ কিউসেকের অধিক হারে জল নেমে আসে, সেইহেতু এর খাত 4 লক্ষ বা 5 লক্ষ কিউসেক হারে জলবহন ক্ষমতার উপযোগী হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু

নদীটির খাত বর্ধমান জেলায় বেশ বড় থাকলেও হাওড়া ও হুগলী জেলায় তা অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। এর কারণ জানতে হলে উক্ত নদীটির ইতিহাস জানতে হবে। দুই শত বৎসর পূর্বে দামোদর পূর্ববাহিনী হয়ে বেহুলা নদীপথে প্রবাহিত হত ও ত্রিবেণীর কাছে ভাগীরথীতে পতিত হত। তারপর 1770 সালের এক প্রবল বন্যায় দামোদর তার পূর্বমুখী বেহুলা নদীপথকে পরিত্যাগ করে হঠাৎ দক্ষিণমুখী হয়ে গ্রামের পর গ্রাম ভাসিয়ে দু-তিনটি নতুন পথে চলতে সুরু করে, যাদের মধ্যে প্রধান শাখাটি ফলতার কাছে হুগলীতে পতিত হয় ও অপর একটি শাখা বর্তমান কানা নদীপথ ধরে সরস্বতীতে মিলিত হয়। [32 পৃষ্ঠায় মানচিত্র দ্রষ্টব্য] দামোদরের নতুন প্রধান শাখার পথটি পূর্বপথের তুলনায় প্রায় 35 মাইল সংক্ষিপ্ততর হওয়ায় সামগ্রিকভাবে অপেক্ষাকৃত ঢালু। ফলে নদীটি নতুন পথে চলতে শুরু করে এবং পূর্বপথটি দ্রুত মজে যেতে থাকে। কিন্তু শক্তিগড়ের কাছে প্রায় 90° কোণের একটি বাঁক থাকায় ও নতুন পথটি বেশ দীর্ঘ হওয়ায় দামোদর আজও তার নিজস্ব পথটি কেটে নিতে পারে নি। ফলে বর্ধমান জেলার পূর্বাংশ, হাওড়া ও হুগলী জেলা বারবার দামোদরের বন্যার কবলে পড়ে। এই কারণে দামোদর পশ্চিমবঙ্গের দুঃখের নদ বলে পরিচিত হয়।

আসলে দামোদর শুধু একবার নয়, কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বহুবার পথ পরিবর্তন করেছে। যেমন খাড়ি, বাঁকা, বেহুলা, কানা, কানা দামোদর প্রভৃতি নদীগুলি দামোদরের পরিত্যক্ত খাত। এমন কি এই শতাব্দীতে নদীটি হুগলী ও হাওড়া জেলায় দামোদর নামে পথটি পরিহার করে বেগোর ও মুচির হানা দিয়ে মুণ্ডেশ্বরীর পথে তার প্রধান ধারাটি প্রবাহিত করে চলেছে এবং বর্তমানে ঐ পথে দামোদরের শতকরা প্রায় 80 ভাগ জল রূপনারায়ণে পৌঁছে যায়। [সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত] এখানে বলা দরকার যে, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে দামোদর যখন বাঁকা নদীপথ ধরে বয়ে যেত, তখন তার একটি শাখা ঢলাকিশোর নামে দক্ষিণমুখী হয়ে বর্তমান মুণ্ডেশ্বরীর কাছাকাছি পথ ধরে রূপনারায়ণে মিলিত হত। পরে বেহুলা পথটি গড়ে ওঠায় ঢলাকিশোর মিলিয়ে যায়। কাজেই বর্তমান মুণ্ডেশ্বরীও দামোদরের একটি প্রাচীন খাত। এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, নদীটির সকল পথ পরিবর্তনই একটি বিশেষ অঞ্চলে বা বর্ধমান জেলার পূর্ব-অংশেই সীমাবদ্ধ। এর কারণ কি ?

দামোদরের পথ পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ—যখন দেখি, অজয়, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি নদীগুলি বড় একটা পথ পরিবর্তন করে না, তখন দামোদরই বা বারবার পথ পরিবর্তন করে কেন ? নদীপথে বাঁক বা নদীখাতে পলি জমার জন্য নদীর ছোটখাটো পথ পরিবর্তন হলেও তার মূল প্রবাহ নির্ভর করে প্রধানত প্রবাহিত অঞ্চলের ঢালের উপর। এছাড়া নদীর গতিমুখ বা ভরবেগের দিকও

নদীপথকে নিয়ন্ত্রণ করে। এখন নদী মানচিত্রে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন নদীর যথা খাড়ি, বাঁকা, বেহুলা, কানা, কানা দামোদর, দামোদর ও মুণ্ডেশ্বরীর পথগুলি লক্ষ্য করা যাক। ঐ সব নদীগুলি ঐ অঞ্চলটি থেকে বহুমুখী হয়ে তীরচিহ্নিত দিকে বয়ে চলেছে। [32 পৃষ্ঠায় মানচিত্র দ্রষ্টব্য] ফলে ঐ অঞ্চলটি একটি অধিত্যকা—যা অনেকটা কচ্ছপের পিঠের মত। এর উত্তর-পূর্ব থেকে পূর্ব ও দক্ষিণ ঘুরে দক্ষিণ-পশ্চিম পর্যন্ত সকল দিকেই ঢাল কম-বেশী বিদ্যমান। সুতরাং ঐ অঞ্চলটি থেকে যে কোন দিকের ঢালুপথই দামোদরের পথ হতে পারে।

আমার অনুমান যে, যেহেতু বর্ধমান জেলা নদীয়া ও চব্বিশ-পরগণা জেলাগুলি থেকে উচ্চতর ও প্রাচীন ছোটনাগপুর মালভূমির অংশবিশেষ, সেই হেতু যখন নদীয়া ও চব্বিশ-পরগণা জেলাগুলি যথেষ্ট নীচু ছিল, তখন দামোদর খাড়ি নদীর পথ ধরে **উত্তর**-পূর্ব দিকে বয়ে যেত এবং ভাগীরথীর কোন প্রাচীন খাতে মিলিত হত। কিন্তু ঐ অঞ্চলটি ক্রমে পলি জমে উঁচু হয়ে ওঠায় খাড়ি নদী শ্রীবাটির নিকট থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বইতে থাকে। পরবর্তীকালে কোন এক প্রবল বন্যায় দামোদর তার পথকে সংক্ষেপ করে বাঁকা নদীপথে প্রবাহিত হয়। কিন্তু ভাগীরথী ও বাঁকা বাহিত পলিতে ঐ অঞ্চল ক্রমাগত উঁচু হওয়ায় নদীটি পূর্বমুখী হয়ে বেহুলা পথে চলতে থাকে। বর্তমানে ঐ অঞ্চল আরও উঁচু হওয়ার জন্য এবং নদীটিকে সমুদ্র পর্যন্ত তার পথটি সংক্ষেপ করার জন্য দক্ষিণবাহিনী হয়ে উঠতে হয়েছে। নদী মানচিত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সামগ্রিক ভাবে সমুদ্র পর্যন্ত সম্পুর্ণ পথের কথা বিচার করলে খাড়ি, বাঁকা, বেহুলা, কানা, কানা দামোদর, দামোদর ও মুণ্ডেশ্বরীর পথগুলি ক্রমানুসারে সংক্ষিপ্ততর। অর্থাৎ নদীটি বারবার পথ পরিবর্তনকালে ক্রমান্বয়ে সংক্ষিপ্ততর পথেই চলতে চেয়েছে, কারণ সংক্ষিপ্ততর নদীপথই অপেক্ষাকৃত ঢালু ও অধিকতর গতিসম্পন্ন।

এখন নদীটির বর্তমান পথের কথা ভাবা যাক। ছোটনাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চল থেকে বর্ধমান পর্যন্ত ঢাল প্রায় পূর্বমুখী থাকায় নদীটি পূর্বমুখী গতি পায়। কিন্তু শক্তিগড়ের কাছে হঠাৎ সে 90° কোণ ঘুরে দক্ষিণবাহিনী হয়ে রয়েছে। ফলে ঐ অঞ্চলে নদীটি পূর্বলব্ধ গতির জন্য চলতে চায় পূর্বদিকে, আবার সামগ্রিকভাবে অধিকতর ঢালের জন্য সে বইতে চায় দক্ষিণদিকে। তাই প্রবল বন্যায় যখন নদীর বামতীরের বাঁধ ভাঙে, সে তখন প্রচণ্ড গতির সাহায্যে পথ কেটে ছুটে চলে পূর্বদিকে ভাগীরথীতে মিলিত হতে। আবার যখন গতি কিছু কম থাকে ও দক্ষিণতীরের বাঁধ ভাঙে, তখন সে পূর্বমুখী গতি ও দক্ষিণমুখী ঢালের জন্য চলতে চাইবে দক্ষিণ-পূর্বমুখী কোন পথে। অর্থাৎ ঐ অধিত্যকা অঞ্চলের ঢালের বৈচিত্র্য ও নদীর গতিমুখের এই অসম সমাবেশের জন্য দামোদের আজও তার নিজস্ব পথটি গড়ে নিতে পারে নি। তাই আজও সে অশান্ত, অস্থির।

দামোদরের বন্যা-প্রতিরোধের উপায়—উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, অশান্ত দামোদরকে বর্ধমান জেলার পূর্বাংশের ঐ অধিত্যকা অঞ্চলটি থেকে মুক্ত করতে না পারলে সে কখনও নিজস্ব পথ গড়ে নিতে পারবে না এবং তার বার বার পথ পরিবর্তন বা বন্যার কবল থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না। কাজেই নদীটিকে এমন একটি পথে পরিচালিত করতে হবে, যাতে তা ঐ অধিত্যকা অঞ্চলটি থেকে মুক্ত হয় এবং নদীর গতিমুখ ও প্রবাহিত অঞ্চলের ঢাল পরস্পরের সঙ্গে সুসামঞ্জস্য হয়ে ওঠে। এরূপ পথের সন্ধান 32 পৃষ্ঠায় নদী-মানচিত্রে দেওয়া হল। পথটি হবে বাঁকুড়া জেলার সোমসার থেকে 4নং পথে দীঘলগ্রাম পর্যন্ত, তারপর বাঁকমুক্ত দ্বারকেশ্বর ও রূপনারায়ণ নদের পথ ধরে গেঁওখালি এবং শেষাংশ মেদিনীপুর জেলার গেঁওখালি থেকে 1নং পথে সোজা হলদিয়া হয়ে সাগর পর্যন্ত। এটিই দামোদরের সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত ঢালুপথ।

এ কথা ঠিক যে, ঐ পথের উপরাংশে দামোদরের ও নিম্নাংশে দ্বারকেশ্বরের বর্তমান জলবহন ক্ষমতা 1 লক্ষ কিউসেকের কম। কিন্তু (1) পথটি পূর্বপথের তুলনায় ছোট হওয়ায় ঢাল বেড়ে প্রবাহমাত্রা বাড়বে; (2) পথটিতে বাঁক প্রায় না থাকায় জলের গতি কোথাও ব্যাহত হবে না। (3) নদীর গতিমুখ ও প্রবাহিত অঞ্চলের ঢালের দিকে নদীর সরল পথটি গড়ে ওঠায় নদী নিজ গতিতে তার পথ কেটে চলবে ও (4) উপরের পাহাড়ী পথের অর্জিত দ্রুতগতি অনেক দূর বজায় থাকায় নদীপথে জলের গতি যথেষ্ট বাড়বে। উপরিউক্ত চারটি কারণে প্রবাহমাত্রা বহুগুণ বেড়ে যাবে। তারপর নদীটির বিস্তার সুষমভাবে গড়ে তুললে নদী নিজেই তার পথকে গভীর করে নেবে এবং তখন দামোদরের ঐ পথে 5-6 লক্ষ কিউসেক হারে জল প্রবাহিত হওয়া অসম্ভব হবে না।

এছাড়া বর্তমানে নতুন কংসাবতীসহ শিলাবতী ও হুগলী নদী প্রায় লম্বভাবে রূপনারায়ণে পতিত হওয়াতে রূপনারায়ণ ও ঐ নদী দুটি পরস্পরের বিরুদ্ধে জলের প্রাচীর গড়ে তুলছে, কিন্তু 25 মাইল দীর্ঘ চাঁওয়া নদীর পথকে সংস্কার করে শ্যামচক থেকে কংসাবতীর সমস্ত জলরাশিকে 2নং পথে সরাসরি হলদীতে পরিচালিত করা যেতে পারে আর শিলাবতীকে নাড়াজোল থেকে 3নং পথে হলদীতে প্রবাহিত করলে নতুন কংসাবতী ও শিলাবতীর জল আর রূপনারায়ণে জলের প্রাচীর গড়ে তুলবে না। এছাড়া গেঁওখালি থেকে হলদিয়া পর্যন্ত প্রস্তাবিত 1নং পথটি রূপনারায়ণ ও হুগলী নদী দুটির পথের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় ঐ জলের প্রাচীরটিও মিলিয়ে যাবে। ফলে সামগ্রিকভাবে সকল নদীর প্রবাহমাত্রা যথেষ্ট বাড়বে। [দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, গেঁওখালি থেকে কুলপি পর্যন্ত পথটি রূপনারায়ণের খাত এবং কুলপি থেকে হুগলী মোহানার পথটি অধুনালুপ্ত

চন্দনা* ও আদিগঙ্গার খাত হওয়ায় ঐ নদীপথটি প্রায় অর্ধ-বৃত্তাকার রূপ পেয়েছে, যাকে দামোদর ও হুগলী উভয় নদীর স্বার্থেই সরল করা একান্ত দরকার।

অতীতে দামোদর বারবার সংক্ষিপ্ততর পথে চলতে চেয়েছে এবং প্রবল প্লাবনের কারণ হয়েছে। এবার 1978 সালে সে সোমসারের কাছে কয়েকটি হানাপথ কেটে দক্ষিণ-পূর্বমুখী হয়ে ছুটে চলেছিল খণ্ডঘোষ ও রায়না অঞ্চল দিয়ে তার পথকে কিছুটা সংক্ষেপ করার জন্যে, যা মানুষের বাধা-দানের ফলে ব্যর্থ হয়ে যায়। হয়ত অনেক বিপর্যয়ের পর দামোদর তার সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত পথটি খুঁজে পাবে। কিন্তু এখন তাকে ঐ পথে পরিচালিত করলে ভবিষ্যতের সেই বিপর্যয়গুলি এড়ানো যাবে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, নদীগুলিকে ঠিক কোন্ পথে সরল করা হবে, তা নির্ভর করবে ঐ অঞ্চলে অবস্থিত আমাদের সম্পদগুলির উপর এবং বর্তমান নিবন্ধে ঐ পথের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে মনে রাখা দরকার যে, কোন একটি নদীকে নতুন পথে পরিচালিত করতে হলে এখনই ঐ পথে তার পূর্ণ প্রবাহের উপযোগী খাত খননের প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন শুধু একটি মাঝারি ধরণের খাত খনন করে নদীটির চলার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা। কারণ নদীকে সম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলা মানুষের সাধ্যাতীত। সেই কাজ করতে পারে একমাত্র নদী নিজেই, যদি সে ঐ কাজের উপযুক্ত পরিবেশ পায়, অর্থাৎ ঢাল ও গতিমুখের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সরল পথ হলে নদী নিজেই তার পথকে কয়েক বৎসরের মধ্যে গভীর করে কেটে নিয়ে প্রবাহিত হবে এবং পুরানো পথটি পরিহার করবে। অতীতে প্রাকৃতিক কারণে অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় উত্তরবঙ্গে তিস্তা, পূর্ববঙ্গে ব্রহ্মপুত্র, বিহারে কুশী প্রভৃতি নদীগুলি তাদের পথকে পরিবর্তিত করেছে।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, যেহেতু প্রবল বন্যার তীব্র গতি নদীখাত কাটায়, সেহেতু 1770 সালে দামোদর নদ ও 1787 সালে তিস্তা নদী মাত্র একটি বন্যাতেই তার পথের অনেকটাই কেটে নিয়েছিল এবং 3 বা 4 বৎসরের মধ্যে তারা নতুন পথে চলা শুরু করেছিল। পূর্ববঙ্গে যে যমুনা নদীতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মাত্র 1 বা 2 লক্ষ কিউসেক ধারা বয়ে চলতো, আজ সেখানে তিস্তা-ব্রহ্মপুত্রের 20 বা 25 লক্ষ কিউসেক ধারা বয়ে চলেছে। ব্রহ্মপুত্র তার উপরিউক্ত 100 মাইল দীর্ঘ পথটি গড়ে তুলতে প্রায় 37 বৎসর (1787—

*ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে চন্দনা নদী গোয়ালন্দর কাছে পদ্মা থেকে বহির্গত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী পথে যশোরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আদি-গঙ্গায় মিলিত হত।

1824 সালে) সময় নিয়েছিল। এছাড়া গড়াই নদী 10 বৎসরে (1820—1830 সালে) তার পথটি গড়ে নিয়েছিল [সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত] কাজেই কংসাবতী, শিলাবতী, দামোদর প্রভৃতি পাহাড়ী নদী হওয়ায় নিবন্ধে বর্ণিত পথগুলি কাটাতে 2 বা 3টি বন্যার প্রয়োজন হবে, তবে হুগলী নদীর মোহানার কাছের পথটি কাটাতে নদীর 7 বা 8 বৎসর সময় লাগতে পারে।

পথের বাধা—1978 সালের সেপ্টেম্বরে বন্যার সময় দেখা যায় যে, দুর্গাপুর ব্যারাজের উজানে নদীবক্ষে বা ব্যারাজ-পণ্ডে (Barrage-Pondএ) কয়েক কোটি টন বালি ও পলি জমে সৃষ্টি হয়েছে দু'মাইল দীর্ঘ এক সুবিশাল চর। ফলে দুর্গাপুর ব্যারাজের সমস্ত স্লুইস্-গেট খুলে যেখানে 6·5 লক্ষ কিউসেক হারে জল বেরিয়ে যাওয়ার কথা, সেখানে ঐ বিশাল চরের জন্য 3·8 লক্ষ কিউসেকের বেশী হারে জল নির্গমন করা সম্ভব হয় নি। এজন্য বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশের জল ছোট ছোট নদী বা খাল দিয়ে দামোদরে এসে পড়তে পারে নি, বরং দামোদর থেকে উল্টো চাপে বিপুল জলরাশি ঐসব নদী ও খাল বেয়ে দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ ও আসানসোলের শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলে প্লাবন ডেকে আনে। ঐ সময় দামোদরের উচ্চ উপত্যকায় তিনদিনে গড়ে মাত্র 8 ইঞ্চি ও দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে 18 ইঞ্চি বৃষ্টি হওয়ায় দুর্গাপুরের লৌহ-ইস্পাত কারখানাসহ বহু কলকারখানা 2-3 দিন প্রায় 4 ফুট জলের তলে ছিল এবং রানীগঞ্জ-আসানসোলের 80টি কয়লাখনি নিমজ্জিত হয়েছিল। ফলে কয়েকশ' কোটি টাকার ক্ষতি হয়। এভাবে দুর্গাপুর ব্যারাজের জন্য দামোদরের উচ্চ-উপত্যকাতেও বন্যা ছড়িয়ে পড়ে। তখন বাধ্য হয়ে ব্যারাজের উজানে দামোদরের দক্ষিণ পাড় ভেঙে বাঁকুড়া জেলার 250 বর্গমাইল এলাকা প্লাবিত করাতে ঐ শিল্পাঞ্চলটিকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

কিন্তু আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, দামোদরের উচ্চ-উপত্যকায় তিনদিনে গড়ে 16 ইঞ্চি বৃষ্টি হলে জলাধারগুলি থাকা সত্ত্বেও দুর্গাপুরের কাছে দামোদরে 6 লক্ষ কিউসেক হারে জল আসবে। তখন নিবন্ধে বর্ণিত দামোদরের পথে প্রায় 6 লক্ষ কিউসেক হারে জল প্রবাহিত হলেও ঐ পথের সবচেয়ে বড় বাধা হবে দুর্গাপুর ব্যারাজের উজানে জমে যাওয়া বিশাল চর। ফলে সেদিন ভারতের রূঢ় বর্ধমান জেলার শিল্পাঞ্চল হয়তো 7-8 ফুট জলের তলে ডুবে থাকতে পারে। অর্থাৎ যে দুর্গাপুর ব্যারাজ শিল্পাঞ্চলটিকে জল দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেই ব্যারাজ তার ধ্বংসের কারণ হবে।

এছাড়া কয়েক ঘণ্টা উক্ত হারে জল আসার পর দুর্গাপুর ব্যারাজ বা তার পার্শ্ব সংলগ্ন বাঁধ ভেঙে যেতে পারে। তখন 1978-এর ময়ূরাক্ষী ও হিংলো নদীদুটির মত নদীর জল ছুটে এসে জেলায় পর জেলা নিশ্চিহ্ন করে দামোদর

হয়তো কোন নতুন পথে চলবে। 1978-এ আমরা শত শত জীবন দিয়ে ময়ূরাক্ষী ও হিংলো নদীর হঠাৎ-আসা 4 লক্ষ ও 1 লক্ষ কিউসেক হারে প্রবাহিত জলের ক্ষমতা দেখেছি, সেদিন হয়তো নতুন পথে দামোদরের 6 লক্ষ কিউসেক হারে হঠাৎ-প্রবাহিত জলের ক্ষমতা সহস্র মানুষের জীবনের বিনিময়ে উপলব্ধি করতে হতে পারে।

প্লাবনরোধে দামোদর নদের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা—আমরা দেখেছি গত 70-80 বৎসরে দামোদরে 6·5 লক্ষ কিউসেকের বেশি হারে জল আসে নি, তাই 6·5 লক্ষ কিউসেকের প্রবাহকে 2·5 লক্ষ কিউসেকে কমিয়ে এনে বন্যা রোধ করতে চেয়েছি। কিন্তু তার জন্যে কত ঘণ্টায় কত পরিমাণ জল ধরে রাখতে হবে এবং তা রাখা সম্ভব কি না, সে হিসাবটি এবারের প্রবল বর্ষণের পর নতুনভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। কারণ আগের হিসাবটি করা হয়েছে গত 70-80 বৎসরের বৃষ্টিপাতের ভিত্তিতে, কিন্তু নদীর জীবন তো মানুষের মত 70-80 বৎসর নয়, এমনকি শত বা সহস্র বৎসর নয়, শত সহস্র বৎসর। আমরা কি ঠিকমত জানি, যে বন্যায় দামোদর দু'শ বৎসর আগে 1770 সালে পূর্বমুখী থেকে হঠাৎ দক্ষিণমুখী খাত কেটেছিল, তখন কত লক্ষ কিউসেক জল কত দিন ধরে এসেছিল ? কিংবা এক-শ' বৎসর আগে 1882 সালে বা দেড়-শ' বৎসর আগে 1823 সালে যে বন্যাগুলিতে দামোদর উপত্যকার এক বিশাল অঞ্চল প্লাবিত হয়েছিল, তখনই বা কত পরিমাণ জল এসেছিল ? আমরা কি বলতে পারি, কি পরিপ্রেক্ষিতে বা কি পরিস্থিতিতে দামোদর অতীতে খাড়ি নদীপথ থেকে বাঁকা নদীপথ এবং বাঁকা নদীপথ থেকে বেহুলা নদীপথ নতুন করে গড়ে নিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল ?

কাজেই ভবিষ্যতে দামোদরের বন্যা থেকে মুক্তি পেতে হলে দুর্গাপুর ব্যারাজের উজানে জমে যাওয়া বিশাল চর অবিলম্বে সরিয়ে দিয়ে এর জল নির্গমন ক্ষমতা সর্বদাই 6·5 লক্ষ কিউসেকে বজায় রাখতে হবে এবং নিবন্ধে বর্ণিত পথে দামোদরকে পরিচালিত করতে হবে, যাতে নদীটি ঐ সরল সংক্ষিপ্ত ঢালু পথটিকে নিজেই তার প্রবাহমাত্রার উপযোগী করে গড়ে নিতে পারে। এছাড়া, যেহেতু অজয় ও ময়ূরাক্ষী নদী দুটির অববাহিকায় 1978-এর সেপ্টেম্বরে 36 ঘণ্টাতেই 20 ইঞ্চি হওয়ায় প্রতি 1 হাজার বর্গমাইল আবহক্ষেত্রের জন্য 2 লক্ষ কিউসেক হারে জল এসেছিল, [37 পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য] সেহেতু মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার দুটির জল নির্গমন ক্ষমতা (Discharge Capacity) অনুরূপ প্রবাহের উপযোগী করে রাখা দরকার।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কংসাবতী ও শিলাবতীকে তাদের নির্ধারিত পথে প্রবাহিত করলে ঐ নদী দুটির জল রূপনারায়ণে যে অতিরিক্ত জলের চাপ

সৃষ্টি করত তা আর থাকবে না। নিবন্ধে আলোচিত পথে শুধু দ্বারকেশ্বর ও দামোদরের উচ্চ উপত্যকার জলই প্রবাহিত হবে। মুণ্ডেশ্বরীর খাতকে বন্ধ করে ও দামোদরের পরিত্যক্ত খাতটি সংস্কার করে দামোদর ও ভাগীরথীর মধ্যবর্তী বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলাগুলির মধ্যাঞ্চলের 2 হাজার বর্গমাইলবিশিষ্ট প্রায় সমতল অঞ্চলের জল ফলতার কাছে হুগলী নদীতে নেমে আসবে। এক কথায় বলা যায় যে, বিভিন্ন নদীর উচ্চ উপত্যকার জলসহ বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলাগুলির জল সুষমহারে বণ্টিত হয়ে বিভিন্ন নদীপথ ধরে দ্রুত সাগরে পৌঁছে যাবে। ফলে প্লাবনের সম্ভাবনা যথেষ্ট কমে যাবে।

মনে রাখতে হবে, ভাগীরথী-হুগলীর মাইল প্রতি ঢাল যেখানে মাত্র 3 ইঞ্চি, সেখানে দুর্গাপুর থেকে দামোদরের মাইল প্রতি ঢাল গড়ে 1 ফুট হওয়ায় তার বন্যার জলের গতি অনেক বেশী এবং নদীখাত কাটানোর ক্ষমতাও অধিক। ফলে দামোদর নদের জলের দ্রুত গতি নদীখাতমুখী হওয়ায় তার নিজস্ব খাত পরিষ্কার রাখা ছাড়াও হুগলী মোহানার জমা পলি সরিয়ে দেবে। [অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত] এতে হুগলী নদীর নাব্যতা বজায় থাকবে এবং কলিকাতা ও হলদিয়া বন্দর দুটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। এছাড়া রূপনারায়ণ নদীটি আরামবাগ পর্যন্ত সর্ব-ঋতুতে নাব্য হয়ে উঠবে এবং বর্ষাকালে দুর্গাপুর পর্যন্ত জলপথে পরিবহন সম্ভব হবে! কোলাঘাট থেকে হলদিয়া পর্যন্ত পথটিতে সড়ক ও রেলপথে যোগাযোগের সঙ্গে জলপথে যোগাযোগ গড়ে ওঠায় হুগলী নদীর মত রূপনারায়ণ নদের তীরে তীরে বহু শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠবে। বিশেষ করে কোলাঘাটে একটি সুপরিকল্পিত নগরী গড়ে তুললে কলিকাতার উপর চাপ যথেষ্ট কমানো যাবে।

আবার যেহেতু দামোদর ঐ পথে তার পূর্ণ প্রবাহ নিয়ে সাগরে পৌঁছে যেতে পারবে সেহেতু জলাধারগুলিতে বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য যে 10·5 লক্ষ একরফুট প্রতি বৎসর খালি রাখা হয়, সে অংশটি জলে ভরে নেওয়া যাবে এবং ডি. ভি. সি.-র জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বা সেচসেবিত এলাকা বর্তমান ক্ষমতার প্রায় 80 শতাংশ বাড়ানো যাবে।

উপসংহার—বন্যার প্রবল গতি যেহেতু নদীখাত কাটায়, সেহেতু জলাধারগুলির দ্বারা বন্যানিয়ন্ত্রণের অর্থ হল নদীখাত দ্রুত মজে যাওয়া বা পরবর্তীকালে স্বল্প বৃষ্টিতেই বন্যার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলা,—যা আজকের দামোদর উপত্যকায় বারবার অনুভূত হচ্ছে। অর্থাৎ বন্যানিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই পরে প্লাবণের কারণ হয়ে উঠছে। [অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত] একটি হিসাবে দেখা যায়, যে টেনেসি উপত্যকা প্রকল্পের অনুসরণে দামোদর পরিকল্পনা গড়া হয়েছে, সেখানে প্রকল্প রূপায়ণের পরবর্তী 25 বৎসরে প্লাবনের ফলে ক্ষতি

ঐ প্রকল্প রূপায়ণের পূর্ববর্তী 25 বৎসরের তুলনায় পরিমাণগতভাবে দ্বিগুণ হয়েছে।

বর্তমানে যেহেতু জলাধারগুলির সাহায্যে আমরা সহজেই কৃত্রিম বন্যা সৃষ্টি করতে পারি, সেহেতু একটি প্রবল বর্ষণের পর যখন জলাধারগুলি পরবর্তী বর্ষণের জন্য খালি করা হয়, তখন সেই জল ধীরে ধীরে না ছেড়ে, যে সময়ে নিম্ন উপত্যকায় ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা থাকবে না, সেই সময়ে জনসাধারণকে সতর্ক করে কৃত্রিম বন্যা সৃষ্টি করে ছাড়া দরকার। ফলে নদীর খাত কাটানোয় যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাবে। অবশ্য তার পূর্বে নদীপথটিকে যতদূর সম্ভব সরল করা প্রয়োজন। এরূপ কৃত্রিম বন্যার ফলে যদি ছোটখাটো প্লাবনও হয়, তাহলে সে প্লাবন অধিক দিন স্থায়ী না হওয়ায় তা নদী ও কৃষিভূমি উভয়ের পক্ষে মঙ্গলকারক হবে। কাজেই জলাধারগুলির দ্বারা বন্যা নিরুদ্ধ করা আমাদের লক্ষ্য না হয়ে ওদের দ্বারা কৃত্রিম বন্যার সাহায্যে নদীখাত কাটানো এবং সীমিত প্লাবনের মাধ্যমে [নদীর সমান্তরাল বাঁধের মাঝে মাঝে স্লুইস্-গেট ও সেচখালের সাহায্যে] নিম্ন উপত্যকাকে উঁচু ও উর্বর করাও আমাদের লক্ষ্য হওয়া একান্ত দরকার। নদীকে ধ্বংস করার পরিবর্তে জলাধারগুলি এইভাবে নদীকে গড়ে তুলতে পারে। [সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত]

পরিশিষ্ট—বর্তমান যুগে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আর বিশালকার জলাধারের প্রয়োজন হয় না। সারাদিন ধরে জলবিদ্যুতের জন্য যে জল জেনারেটরের পথ বেয়ে নীচে নেমে আসে, সেই জল নীচে ছোট একটি জলাধারে সঞ্চিত করে রাখা হয়। পরে রাত্রিতে যখন বিদ্যুতের চাহিদা কম থাকে, তখন উৎপন্ন অতিরিক্ত তাপবিদ্যুতের সাহায্যে জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রের জেনারেটরকে মোটরে এবং টারবাইনকে পাম্পে রূপান্তরিত করে নীচের জলাধারের জল উপরের জলাধারে পৌঁছে দেওয়া হয় পরদিন ব্যবহারের জন্য। এভাবে একই জল কাজে লাগিয়ে প্রতিদিন রাত্রিকালীন অপচিত তাপবিদ্যুতের পরিবর্তে দিবাভাবে চাহিদার সময় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। ডি. ভি. সি.-র তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে অপচিত তাপবিদ্যুতের পরিবর্তে ঐভাবে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে।*

---

*তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ ও এপ্রিল, 1979 সংখ্যাদ্বয়'টিতে প্রকাশিত।

নদীবিজ্ঞানের কথা

চতুর্থ অধ্যায়

ফরাক্কা ব্যারাজের অভিশাপ

ফরাক্কা ব্যারাজ প্রকল্পের কথা—পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতা হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। এই কলিকাতা শুধু পূর্বভারতের নয়, পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম বন্দর। বন্দরটি সমুদ্র থেকে নদীপথে 125 মাইল উজানে অবস্থিত। কলিকাতাকে কেন্দ্র করে পূর্বভারতের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে হুগলী নদীর দু'তীরে। শুধু তাই নয়, সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের বারটি জেলার জলনিকাশী ব্যবস্থাও হুগলী নদীর উপর নির্ভরশীল। মুর্শিদাবাদ জেলায় সূতীর কাছ থেকে গঙ্গানদীর একটি ধারা পদ্মানামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে, আর অন্য ধারাটি ভাগীরথী নামে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে বয়ে এসেছে। নবদ্বীপ শহরের নিম্নাংশ থেকে এই ভাগীরথীই বর্তমানে হুগলী নদী নামে খ্যাত। গত কয়েক শতাব্দী ধরে গঙ্গার মূলধারা পদ্মার পথে ছুটে চলেছে। ফলে ভাগীরথী-হুগলী শীর্ণকায় হয়ে দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সাথে সাথে কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ অর্থনৈতিক মৃত্যুর দিন গুণছে। 50 বৎসর পূর্বেও এই নদী যথেষ্ট নাব্য ছিল। কলিকাতা পর্যন্ত সমুদ্রগামী জাহাজ অনায়াসে আসতে পারত ; ষ্টিমারগুলি চন্দননগর, মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, পাটনা ও এলাহাবাদ হয়ে কানপুর পর্যন্ত যাতায়াত করত। কিন্তু গত 50 বৎসরে ভাগীরথীর খাত পলি জমে দ্রুত উঁচু হয়ে ওঠে। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলায় নদীখাতটি প্রতি বৎসর 3 ইঞ্চি হারে উঁচু হতে থাকে। বর্তমানে ভাগীরথীর খাতটি উৎসমুখে গঙ্গার খাতের চেয়ে প্রায় 24 ফুট উঁচু হওয়ায় বর্ষার সময় ছাড়া গঙ্গার জলধারা আর ভাগীরথীতে প্রবেশ করে না। ফলে নিম্নাংশে হুগলী নদীর খাতও দ্রুত ভরাট হয়ে যাওয়ায় সমুদ্র থেকে আগত জাহাজগুলির কলিকাতা বন্দরে ভিড়তে অসুবিধা হয়। এজন্য সমুদ্রের কাছাকাছি হলদিয়াতে হুগলী নদীর তীরে একটি সহযোগী বন্দর গড়া হয়েছে। হুগলী নদীকে পুনরুজ্জীবিত করে কলিকাতা ও হলদিয়া বন্দরসহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষার জন্য ফরাক্কা ব্যারাজ প্রকল্প গৃহীত হয় 1960 সালে। এই প্রকল্প অনুযায়ী 156 কোটি টাকা ব্যয়ে ফরাক্কায় গঙ্গার উপর 7366 ফুট দীর্ঘ পৃথিবীর বৃহত্তম ব্যারাজ নির্মাণের কাজ শেষ হয় 1970 সালে। তারপর

ফরাক্কা ব্যারাজের উজানে গঙ্গানদী থেকে জঙ্গীপুরে ভাগীরথী নদী পর্যন্ত 26 মাইল দীর্ঘ ও 600 ফুট প্রশস্ত একটি খাল বা ফীডার ক্যানাল (Feeder Canal) কাটানো হয় প্রায় 30 কোটি টাকা ব্যয়ে। ফরাক্কা ব্যারাজের সাহায্যে গঙ্গার জলতল প্রয়োজনমত উঁচু করে ঐ খাল দিয়ে 1975 সালের এপ্রিল মাস থেকে গ্রীষ্মের 2-1 মাস ছাড়া অবিরাম 40 হাজার কিউসেক বা প্রতি সেকেণ্ডে 40 হাজার ঘনফুট হারে গঙ্গার জল অনুপ্রবিষ্ট করানো হয় ভাগীরথী-হুগলী নদীর খাতে। এছাড়া ঐ জল যাতে ভাগীরথীর উজান পথ বেয়ে গঙ্গায় ফিরে যেতে না পারে, সেজন্য জঙ্গীপুরে ভাগীরথীর উপর অপর একটি ব্যারাজ নির্মিত হয়। [14 পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য] ফরাক্কা ব্যারাজের উপর দিয়ে সড়ক ও রেলপথে উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হয়। এভাবে 200 কোটির অধিক টাকা ব্যয়ে যে ফরাক্কা ব্যারাজ প্রকল্প রূপায়িত করা হল, সেই প্রকল্পটি গঙ্গা ও হুগলী নদী দু'টির উপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে, তাই বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

গঙ্গার পরিবর্তনশীল নদীগর্ভ ও ফরাক্কা ব্যারাজ—ফরাক্কায় গঙ্গানদীর বিস্তার প্রায় দেড় মাইল। সেখানে যে ব্যারাজ গড়া হল তার ভিত হল 7 ফুট পুরু সামান্য খিলানের ন্যায় (Arch-shaped) কংক্রীট ঢালাই, যা নদীগর্ভে রাখা আছে 30 ফুট থেকে 40 ফুট দীর্ঘ অসংখ্য পাইল-এর (Pile) উপর। [পরবর্তী অধ্যায়ের চিত্র দ্রষ্টব্য] এই ব্যারাজে একজোড়া লকগেট (Lock-gate) ও 108টি স্লুইস্-গেট (Sluice-gate) আছে, যাদের প্রতিটির বিস্তার 60 ফুট ও উচ্চতা 26 ফুট। কিন্তু যেহেতু ফরাক্কায় গঙ্গানদীর বিস্তার 7 হাজার ফুটের অধিক, সেহেতু এখানে নদীগর্ভ (River-bed) কখনই সমতল থাকতে পারে না। কোথাও থাকে বিশাল চর, আবার কোথাও গভীর খাত। এক বর্ষায় যেখানে বিশাল চর, অন্য বর্ষায় সেখানে হয়ত গভীর খাত। এমনকি কয়েকদিনের মধ্যে কয়েক শ' ফুট বিস্তৃত চর বা খাত গড়ে ওঠা বিচিত্র নয়। গঙ্গার মত অতিবিস্তৃত নদীতে সুউচ্চ চর ও গভীর খাতের মধ্যে উচ্চতার ব্যবধান 20 ফুটের অধিক হতে দেখা যায়। কিন্তু যে কোন ব্যারাজের স্লুইস-গেটগুলির নীচে কংক্রীট ভিত নদীগর্ভে বা (Rever-bed)-এ রাখা একান্ত প্রয়োজন। তাহলে যে গঙ্গাগর্ভ এত দ্রুত পরিবর্তনশীল, সেই গঙ্গায় ব্যারাজ নির্মাণ করা বাস্তবসম্মত কী? কারণ এক অঞ্চলে সুবিশাল চর সৃষ্টি হয়ে যে কোন সময় বহু স্লুইস (Sluice) বন্ধ হয়ে যেতে পারে আবার অন্য অঞ্চলে গড়ে উঠা গভীর খাত ব্যারাজের কংক্রীট ভিতকে বিপন্ন করতে পারে। যেমন বর্তমানে ফরাক্কায় বামতীরে গড়ে উঠেছে সুবিশাল চর আর ডানতীরে গভীর খাত কেটে নদী বয়ে চলেছে প্রবল স্রোতে।

গঙ্গার বন্যা ও ফরাক্কা ব্যারাজের জলনির্গমন ক্ষমতা—ফরাক্কা ব্যারাজের সমস্ত স্লুইস্-গেট সম্পূর্ণ খুলে দিলে প্রতি সেকেণ্ডে 27 লক্ষ ঘনফুট জল প্রবাহিত হতে পারে, অর্থাৎ ঐ ব্যারাজের সর্বোচ্চ জলনির্গমন ক্ষমতা (Discharge-Capacity) হল 27 লক্ষ কিউসেক। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, গঙ্গা ও তার উপনদীগুলিতে যে অঞ্চলের জল বয়ে আসে, (বা ওদের আবহক্ষেত্র) তা হল প্রায় 3 লক্ষ বর্গমাইল, যার অনেকটা হিমালয় পর্বতমালার সানুদেশ নিয়ে গড়ে উঠেছে। হিমালয়ের কোণে কোণে কখন কি বিপুল পরিমাণ বৃষ্টি হতে পারে, পাহাড়ী ধস নেমে নদীতে কোন হ্রদ সৃষ্টি হয়ে আবার ভেঙে পড়তে পারে বা কোন উপনদীর পথে কী পরিমাণ জল হঠাৎ আসতে পারে, তার সম্যক্ জ্ঞান আমাদের নেই। এছাড়া পাটনা ও মোকামায় রেল-কর্তৃপক্ষের কাছে গঙ্গার বন্যার যে সর্বোচ্চ পরিমাণ রাখা আছে, তা হ'ল প্রায় 32·5 লক্ষ কিউসেক। কাজেই ফরাক্কায় গঙ্গানদীতে 35 লক্ষ কিউসেকের বন্যা আসার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। সেক্ষেত্রে 27 লক্ষ কিউসেক জলনির্গমন ক্ষমতা নিয়ে গড়া ফরাক্কা ব্যারাজের জন্য গঙ্গানদী যে কোন মুহূর্তে ব্যারাজ-সংলগ্ন বাঁধ ভেঙে কয়েক লক্ষ কিউসেক ধারা নিয়ে ভিন্নপথে প্রবাহিত হয়ে সহস্র লোকের জীবন ও বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি ধ্বংসের কারণ হতে পারে। প্রসঙ্গত বলি 1978 সালের সেপ্টেম্বরে অনুরূপ কারণে বীরভূম জেলায় হিংলো নদীর খয়রাশোল ড্যামের মাটির বাঁধ ভেঙে অজয় নদ দু'তিনটি পথে এবং ময়ূরাক্ষী নদীর তিলপাড়া ব্যারাজ-সংলগ্ন বাঁধ ভেঙে ময়ূরাক্ষী নদী নতুন পথে চলতে শুরু করে এবং প্রবল জলস্রোতে প্রায় 700 লোকের সলিল-সমাধি ঘটে। [দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত]

ফরাক্কা ব্যারাজের উঁচু কংক্রীট ভিত ও গঙ্গার ভবিষ্যত প্লাবন—1966 সালে যখন ফরাক্কা ব্যারাজ গড়ার কাজ শুরু হয়, তখন ফরাক্কায় গঙ্গানদী প্রধানত মাঝে একটি বিশাল চর (+44 ফুট উঁচু*) সৃষ্টি করে দু'পাশে দুটি গভীর খাতে (+24 ফুট উঁচু) বয়ে যেত,—যে চর ও খাতদু'টির মধ্যে উচ্চতার ব্যবধান ছিল 20 ফুট। এটাই হল সেখানে গঙ্গার প্রায়-স্বাভাবিক নদীগর্ভ (আমি পূর্বেই বলেছি, গঙ্গানদীর গর্ভ পরিবর্তনশীল)। কিন্তু ফরাক্কায় যে ব্যারাজ গড়া হল, তার স্লুইস্-গেটগুলির নীচে কংক্রীট ভিতটি মাঝের চর থেকেও 8 ফুট উঁচুতে রাখা হল। ফলে ব্যারাজের কংক্রীট ভিত গঙ্গার গভীরতর খাতদু'টি থেকে 28 ফুট এবং গড় গঙ্গাগর্ভ (+34 ফুট উঁচু) থেকে 18 ফুটের মত উঁচু হয়ে উঠল। কিন্তু গঙ্গাগর্ভ থেকে গড়ে 18 ফুট উঁচু নিশ্ছিদ্র কংক্রীট ভিতের জন্য ব্যারাজের উপরাংশে গঙ্গার তলদেশে

* +44 ফুট উঁচু বলতে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 44 ফুট উঁচু বুঝতে হবে।

জমা পলি নদী তো আর স্রোতের দ্বারা কেটে নিতে পারবে না। তাই ব্যারাজের উপরাংশে গঙ্গাগর্ভ কয়েক দশকে প্রায় 20 ফুট উঁচু হয়ে উঠবে বলে অনুমান করা যায়। ফলে ভবিষ্যতে ফরাক্কা ব্যারাজের উজানে রাজমহল পাহাড়ের কোলে গঙ্গাগর্ভ প্রায় 20 ফুট উঁচু হওয়ায় এবং উত্তর প্রদেশে গঙ্গাগর্ভ স্বাভাবিকভাবে উঁচু থাকায় বিহারে গঙ্গানদীর মধ্যাঞ্চলটি আর নীচু থাকতে পারবে না। কাজেই সমগ্র বিহারে গঙ্গাগর্ভ অদূর ভবিষ্যতে 10-15 ফুট উঁচু হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকবে। তখন একই জলপ্রবাহের জন্য গঙ্গানদীর উপরিস্থিত জলতল অনুরূপ মাত্রায় উঁচু হয়ে উঠবে এবং দু'তীরবর্তী পাড়বাঁধ উপচে বিহারের গাঙ্গেয় উপত্যকা প্রলয়ঙ্কর প্লাবনের কবলে পড়বে। আবার যেহেতু বিহারের পূর্বাঞ্চলে গঙ্গাগর্ভ পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় অধিক হারে উঁচু হয়ে উঠবে, সেহেতু গঙ্গাগর্ভের মাইল প্রতি ঢাল বর্তমানের চেয়ে কমে যাবে। ফলে জলের গতি স্তিমিত হওয়ায় সেই প্লাবনগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে। এছাড়া বিহারে গঙ্গার তলদেশ উঁচু হওয়ায় পুনপুন, শোন, কমলা, কুশী, গণ্ডক, ঘর্ঘরা প্রভৃতি গঙ্গার উপনদীগুলির জলনির্গমনে অসুবিধা দেখা দেবে। ফলে মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকা শুধু যে দীর্ঘকালস্থায়ী প্লাবনের কবলে পড়বে তাই নয়, ঐ উপত্যকার জলনিকাশী ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। মনে রাখা দরকার, গঙ্গাই হল সমগ্র আর্যাবর্তের জলনির্গমনের একমাত্র পথ, [4 পৃষ্ঠায় মানচিত্র দ্রষ্টব্য] সেই পথে বাধা সৃষ্টি করে গঙ্গাগর্ভ উঁচু করার অর্থই হল উত্তরভারতের এক বিশাল অঞ্চলের ধ্বংস ডেকে আনা। ফরাক্কা ব্যারাজ নির্মাণকালে আমরা এ কথাটি কেন বিস্মৃত হলাম ?

ফরাক্কা ব্যারাজের উজানে গঙ্গার চর ও মালদহ জেলায় গঙ্গার ভাঙন— ফরাক্কা ব্যারাজের কংক্রীট ভিতটি গঙ্গাগর্ভ থেকে গড়ে 18 ফুট উঁচুতে থাকায় পূর্বোক্ত কারণে ব্যারাজের উজানে গঙ্গাগর্ভে (Barrage Pond-এ) কয়েক কোটি টন বালি ও পলি জমে বর্তমানে গড়ে উঠেছে প্রায় 7 মাইল দীর্ঘ এক সুবিশাল চর। আবার ব্যারাজের ডানতীরে ফীডার ক্যানাল (Feeder Canal) থাকায় এবং 24টি স্লুইসের (Sluice or Bay) কংক্রীট ভিত অন্যগুলির চেয়ে 5 ফুট নীচুতে থাকায় জলের তীব্রগতির জন্য ডানতীরে পলি পড়ার হার অপেক্ষাকৃত কম। ফলে গঙ্গার মূলধারা ডানতীরে সরে আসে, আর বামতীরে পলি জমে শুধু আগেকার গভীরতর খাতটি ভরাট হয়নি, 22 ফুট উঁচু সুবিশাল চর বামতীরের প্রায় অর্ধেক স্লুইসকে অকেজো করে দিয়েছে। এজন্য যেখানে 60 ফুট বিস্তৃত প্রতিটি স্লুইস দিয়ে বন্যার সময় প্রায় 30 হাজার কিউসেক হারে জল বয়ে যাওয়ার কথা, সেখানে বর্তমানে বামতীরের প্রতি স্লুইস দিয়ে জল যাচ্ছে মাত্র 20 হাজার কিউসেক

আর ডানতীরের প্রতি স্লুইস দিয়ে জল ছুটছে 40 হাজার কিউসেক ! এতে শুধু যে ফরাক্কা ব্যারাজের অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে তাই নয়, বন্যার জল সুষ্ঠুভাবে নির্গমন না হওয়ায় গঙ্গার পথ পরিবর্তনের সম্ভাবনা বেড়েই চলেছে।

এছাড়া ফরাক্কার উজানে বামতীরে সৃষ্ট ঐ বিশাল চরের জন্য আগেকার বামতীরের খাত ধরে নেমে আসা বিপুল জলরাশি পথ না পেয়ে মালদহ জেলায় 45 মাইল দীর্ঘ পাড়বাঁধে (Afflux Bund) বা তোফি বাঁধে ভাঙন সৃষ্টি করছে, যার ফলে গত এক দশকে 6·5 হাজার একর জমি গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বন্যার সময় ঐ জলরাশি আছড়ে পড়ছে পূর্বোক্ত তোফি বাঁধের উপর, যে বাঁধ গঙ্গার প্লাবন থেকে মালদহ জেলাকে রক্ষার জন্য নির্মিত হয়েছিল। [ষষ্ঠ অধ্যায়ে 3C চিত্র দ্রষ্টব্য] 1980 সালে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে হিমালয়ের কোলে গাঙ্গেয় উপত্যকায় অঝোর ধারায় যে বৃষ্টি ঝরে পড়ল, তাতে ফারাক্কায় গঙ্গার বুকে নেমে এল 25-26 লক্ষ কিউসেকের বন্যা আর গঙ্গার জলতল সর্বকালীন রেকর্ড ছাপিয়ে গেল। 19শে আগষ্ট থেকে 23শে আগষ্ট ও পরবর্তীকালে 5ই সেপ্টেম্বর থেকে 10ই সেপ্টেম্বর 25 লক্ষ কিউসেকের বন্যা বয়ে গেছে ফরাক্কা ব্যারাজ দিয়ে, যখন গঙ্গার জলতল সেখানে বিপদচিহ্নের (+73 ফুট উঁচু) চেয়ে 6 ফুটের অধিক উপরে ছিল। (8ই সেপ্টেম্বর ফরাক্কায় গঙ্গার জলতল বিপদচিহ্নের 8 ফুট উপরে বা +81 ফুট ছিল।) লক্ষ্যণীয় যে, ঐ বৎসর 3রা আগষ্ট থেকে 28শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ 55 দিন ধরে গঙ্গার জল ফরাক্কায় বিপদ-চিহ্নের উপরে ছিল। এটাই ফরাক্কার উজানে গঙ্গাগর্ভ ভরাট হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত। এছাড়া 13ই আগস্ট ফরাক্কার উজানে বামতীরের তোফি বাঁধে ভাঙন দেখা দেয় আর বিপুল বেগে জল এসে মালদহ জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল দীর্ঘ 2 মাস যাবৎ জলের তলে ডুবিয়ে রাখে। ঐ সময় তোফি বাঁধে যে ভাঙন হয়েছিল, তা শুধু 1100 ফুট বিস্তৃতই ছিল না, 37 ফুটের অধিক গভীর হয়েছিল। অর্থাৎ ফরাক্কায় গঙ্গাগর্ভ ভরাট হওয়ায় গঙ্গানদী মালদহ জেলার মধ্য দিয়ে তার নতুন পথ গড়ে নিতে চাইছে।

ফরাক্কার ভাটিতে গঙ্গার গভীর খাত ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাঙন— ব্যারাজ গড়ার পূর্বে বন্যার সময় ফরাক্কাতে গঙ্গায় জলের সর্বোচ্চ গতি ছিল সেকেণ্ডে 16 ফুট। কিন্তু ফরাক্কার উজানে বামতীরে বিশাল চর জমে যাওয়ায় ডানতীর দিয়ে ছুটে আসা বন্যার জলের গতি সেকেণ্ডে প্রায় 24 ফুট হয়ে পড়ে। এজন্য ফরাক্কার ভাটিতে গঙ্গাগর্ভে সৃষ্টি হয়েছে 62 ফুট গভীর এক খাত। এখন ফরাক্কা ব্যারাজটি উজানে বামতীরে সুবিশাল চর ও ভাটিতে ডানতীরে সুগভীর খাতের মাঝে এক অস্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে এবং যে কোন

মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। ব্যারাজের উঁচু কংক্রীট ভিত থেকে গঙ্গার ডানতীর ধরে নেমে আসা ঐ তীব্র গতির জলস্রোতে মুর্শিদাবাদ জেলায় ফরাক্কা থেকে জলাঙ্গী পর্যন্ত দীর্ঘ 60 মাইল পথ জুড়ে ভাঙনের পর ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে। ঐ ভাঙনের ফলে গত এক দশকে শুধু 3·5 হাজার একর জমিই গঙ্গাগর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়নি, গঙ্গাতীরবর্তী 30টি গ্রামের হাজারখানেক গৃহ গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে কয়েক হাজার মানুষ গৃহহীন হয়েছে। আবার অপর পারে জলের গতি না থাকায় বাংলাদেশে নতুন নতুন ভূ-ভাগ সৃষ্ট হচ্ছে। এভাবে ভারতের জমি কমে বাংলাদেশে নতুন জমি গড়ে উঠছে। এছাড়া ধূলিয়ান বাঁধে ঐ ভাঙনের ফলে নিমতিতার কাছে গঙ্গা ও ভাগীরথীর ব্যবধান বর্তমানে এক কিলোমিটারের চেয়েও কমে গেছে। [ষষ্ঠ অধ্যায়ে চিত্র 3C দ্রষ্টব্য] যে হারে ভাঙন চলছে, তাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে ওখানে গঙ্গা ও ভাগীরথী একাকার হয়ে গঙ্গার প্রবল জলস্রোতে মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় ভাগীরথী-হুগলীর দু'তীরবর্তী গ্রাম ও শহর একদিন ভেসে যাবে। অবশ্য গঙ্গা ও ভাগীরথীর ঐ সংযোগ হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবনের সহায়ক হবে, যদি তার পূর্বেই ভাগীরথীর পথকে 1000 ফুট বিস্তৃত ও 20-25 ফুট গভীর এক সরলপথে রূপান্তরিত করা হয়, যাতে বর্ষাকালে 3-4 লক্ষ কিউসেকের বন্যা গঙ্গা থেকে সহজেই হুগলী নদীতে প্রবাহিত হতে পারে। [ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত]।

গঙ্গার ভাঙনরোধে 294 কোটি টাকার পরিকল্পনা ও গঙ্গার ভবিষ্যত পথ পরিবর্তন—ফরাক্কা ব্যারাজের উজানে মালদহ জেলায় ও ভাটিতে মর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গার ভাঙনরোধে প্রীতম্ সিং-এর নেতৃত্বে ছয় সদস্যের এক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়েছিল 1978 সালে। ঐ কমিটি মালদহ জেলার তোফি বাঁধ ও মুর্শিদাবাদ জেলার ধূলিয়ান বাঁধকে 294 কোটি টাকা ব্যয়ে বড় বড় পাথরের চাঁই (Boulder) ও কংক্রীট দিয়ে মজবুত করে বেঁধে দিতে সুপারিশ করে। এ পর্যন্ত 30 কোটি টাকা খরচ করাও হয়েছে। কিন্তু আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি, ফরাক্কা ব্যারাজের কংক্রীট ভিত গঙ্গাগর্ভ থেকে গড়ে 18 ফুট উঁচু থাকায় ভবিষ্যতে ফরাক্কার উজানে গঙ্গাগর্ভ কমপক্ষে 18 ফুট উঁচু হয়ে উঠবে। কিন্তু বর্তমানে বন্যার সময় গঙ্গার জলতল ব্যারাজের উপরিস্থিত রেলপথ ও সড়কপথ থেকে মাত্র 10 ফুট নীচে থাকে। অতএব সেখানে গঙ্গাগর্ভ 18 ফুট উঁচু হলে কি ঘটবে তা সহজেই অনুমেয়। তখন ফরাক্কা ব্যারাজের সমস্ত গেট সম্পূর্ণ খুলেও বন্যার জল নির্গমন করা সম্ভব হবে না। এছাড়া বন্যার সময় ফরাক্কাতে গঙ্গায় জলের গড় গভীরতা থাকে প্রায় 45 ফুট (+34 ফুট থেকে +79 ফুট পর্যন্ত) কিন্তু নিম্নাংশে গঙ্গাগর্ভ 18 ফুট ভরাট হওয়ার অর্থই হল গঙ্গার জলনির্গমন ক্ষমতা [Discharge Capacity]

শতকরা 40 ভাগ হ্রাস পাওয়া। অর্থাৎ ফরাক্কার গঙ্গার বর্তমান খাতে যদি 27 লক্ষ কিউসেক হারে জল বেয়ে যেতে পারে, ভবিষ্যতে সেখানে মাত্র 16 লক্ষ কিউসেক হারে জল নির্গমন সম্ভব হবে। [উদাহরণস্বরূপ, দুর্গাপুর ব্যারাজ গঠনের 23 বৎসর পরে 1978 সালের সেপ্টেম্বরের বন্যার সময় দেখা যায় যে, দুর্গাপুর ব্যারাজের জলনির্গমন ক্ষমতা 6·5 লক্ষ কিউসেক রাখা সত্ত্বেও ব্যারাজের উজানে নদীগর্ভ ভরাট হওয়ায় ঐ ব্যারাজের সমস্ত গেট সম্পূর্ণ খুলেও 3·8 লক্ষ কিউসেকের অধিক হারে জল নির্গমন করা সম্ভব হয়নি। (তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত)] কিন্তু আমরা জানি, ফরাক্কায় গঙ্গার খাতে 2-3 বৎসর অন্তর 20 লক্ষ থেকে 25 লক্ষ কিউসেকের বন্যা নেমে আসে, যেমনটি এসেছিল 1976 সালের আগষ্টে (20 লক্ষ কিউসেক), 1978 সালের আগষ্টে (23 লক্ষ কিউসেক) ও সেপ্টেম্বরে (20 লক্ষ কিউসেক) এবং 1980 সালের আগষ্টে (25 লক্ষ কিউসেক) ও সেপ্টেম্বরে (26 লক্ষ কিউসেক)। কাজেই ভবিষ্যতে গঙ্গার বুকে যখন 20 লক্ষ থেকে 26 লক্ষ কিউসেকের বন্যা নেমে আসবে, তখন অবশিষ্ট 4 লক্ষ থেকে 10 লক্ষ কিউসেক জলপ্রবাহের জন্য তোফি বাঁধ ভেঙে মালদহ জেলার মধ্য দিয়ে গঙ্গাকে তার পথ করে নিতে হবে সহস্র জীবনের বিনিময়ে এবং সে পথের নীচে কংক্রীট ভিত না থাকায় তা সহজেই গঙ্গার বর্তমান খাতের চেয়ে গভীরতর হয়ে গঙ্গার পথ পরিবর্তিত হবে। মনে রাখতে হবে, ঐ তোফি বাঁধের অপর পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে পাগলা নদী—যে নদীটি মাত্র দু'শতাব্দী আগে গঙ্গার খাত ছিল। [ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত] কাজেই গঙ্গানদী সেদিন সহজেই পাগলা-মহানন্দা বা কালিন্দী-মহানন্দা [পঞ্চদশ শতাব্দীতে গঙ্গার খাত] দিয়ে ছুটে চলবে, তখন গঙ্গার নিম্নপ্রবাহ সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশের আয়ত্তাধীনে চলে যাবে এবং গঙ্গা থেকে ভাগীরথী-হুগলীতে এক ফোঁটা জলও আসবে না। কাজেই বিশেষজ্ঞ কমিটির মতানুযায়ী শত কোটি টাকা কেন, সহস্র কোটি টাকা খরচ করেও তোফি বাঁধে ভাঙন ও গঙ্গার পথ পরিবর্তন রোধ করা সম্ভব নয়।

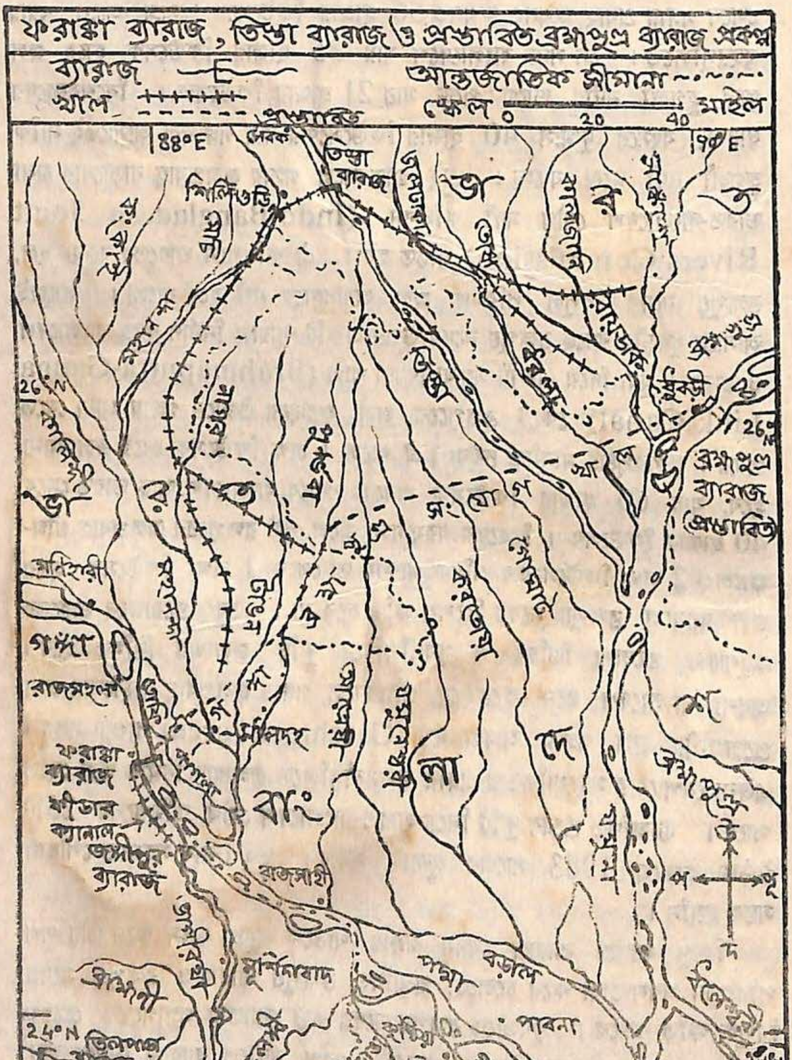
প্রসঙ্গত বলি বর্তমান অধ্যায়ে ফরাক্কা ব্যারাজের যে সকল ক্ষতিকর দিক নিয়ে আলোচনা করা হল, তা আমাদের গড়ে তোলা সকল ব্যারাজ সম্বন্ধে কম-বেশী প্রযোজ্য। কাজেই ত্রুটিমুক্ত করে ব্যারাজের নির্মাণ কৌশল সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

প্রস্তাবিত ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজ—বিশেষজ্ঞদের অভিমত, সারা বৎসর ধরে গঙ্গা থেকে 40 হাজার কিউসেক হারে জল ভাগীরথী-হুগলী নদীতে বইয়ে দিলে হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবন সম্ভব হবে। যদিও জুন থেকে মার্চ পর্যন্ত হুগলী নদীতে 40 হাজার কিউসেক জল আনতে অসুবিধা হয় না, তবুও এপ্রিল-

মে মাসে গঙ্গার জলপ্রবাহ 1 লক্ষ কিউসেক থেকে কমে যাওয়ায় ভারত ও বাংলাদেশের প্রয়োজনমত জল পেতে অসুবিধা দেখা দেয়। 1977 সালের ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি অনুযায়ী ঐ সময় বাংলাদেশ পায় শতকরা 62·5 ভাগ জল আর হুগলী নদীতে আসে শতকরা 37·5 ভাগ জল। বিশেষ করে এপ্রিলের শেষে গঙ্গার প্রবাহ কখনও কখনও 56 হাজার কিউসেকে নেমে আসে খরার বছরগুলিতে। সে সময় বাংলাদেশে যায় 35 হাজার কিউসেক হারে জল আর হুগলী নদীর ভাগে পড়ে মাত্র 21 হাজার কিউসেক। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বৎসরে দু'মাস 40 হাজার কিউসেকের কম গঙ্গাজল আসাতেই নাকি হুগলী নদী মজে যাচ্ছে। তাই গ্রীষ্মকালে গঙ্গার জলপ্রবাহ বাড়ানোর জন্য ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন (Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission) গঠিত হয়। ঐ কমিশনে ভারতের বক্তব্য হল, ব্রহ্মপুত্র নদের বিপুল পরিমাণ জল অব্যবহারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কাজেই আসামে ধুবড়ীর কাছে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর একটি ব্যারাজ নির্মাণ করে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্য দিয়ে একটি সংযোগকারী খাল (Brahmaputra-Ganga Link Canal) কেটে ব্রহ্মপুত্রের জল ফরাক্কার উজানে গঙ্গায় আনা যেতে পারে। [পরপৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য] ঐ খালে 1 লক্ষ কিউসেক হারে জল আনা হবে, যার 60 হাজার কিউসেক ব্যবহার করবে বাংলাদেশ আর ভারত নেবে 40 হাজার কিউসেক। তিব্বতের বরফগলা জলে পুষ্ট ব্রহ্মপুত্রের জলপ্রবাহ গ্রীষ্মকালেও 2 লক্ষ কিউসেকের অধিক থাকায় তা থেকে 1 লক্ষ কিউসেক হারে জল আনলে ব্রহ্মপুত্র নদের বিশেষ ক্ষতি হবে না। তবুও প্রয়োজনে ভারতের অরুণাচল প্রদেশে ডিহিং ও সুবর্ণশিরিতে দু'টি জলাধার নির্মিত হবে। অবশ্য বাংলাদেশ মনে করে যে, গ্রীষ্মকালে গঙ্গার জলপ্রবাহ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় জল গঙ্গার আবহক্ষেত্রে (Catchment area) পাওয়া সম্ভব। এজন্য নেপালের সহযোগিতায় গঙ্গার উপনদীগুলিতে জলাধার নির্মাণ করা যেতে পারে। উল্লিখিত প্রস্তাব দু'টি নিয়ে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিশনের 25টি বৈঠক হয়েছে 1983 সালের জুলাই পর্যন্ত। তবু কোন সহমতে পৌঁছান সম্ভব হয়নি।

কিন্তু ফরাক্কা ব্যারাজ যেমন গঙ্গার খাতকে দ্রুত ধ্বংস করে তার পথ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী করে চলেছে, প্রস্তাবিত ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজও ব্রহ্মপুত্র নদের বিপুল ক্ষতি করবে। ধুবড়ীতে ব্রহ্মপুত্র নদের গর্ভ ফরাক্কার গঙ্গাগর্ভের চেয়েও বিস্তৃততর ও দ্রুত পরিবর্তনশীল। কাজেই এরূপ নদীতে ব্যারাজ নির্মাণ করা আদৌ বিজ্ঞান-সম্মত নয়, যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আবার ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকায় শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর সর্বোচ্চ পরিমাণ বৃষ্টি ঝরে পড়ে এবং হিমালয়ের

ওপারে তিব্বত-চীনে ব্রহ্মপুত্রের 3 লক্ষ বর্গমাইল আবহক্ষেত্র থেকে যুগ যুগ ধরে কখন কী পরিমাণ জল এসেছে, সে সম্বন্ধে আমাদের সম্যক্ জ্ঞান নেই। শোনা যায়, দূর অতীতে ব্রহ্মপুত্র একটি ছোট্ট নদ ছিল। একদিন সাংপো নদ [4 পৃষ্ঠায় মানচিত্র দ্রষ্টব্য] তার পথটি পরিবর্তিত করে হিমালয়ের ওপার থেকে



ছুটে এসে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়, আর তখনই ব্রহ্মপুত্র একটি বিশাল নদে রূপান্তরিত হয়। মাত্র দু' শতাব্দী আগেও ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশে ময়মনসিংহের পূর্বদিক দিয়ে বয়ে যেত মেঘনা নদীতে, আর আজ সে ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিমদিক দিয়ে যমুনা নদীর পথ ধরে ছুটে চলেছে পদ্মায়। তাই আমার মনে হয়, ব্রহ্মপুত্রের মত বিশাল আবহক্ষেত্রযুক্ত, অতিবিস্তৃত, অস্থির নদীগর্ভ এবং পথ পরিবর্তনশীল নদে ব্যারাজ নির্মাণ করলে তা ভয়াবহ হবে এবং ভবিষ্যতে ঐ ব্যারাজের জন্য ব্রহ্মপুত্র নদ আসাম থেকে তার পূর্বলব্ধ পশ্চিমমুখী গতি নিয়ে লক্ষ লক্ষ কিউসেক জলপ্রবাহ দিয়ে সমগ্র উত্তরবঙ্গকে ধ্বংস করে দেবে।

ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা সংযোগ খাল—তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া হয় যে, ফরাক্কা ব্যারাজ বা প্রস্তাবিত ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজ বিপজ্জনক হয়ে উঠবে না, তবুও ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা সংযোগ খাল সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন রয়ে যায়। পূর্বপৃষ্ঠার মানচিত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, হিমালয় পর্বতমালা থেকে নেমে আসা নদনদীগুলি উত্তরবঙ্গ ও বাংলাদেশে বয়ে চলেছে প্রধানত দক্ষিণ-পূর্বমুখী পথে আর প্রস্তাবিত সংযোগ খালটি গড়ে উঠবে প্রায় দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী পথে। প্রশ্ন, যে ভূভাগের স্বাভাবিক ঢাল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, সেখানে ঢালের সঙ্গে প্রায় লম্বভাবে গড়ে তোলা খালে জল আসবে কি? হিসাব করে দেখা যাক্। আসামে প্রস্তাবিত ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজের স্থান ধুবড়ী ও গঙ্গা-ব্যারাজের অবস্থান ফরাক্কার মধ্যে দূরত্ব বা ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা সংযোগ খালের দৈর্ঘ্য প্রায় 160 মাইল আর উপরোক্ত দু'টি স্থানের উচ্চতার পার্থক্য প্রায় 35 ফুট। অর্থাৎ ঐ সংযোগ খালটির গড় মাইল প্রতি ঢাল হবে 2·5 ইঞ্চির মত। এছাড়া ঐ খালটিকে যথাক্রমে সংকোশ, তোর্ষা, ধরলা, তিস্তা, গোঘাট, করতোয়া, যমুনেশ্বরী, আত্রেয়ী, পূর্ণভবা, টাঙন ও মহানন্দা এই 11টি নদী ছাড়াও বহু ছোট নদী ও খাল পার করতে হবে যে সকল ব্যারাজ বা এ্যাকোয়াডাক্টের (Aquaduct) সাহায্যে, তাদের বাধা অতিক্রম করতে ঐ 35 ফুট জলচাপের (water-head) অনেকটাই ব্যয়িত হবে। কিন্তু সাধারণভাবে কোন খালে জলপ্রবাহ বজায় রাখতে মাইল প্রতি ঢাল কমপক্ষে 5 ইঞ্চি থাকা প্রয়োজন। এখন, যে খালে মাইল প্রতি ঢাল মাত্র 2·5 ইঞ্চি এবং যাকে কমপক্ষে 11টি নদী পার হতে হবে ব্যারাজের সাহায্যে, সে খালে আদৌ জলপ্রবাহ বজায় থাকবে কি? যদি সামান্য কিছু প্রবাহ থাকে, তা সেকেণ্ডে আনুমানিক 2 ফুট হতে পারে। ফলে 40 হাজার কিউসেক জল-প্রবাহের জন্য খালটির বিস্তার 1500 ফুট ও গভীরতা 15 ফুট করতে হবে। আবার প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলাদেশকে প্রবাহিত জলের শতকরা 60 ভাগ দিতে হলে 1 লক্ষ কিউসেক প্রবাহের জন্য খালটিকে হুগলী নদীর ন্যায় একটি বড় নদীরূপে খনন করতে হবে! এছাড়া জলের ধীর গতির জন্য ঐ খালটি পলি

পড়ে অতি দ্রুত ভরাট হয়ে যাবে। [প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফরাক্কা-জঙ্গীপুর ফীডার ক্যানালে মাইল প্রতি ঢাল 5 ইঞ্চির অধিক থাকা সত্ত্বেও তা মজে যাচ্ছে।] ব্রহ্মপুত্র নদে ব্যারাজ গড়তে 600 কোটি টাকা, 11টি নদীকে পার করতে 11টি ব্যারাজ নির্মাণে 500 কোটি টাকা ও খালটি খনন করতে 400 কোটি টাকা ব্যয় পড়বে বলে অনুমান করা যায়। প্রশ্ন জাগে, যে ঢালের (Hydraulic Gradient-এর) অভাবের জন্য বহু আলোচিত গঙ্গা-কাবেরী গ্রাণ্ড ক্যানাল প্রকল্প আজ অবাস্তব বলে বিশেষজ্ঞগণ সিদ্ধান্ত করেছেন, সেই ঢালের অত্যল্পতা সত্ত্বেও 1500 কোটি টাকার ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা সংযোগ খাল প্রকল্পটি গ্রহণ করা কি যুক্তিযুক্ত হবে ?

হুগলী নদীর নাব্যতা ও 40 হাজার কিউসেক জলপ্রবাহ—ডায়মণ্ড-হারবার অঞ্চলটি হুগলী নদীপথে সাগর ও কলিকাতার প্রায় মধ্যবর্তী এবং ওখানে নদীর বিস্তার প্রায় 3 মাইল। যদি ঐ 3 মাইল বিস্তৃত নদীখাতে ভাঁটার টানে জলের গতি ঘণ্টায় 4 মাইল ধরা হয়, তবে প্রতি ফুট গভীরতার জন্য প্রবাহমাত্রা হবে প্রায় 93 হাজার কিউসেক। তাহলে হুগলী নদীতে অনুপ্রবিষ্ট বাড়তি 40 হাজার কিউসেক গঙ্গাজলের জন্য নদীর জলতল বাড়বে মাত্র 5·5 ইঞ্চি। জোয়ার-ভাঁটার কথা বিবেচনা করলে ঐ বৃদ্ধি 1 ফুট হতেও পারে। (অবশ্য কলিকাতার কাছে জলতলের বৃদ্ধি হবে প্রায় 3 ফুট।) অতএব যে সমুদ্রগামী জাহাজগুলি 25-30 ফুট গভীর জল না হলে বিচরণ করতে পারে না, তাদের চলাচলে ঐ অনুপ্রবিষ্ট জলপ্রবাহ কতটুকু সাহায্য করবে ? এছাড়া ডায়মণ্ডহারবারে হুগলী নদীর গড় গভীরতা জোয়ারে 15 ফুট ও ভাঁটায় 10 ফুট ধরা হলে জোয়ার ও ভাঁটায় জলের প্রবাহমাত্রা হবে যথাক্রমে 14 লক্ষ ও 9 লক্ষ কিউসেক। কাজেই যে নদীতে 14 লক্ষ থেকে 9 লক্ষ কিউসেক জলপ্রবাহ নিয়ে প্রকৃতিতে জোয়ার-ভাঁটার নিত্য খেলা চলে, সেখানে মাত্র 40 হাজার কিউসেক বাড়তি জলপ্রবাহ (যা নদীর স্বাভাবিক প্রবাহের মাত্র 3-4 শতাংশ) নদীর উপর কতটুকু প্রভাব ফেলবে বা নদীখাতকে গভীর করতে কতটুকু সাহায্য করবে ? কাজেই অনুপ্রবিষ্ট 40 হাজার কিউসেক গঙ্গাজল না পারে হুগলী নদীর জলতলকে সামগ্রিকভাবে উঁচু করতে, না পারে তার খাতকে গভীর করতে। তাহলে ঐ জলধারা হুগলী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করবে কিভাবে ?

হুগলী নদীকে ভরাট করতে 40 হাজার কিউসেক গঙ্গাজলের ভূমিকা—গঙ্গা থেকে অনুপ্রবিষ্ট 40 হাজার কিউসেক জলপ্রবাহ হুগলী নদীখাতে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে, তা বুঝতে হলে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, গঙ্গাজলের সঙ্গে যে মিহি বালি ও পলি পশ্চিমবঙ্গে বয়ে আসে, জলের গতি সেকেণ্ডে

5 ফুটের অধিক থাকলে সেই পলি জলের সঙ্গে এগিয়ে চলে। কিন্তু ঐ গতি সেকেণ্ডে 5 ফুটের চেয়ে কমে গেলে তা দ্রুত নদীবক্ষে ঝরে পড়ে। অন্যদিকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ যে পলিমাটি (Alluvial soil) দিয়ে গঠিত, তাতে জলের গতি সেকেণ্ডে 7 ফুটের অধিক হলে জলস্রোতে মাটি কাটার বা নদীর চর কাটার কাজ শুরু হয় এবং সেই গতি বাড়ার সঙ্গে মাটি কাটার ক্ষমতাও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। যেমন জলের গতি দ্বিগুণ হলে তার মাটি কাটার ক্ষমতা বাড়ে 64 গুণ!

এখন 1975 সাল থেকে গ্রীষ্মের দু'এক মাস ছাড়া গঙ্গা থেকে অবিরাম 40 হাজার কিউসেক হারে জল অনুপ্রবিষ্ট করানো হচ্ছে ভাগীরথী-হুগলীতে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতানুযায়ী এতে হুগলী নদীখাতের কোন উন্নতি হয়নি, পরন্তু গত কয়েক বৎসরে হুগলী নদীর গর্ভ পূর্বের তুলনায় দ্রুতহারে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এর কারণ কি ? প্রথমত মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় ভাগীরথীর খাত সংকীর্ণ, আর 40 হাজার কিউসেক জলপ্রবাহ সেই খাতকে কাটিয়ে গভীরতর করছে। কিন্তু ঐ খাত কাটানো মাটি জলস্রোতে বয়ে আসছে হুগলী নদীতে এবং কলিকাতার কাছে হুগলী নদীর বিস্তার 2 হাজার ফুট হওয়ায় জলের গতি কমে যাচ্ছে, ফলে ঐ মাটি ঝরে পড়ছে। এভাবে কলিকাতার কাছে হুগলী নদীতে গড়ে উঠছে অনেক চর। দ্বিতীয়ত গঙ্গা থেকে তো শুধু স্বচ্ছ জল আসছে না, তার সঙ্গে আসছে বিপুল পরিমাণ মিহি বালি ও পলি, বিশেষত বর্ষাকালে। প্রতি সেকেণ্ডে 40 হাজার ঘনফুট জল এলে প্রতি দিনে বয়ে আসা জলের পরিমাণ হল 345 কোটি ঘনফুট। এখন বর্ষাকালে ঐ গঙ্গা-জলে গড়ে দু'হাজার ভাগের একভাগ মাত্র পলি থাকে, তবে বর্ষাকালে প্রতিদিন বয়ে আসা পলির পরিমাণ হল 17·25 লক্ষ ঘনফুট। অতএব বর্ষার 4 মাসে বা 120 দিনে 40 হাজার কিউসেক গঙ্গাজলের সঙ্গে হুগলী নদীতে বয়ে আসছে প্রায় 20 কোটি ঘনফুট বালি ও পলি। বৎসরের অন্য সময়ও আরও কিছু পলি আসছে। আর কলিকাতার দক্ষিণে জলের গতি কমে যাওয়ায় ঐ পলির বেশীর ভাগই হুগলী নদীর মধ্যে 350 ফুট থেকে 600 ফুট বিস্তৃত জাহাজ চলাচলের যে গভীরতর নাব্য-প্রণালীটি (Navigable channel) আছে, তাতেই ঝরে পড়ছে। হিসাব করলে দেখা যাবে, ঐ পরিমাণ পলি 125 মাইল দীর্ঘ উল্লিখিত নাব্য-প্রণালীটিকে স্বচ্ছন্দে প্রতি বৎসর 6 ইঞ্চি হারে উঁচু করে দিতে পারে। আমার মনে হয় এ কারণে গত 8 বৎসরে হুগলী নদীর নাব্য-প্রণালীটির গভীরতা স্থানবিশেষে 3 ফুট থেকে 5 ফুট পর্যন্ত কমে গেছে। [অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত] কাজেই আমরা যদি হুগলী নদীটিকে দ্রুত ভরাট করে নিতে না চাই, তবে অবিলম্বে

গঙ্গা থেকে 40 হাজার কিউসেক হারে পলিমিশ্রিত জল আনা বন্ধ করা দরকার।

কাজেই যে ফরাক্কা ব্যারাজ প্রকল্পের ফলে ফরাক্কার উজানে গঙ্গাগর্ভ দ্রুত ভরাট হয়ে বিহারে প্লাবনের প্রকোপ বাড়ছে ও মালদহ জেলায় ভাঙনের ফলে গঙ্গার পথ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে, ফরাক্কার ভাটিতে ভাঙন সৃষ্টি করে মুর্শিদাবাদ জেলার অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে এবং গঙ্গা থেকে বিপুল পরিমাণ পলি এসে হুগলী নদীকে অতি দ্রুত হারে ভরাট করে দিচ্ছে, তাকে আমরা আশীর্বাদ বলব না অভিশাপ বলব ?

ফরাক্কা সেতুটিকে রক্ষার উপায়—আগের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, ব্যারাজ হিসাবে ফরাক্কা ব্যারাজটি শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, ক্ষতিকরও বটে। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যোগাযোগকারী সেতু হিসাবে এর উপযোগিতা আছে, যদিও ঐরূপ সেতু সে সময়ে মাত্র 25 কোটি টাকা ব্যয়ে করা যেত। এছাড়া মালদহ জেলায় গঙ্গার ভাঙন ও ভবিষ্যত পথ পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ হবে, গঙ্গাগর্ভ থেকে উঁচু কংক্রীট ভিতের জন্য ফরাক্কা ব্যারাজের উজানে ক্রমাগত জমে যাওয়া এক বিরাটাকার চর। ব্যারাজের কংক্রীট ভিত তো আর নীচু করা সম্ভব নয় ; তাহলে গঙ্গার ভাঙন ও তার ভবিষ্যত পথ পরিবর্তন রোধের উপায় হল, ঐ বিরাটাকার চরকে কেটে দেওয়া—যে কাজে 294 কোটি টাকা নয়, মাত্র 50 কোটি টাকা খরচ পড়বে। অবশ্য কংক্রীট ভিতটি উঁচু থাকায় ভবিষ্যতে আবার নতুন করে চর পড়বে এবং সেই চর কাটাতে প্রতি বৎসর 5 কোটি টাকা খরচ করতে হবে। আবার ঐ বিরাট চর কাটানো মাটি ফেলার মত জায়গা পাওয়া তো সম্ভব নয়, তাই ড্রেজিং বা চর কাটানো কাজটি করতে হবে শুধু বর্ষার 3 মাসে, যাতে ঐ মাটি গঙ্গার জলস্রোতে সাগরে চলে যায়। এছাড়া ফরাক্কা ব্যারাজ যেহেতু গঙ্গা ও ভাগীরথীর উভয় খাতকে শুধু ভরাট করছে, সেহেতু ব্যারাজটির সমস্ত স্লুইস-গেট খুলে এটিকে সেতু হিসাবে ব্যবহার করাই শ্রেয়। এতে পলি কম পড়বে। সৌভাগ্যবশত ফরাক্কা ব্যারাজের মাঝখানের 25টি স্লুইসের কংক্রীট ভিত অন্যগুলির চেয়ে 8 ফুট নীচুতে রাখা আছে, যেখানে 8 ফুট উঁচু স্থির-গেট (Stop-gate) বসানো আছে। ঐ স্থির-গেটগুলি খুলে নিয়ে ডানতীরের 5 ফুট নীচু স্লুইসগুলির উপর বসালে গঙ্গার প্রবল জলস্রোতকে ডানতীর থেকে মাঝামাঝি নিয়ে আসা সম্ভব হবে এবং তা মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গার ভাঙন রোধে সহায়ক হবে। এটাই হল ফরাক্কা ব্যারাজ নয়, ফরাক্কা সেতুটিকে রক্ষার উপায়।

হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবনের উপায়—বর্তমানে হুগলী নদীতে জোয়ার

ও ভাঁটায় যথাক্রমে 14 লক্ষ ও 9 লক্ষ কিউসেকের কাছাকাছি জলপ্রবাহ ওঠানামা করে, সেখানে মাত্র 40 হাজার কিউসেক জলপ্রবাহ ভাঁটার নিম্ন-মুখী গতিকে এমন কিছু বাড়াবে না, যাতে হুগলী নদীর চর কাটা সম্ভব। পরন্তু ঐ গঙ্গাজলে আনীত পলি ঝরে পড়ে হুগলী নদীর নাব্যপ্রণালীটিকে দ্রুততর হারে ভরাট করে দিচ্ছে—একথা আগেই আলোচনা করেছি। কাজেই বিশেষজ্ঞদের ধারণামত ব্রহ্মপুত্র নদে ব্যারাজ গড়ে ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা সংযোগ খাল দিয়ে জল এনে ঐ 40 হাজার কিউসেক বজায় রাখলে এ অবস্থার প্রতিকার সম্ভব নয়। স্বভাবত প্রশ্ন আসবে, হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবন কিভাবে সম্ভব? এর উত্তরে শুধু মনে রাখতে হবে—জলের বিপুল পরিমাণ নয়, অবিরাম ধীর জলপ্রবাহ নয়, প্রবাহিত জলের গতির উপর নির্ভর করে নদীগর্ভ দ্রুত ভরাট হবে না তা গভীরতর হবে। এজন্য বর্ষার বন্যাগুলিই হল নদীর প্রাণধারা। যেমন গঙ্গার সুবিশাল খাত তো শীত বা গ্রীষ্মের 4 লক্ষ বা 1 লক্ষ কিউসেক জলপ্রবাহে গড়ে ওঠেনি, (বরং কিছুটা ভরাট হয়ে যায়), বর্ষায় হঠাৎ নেমে আসা 18-22 লক্ষ কিউসেকের বন্যাগুলির প্রবল স্রোতেই তা সৃজিত হয়েছে। (কারণ বর্ষায় বন্যাতেই নদীর গর্ভ কাটে) তেমনি হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবনের জন্য অতীতের যত বর্ষাকালে গঙ্গা থেকে আনতে হবে 3-4 লক্ষ কিউসেকের বন্যা আর দামোদর থেকে ছাড়তে হবে অনুরূপ প্রবাহ, যাতে বন্যার প্রবল স্রোতে ও ভাঁটার টানে হুগলী নদীতে জলের নিম্নমুখী গতি সেকেণ্ডে 7 ফুটের অধিক হবে। তবেই হুগলী নদীর গর্ভ কেটে তা গভীরতর হবে এবং চরগুলি কেটে সাগরে চলে যাবে। আর ঐ কাজ আমাদের এখনই করা দরকার, নতুবা হুগলী নদীতে ঝরে পড়া পলি শক্ত হয়ে জমে গেলে তা কাটানো প্রায় অসম্ভব হবে। বিষয়টি ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হবে।*

---

* চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অক্টোবর 1979 এবং উৎস-মানুষ, জুলাই-আগষ্ট 1982 পত্রিকা দুটিতে প্রকাশিত।

নদীবিজ্ঞানের কথা

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যারাজের অভিশাপ ও মুক্তি

সূচনা—দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রভাবে আমাদের দেশে জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে বিপুল পরিমাণ বৃষ্টি ঝরে পড়ে পাহাড়ে-পর্বতে, মালভূমিতে, তারই কিছু অংশ নদীর উচ্চ উপত্যকায় আড়াআড়ি বাঁধ বা ড্যাম (Dam) নির্মাণ করে ধরে রাখা হয় জলাধারে (Reservoir)। তারপর যখন গ্রীষ্ম আসে, মানুষ, গাছপালা ও সমগ্র প্রকৃতি সূর্যকিরণের দাবদাহে মেঘশূন্য আকাশের দিকে এক ফোঁটা বারিবিন্দুর জন্য তৃষিত চাতকের ন্যায় "স্ফটিক জল" বলে হাহাকার করতে থাকে, তখনই সেই জলাধারে সঞ্চিত জল তাদের কাছে অমৃতের ধারার মত পৌঁছে দেওয়া হয় নদীপথ বেয়ে। কিন্তু সেই জল যাতে নদীপথ ধরে সাগরে চলে যেতে না পারে, তারই জন্য নদীর বুকে গড়ে তোলা হয় অন্য একটি নীচু বাঁধ, যাকে বলা হয় ব্যারাজ (Barrage)। এই ব্যারাজের সাহায্যে জল পৌঁছে যায় শহরে-বন্দরে, কলে-কারখানায় কিংবা সেচখাল দিয়ে খেতে-খামারে। আবার যখন বর্ষা আসে, পাহাড় থেকে বন্যা নামে, তখন ঐ ব্যারাজের স্লুইস-গেট (Sluice-gate) খুলে জলরাশিকে ছেড়ে দেওয়া হয় সাগরের পানে, এভাবে জলসম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে জলাধার ও ব্যারাজ আমাদের পরম বন্ধুরূপে কাজ করে।

তথাপি প্রকৃতির উপর মানুষের ঐ হস্তক্ষেপের ফলে কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়—যার ফলে কখনও কখনও বিরাট বিপর্যয় ঘটে থাকে। পশ্চিমবঙ্গেও এরূপ অভিশাপ নেমে এসেছিল 1978 সালের সেপ্টেম্বর মাসের বন্যার সময়। ময়ূরাক্ষীর তিলপাড়া ব্যারাজের উজানে বাম তীর ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল 10 মাইল দীর্ঘ দ্বিতীয় ময়ূরাক্ষী নদী তার পথের উপর সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে। এছাড়া দুর্গাপুর ব্যারাজের জন্য 80টি কয়লাখনি ও দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল প্লাবিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। [তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য]। ব্যারাজের যে ত্রুটির জন্য সাধারণত ঐ বিপদ ঘটে থাকে তা হল—(1) ব্যারাজের সকল স্লুইস-গেট সম্পূর্ণ খুলে দিলে যে হারে জল বেরিয়ে যেতে পারে তার চেয়ে অধিক হারে বন্যার জল নেমে আসা, অর্থাৎ ব্যারাজের সর্বোচ্চ জলনির্গমন ক্ষমতার অতিরিক্ত

জলপ্রবাহ। (2) ব্যারাজের কংক্রীট ভিতের জন্য উজানে নদীবক্ষে আটকে যাওয়া বিপুল পরিমাণ পলি অর্থাৎ ব্যারাজ-পণ্ডে (Barrage-Pond) জমা বিশাল চর। এবং (3) ব্যারাজের উঁচু কংক্রীট ভিত থেকে নেমে আসা জলস্রোতে ভাঁটিতে গড়ে ওঠা গভীর খাত। ফরাক্কা ব্যারাজের ক্ষেত্রে ঐ ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। ঐ ত্রুটি মুক্ত করতে ব্যারাজের গঠন কৌশলের যে পরিবর্তন আবশ্যক, তা আলোচনার পূর্বে নদীখাতের একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব।

নদীখাতের বৈশিষ্ট্য—পাহাড়-পর্বত থেকে বর্ষার বিপুল জলরাশি নেমে এসে নদীখাত বেয়ে এগিয়ে চলে সাগরের পানে। এই খাত নদীর চলার পথের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রূপ নেয়। উচ্চ প্রবাহে নদী গভীর কিন্তু স্বল্পবিস্তৃত খাতে তীব্র গতিতে ছুটে চলে আবার নিম্নপ্রবাহে সে স্বল্প গভীর কিন্তু বিস্তৃত খাতে মন্দ গতিতে বয়ে চলে। নদীর অববাহিকার সামগ্রিক বৃষ্টিপাত, প্রবল বন্যা, ভূমির ঢাল, শিলার গঠন, নদীপথের সরলতা বা বক্রতা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে নদীখাতের প্রকৃতি। এই নদীখাতের তলদেশ বা নদীগর্ভ (River-bed) কখনই সমতল হয় না। সাধারণত এর মধ্যাঞ্চল দু'তীরের চেয়ে অপেক্ষাকৃত নীচু হলেও কোথাও হয়তো ডানদিকে গভীর খাত ও বামদিকে চর, আবার কোথাও বামদিকে গভীর খাত ও ডানদিকে চর গড়ে উঠতে পারে। (বিশেষত বাঁকের কাছে)। এছাড়া কোথাও হয়তো মাঝে চর সৃষ্টি করে দু'তীরে গভীর খাতে নদীকে বইতে দেখা যায় অতিবিস্তারের জন্য [দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য] যুগে যুগে পলি জমে নদীর দু'তীরভূমির সাথে নদীগর্ভও উঁচু হয়ে উঠতে থাকে। দু'তীরে সমান্তরাল বাঁধ (Embankment) থাকলে নদীগর্ভ দ্রুততর হারে উঁচু হয়ে ওঠে। নদীগর্ভ উঁচু হয়ে ওঠা ছাড়াও বাঁকের কাছে নদীখাত ধীরে ধীরে বাঁকের উত্তল অংশ বা নদীর অবতল অংশের দিকে সরে যায়। কিন্তু কোন একটি স্থানে নদীগর্ভের Profile [নদীকে আড়াআড়ি ভাবে উলম্ব তল (Vertical Plane) দ্বারা বিভক্ত করলে নদীগর্ভ যে বক্ররেখা উৎপন্ন করে, তাকে নদীগর্ভের Profile বলে।] বহু যুগ ধরে একই রকম (Similar) থাকে। অর্থাৎ যেখানে নদী ডানদিকে গভীর, সেখানে নদীগর্ভ উঁচু হলে ডানদিকটা গভীর থাকে ; আবার কোথাও নদীখাত বামদিকে গভীর হলে বহু বৎসর নদী বামদিকে গভীর খাতে বয়ে চলে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা যখন নদীর মধ্য প্রবাহে কোন ব্যারাজ নির্মাণ করি, তখন সেখানকার নদীগর্ভের বৈশিষ্ট্যের কথা একটিবারও চিন্তা করি না।

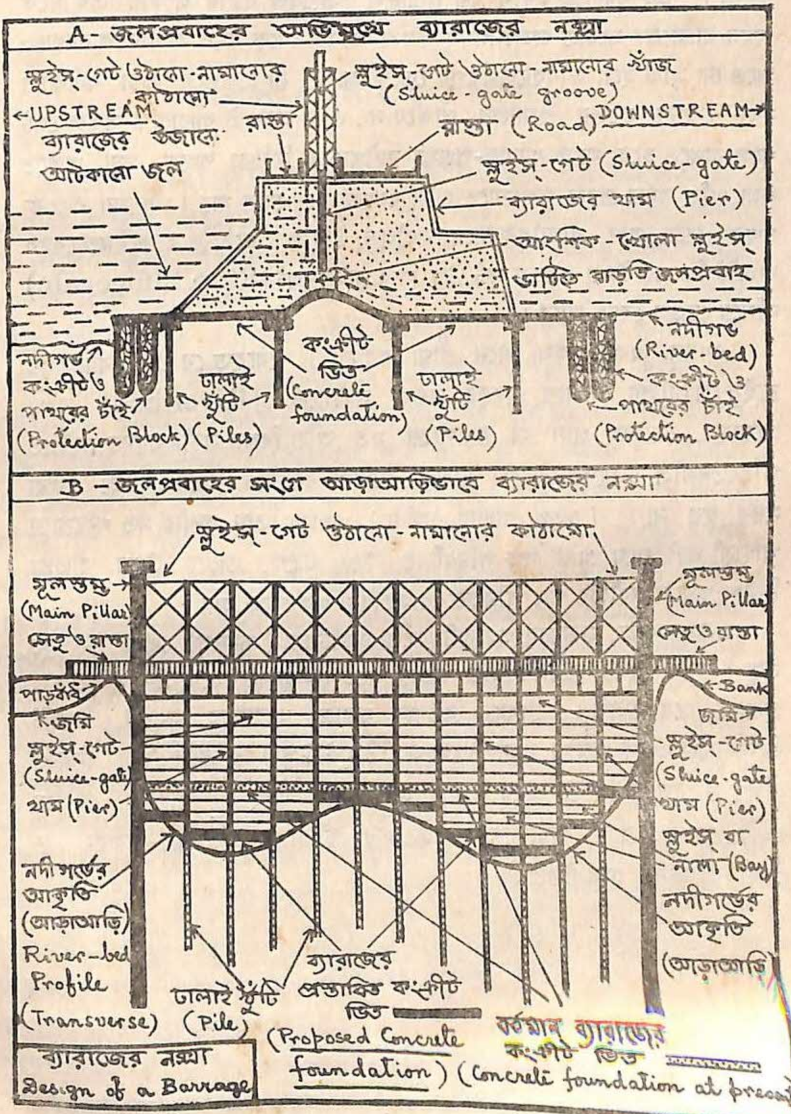
বর্তমান ব্যারাজের গঠন—নদীর মধ্যপ্রবাহে যেখানে ব্যারাজ নির্মাণ করা হয় সেখানে প্রথমে গড়ে তোলা হয় অসংখ্য ঢালাই খুঁটি, (Pile) যেগুলি

নদীগর্ভে 25-30 ফুট পর্যন্ত প্রোথিত থাকে। তারপর ঐ পাইলগুলির উপর রাখা হয় ঘরের ছাদের মত 5-7 ফুট পুরু ও কয়েক-শ' ফুট বিস্তৃত খিলানের ন্যায় (Arch-shaped) একটি কংক্রীট ভিত (Concrete foundation)। ঐ কংক্রীট ভিতের সর্বোচ্চ অংশটি স্লুইস-গেটগুলির ঠিক নীচে রাখা হয়। তারপর ভিতটি দু'দিকে আস্তে আস্তে নীচু হয়ে উজানে ও ভাটিতে নদীগর্ভের নীচে চলে যায়। যেখানে ভিতটি শেষ হয় সেখানে বড় বড় পাথরের চাঁই ও সিমেণ্ট দিয়ে নদীগর্ভের নীচের অংশ আটকে দেওয়া হয় যাতে কংক্রীট ভিতের নীচ দিয়ে জলপ্রবাহ না হতে পারে। [চিত্র দ্রষ্টব্য] ঐ কংক্রীট ভিতের উপর 30 ফুট থেকে 60 ফুট অন্তর অন্তর অনেকগুলি থাম (Pier) গড়ে তোলা হয় এবং থামগুলির উপর দিয়ে সড়ক বা রেলপথের সেতু থাকে। দুটি থামের মধ্যবর্তী অংশে যে জল নির্গমনের দ্বার বা স্লুইস (Sluice) গড়ে ওঠে, তাদের প্রত্যেকটিতে খাড়া ভাবে ওঠা-নামা করতে পারে এরূপ কপাট বা স্লুইস-গেট (Sluice-gate) রাখা হয়। স্লুইস-গেট খুলে বা বন্ধ করে যে কোন নালা (channel) দিয়ে প্রয়োজনমত জল বের করা যেতে পারে।

যদিও পৃথিবীর কোন নদীগর্ভই সমতল নয়, তবুও স্লুইস-গেটগুলির নীচে ব্যারাজের কংক্রীট ভিতটি নদীগর্ভে একই অনুভূমিক তলে (Horizontal Plane) রাখা হয়। আবার ঐ অনুভূমিক তলটি নদীগর্ভের উচ্চতম অংশের থেকে 5-7 ফুট উঁচুতে রাখা হয় যাতে স্লুইস-গেটগুলির নীচে পলি জমে আটকে না যায়। ফলে ঐ কংক্রীট ভিতটি নদীগর্ভের গভীরতর অংশ থেকে 10-15 ফুট উঁচু হয়ে পড়ে। এতে নদীর নিম্নাংশে জলপ্রবাহ ব্যাহত হওয়ায় একদিকে ব্যারাজের সর্বোচ্চ জলনির্গমন ক্ষমতা কম হয়, অন্যদিকে ব্যারাজের উজানে নদীবক্ষে বা ব্যারাজ পণ্ডে (Barrage Pond) পলি জমে বিশাল চর সৃষ্টি হয়, যে চর নদী তার স্রোতের দ্বারা কেটে নিতে পারে না। শুধু তাই নয়, নদী তার গর্ভের Profile-টা নতুন করে গড়ে নিতে চায় বলে, নদীর গভীর অংশটা যখন কংক্রীট ভিতের সমান উঁচু হয়ে ওঠে ; তখন যেখানে নদীবক্ষে আগে চর ছিল, সেখানকার স্লুইস-গেটগুলির নিম্নাংশও ভরাট হয়ে যায়। এর ফলে যে বিপর্যয় ঘটতে পারে তা ফরাক্কা ব্যারাজের ক্ষেত্রে আলোচিত হয়েছে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে।

মুক্তির উপায়—এই বিপদ থেকে মুক্তি পেতে হলে যেখানে ব্যারাজ গড়া হবে, সেখানকার নদীগর্ভের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে কংক্রীট ভিতটি নদীখাতের উপর স্বল্পতম বাধার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ ব্যারাজ গড়ার সময় নদীকে 30 ফুট থেকে 60 ফুট বিস্তৃত যে নালায় (channel) বিভক্ত করা হয় থামগুলির সাহায্যে, সেই নালার প্রত্যেকটির কংক্রীট ভিতের নিম্নাংশ একই

অনুভূমিক তলে না রেখে নদীগর্ভের **Profile** অনুযায়ী উঁচুতে বা নীচুতে রাখতে হবে, যাতে কংক্রীট ভিতটি নদীগর্ভের কোন অংশ থেকে 2 ফুটের অধিক উঁচুতে না থাকে। অর্থাৎ ব্যারাজের কংক্রীট ভিতটি নদীর গভীর অংশে নীচুতে এবং উচ্চতর অংশে উঁচুতে রাখতে হবে বা নদীগর্ভের প্রায় অনুরূপে গড়তে হবে।



এজন্য প্রয়োজনে স্লুইস-গেটগুলির উচ্চতা কম বা বেশি করতে হবে। এখানে এরূপ একটি ব্যারাজের নক্সা (Model) অঙ্কিত হল। [চিত্র দ্রষ্টব্য] চিত্রে প্রদর্শিত ব্যারাজটি নদীখাতের উপর বর্তমান ব্যারাজের চেয়ে অনেক কম বাধার সৃষ্টি করবে এবং নদীর স্বাভাবিক জলপ্রবাহ অনেকাংশে বজায় থাকতে সাহায্য করবে। এই ব্যারাজে নদীখাতের নিম্নাংশে জলপ্রবাহ বজায় থাকায় একদিকে যেমন ব্যারাজের সর্বোচ্চ জলনির্গমন ক্ষমতা অনেক বেড়ে যাবে, অন্যদিকে ব্যারাজ-পণ্ডে চর সৃষ্টি হয়ে ভবিষ্যতে বিপদ ডেকে আনবে না। তবে সারা বর্ষাকাল যখন সেচের জলের প্রয়োজন থাকবে না, তখন অবশ্যই ব্যারাজের সকল গেট খুলে রাখতে হবে, যাতে ব্যারাজ-পণ্ডসহ নদীখাতের বিভিন্ন অংশে অন্য ঋতুতে জমা পলি বর্ষার প্রবল জলস্রোতে প্রতি বৎসরই ধুয়ে চলে যায়। এছাড়া কয়েক দশক পরে যদি স্বাভাবিকভাবে নদীগর্ভ উঁচু হয়ে ওঠে, তবে প্রয়োজনবোধে কংক্রীট ভিতের উপর কয়েক ফুট উঁচু স্থির স্লুইস-গেট (Stop Sluicegate) বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। যেহেতু যে কোন ব্যারাজের স্লুইস-গেটগুলির নিম্নাংশ যতদূর সম্ভব নদীগর্ভে (River-bed) রাখা প্রয়োজন, সেহেতু গঙ্গা বা ব্রহ্মপুত্রের মত অতি বিস্তৃত নদী, যাদের নদীগর্ভ পরিবর্তনশীল, তাদের উপর ব্যারাজ নির্মাণ করলেও তাকে রক্ষা করা সম্ভব হয় না। [চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য] এছাড়া তিস্তা, কুশীর মত খরস্রোতা পাহাড়ী নদী, যারা প্রায়ই পথ পরিবর্তিত করে থাকে, তাদের উপর ব্যারাজ নির্মাণ করলে নদীটির পথ পরিবর্তনের সম্ভাবনা খুব বেড়ে যায়।

প্রসঙ্গত বলি, ফরাক্কায় গঙ্গানদী মাঝে একটি চর (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 44 ফুট উঁচু) সৃষ্টি করে দু'ধারে দুটি গভীর খাতে (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 24 ফুট উঁচু) প্রধানত বয়ে চলত। সেখানে বর্তমান ফরাক্কা ব্যারাজের কংক্রীট ভিতটি অনেকাংশে একই তলে (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 52 ফুট উঁচু) না রেখে যদি নিবন্ধে বর্ণিত উপায়ে নদীগর্ভের অনুরূপে রাখা হত, তবে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গার ভাঙন ও প্লাবন বহুলাংশে কম হত এবং ভবিষ্যতে ফরাক্কা ব্যারাজ এত বেশী বিপজ্জনক হয়ে উঠত না।*

* পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু জ্ঞান ও বিজ্ঞান, আগষ্ট 1980 সংখ্যায় প্রকাশিত।

নদীবিজ্ঞানের কথা

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভাগীরথী-হুগলীর পুনরুজ্জীবন

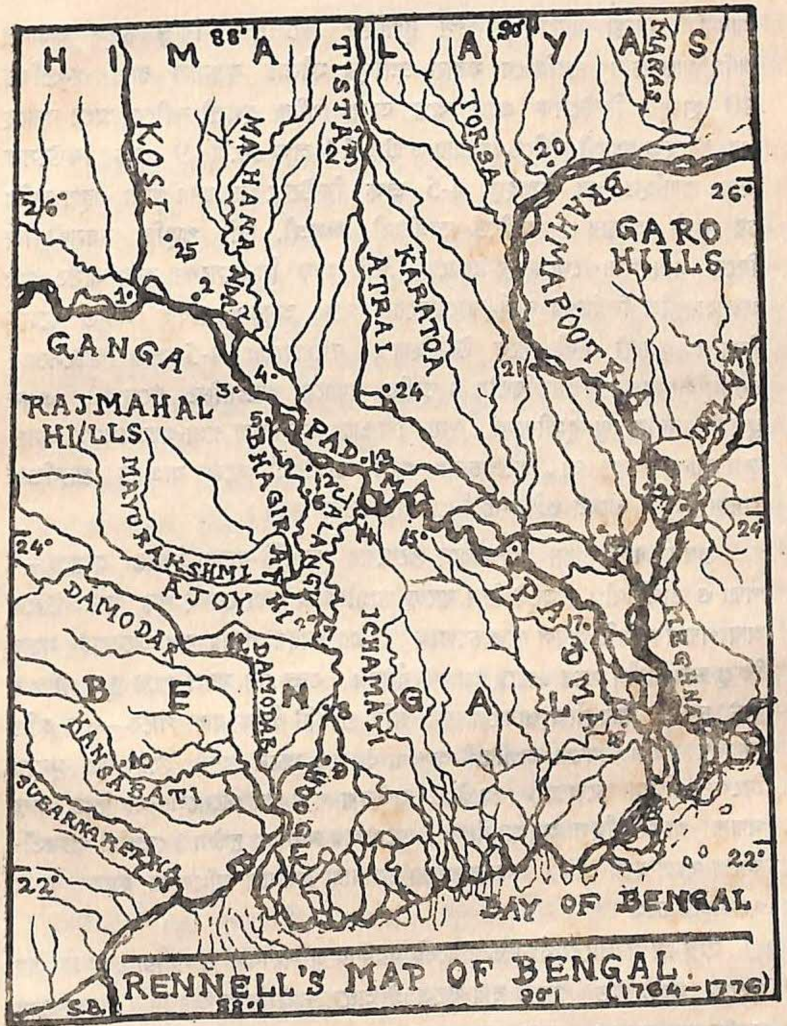
ভাগীরথী-হুগলী নদীর কথা—প্রাগৈতিহাসিক যুগে নিম্নপ্রবাহে গঙ্গানদীর ধারাগুলি আমাদের বঙ্গভূমিতে ঠিক কোন পথে বয়ে যেত, তা সঠিক জানা না গেলেও এটুকু জানা যায় যে, পাঁচশ বৎসর আগে গৌড় যখন বাংলার রাজধানী ছিল, তখন গঙ্গানদী গৌড় শহরের কিছু উত্তরে দুটি প্রায় সমান ধারায় বিভক্ত হত। [1550 খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক জাও দ্য বারোসের মানচিত্রে এর সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়]। সে সময় একটি ধারা দক্ষিণ-পূর্বমুখী পথে বর্তমান কালিন্দী-মহানন্দার পথ ধরে রাজসাহী পর্যন্ত, তারপর পূর্বমুখী পথে বড়াল-ধলেশ্বরী-বুড়িগঙ্গার খাত ধরে ঢাকা পর্যন্ত ও সবশেষে দক্ষিণমুখী পথে মেঘনা নদীর খাত ধরে প্রবাহিত হয়ে চট্টগ্রামের কাছে সাগরে পতিত হত। সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলার রাজধানী ঢাকার কাছেই তখন শীতলক্ষ্যার পথে ব্রহ্মপুত্র নদ সেই গঙ্গায় মিলিত হত। তখন বর্তমান পদ্মানদীর অস্তিত্ব থাকলেও তা প্রবল ছিল না। গঙ্গার অন্য ধারাটি ভাগীরথী নামে গৌড় শহরের পাশ দিয়ে দক্ষিণমুখী পথে ছোটনাগপুরের মালভূমির কোল দিয়ে বর্তমান ভাগীরথীর কাছাকাছি পথে সে যুগের বন্দর ও তীর্থক্ষেত্র ত্রিবেণীতে এবং ত্রিবেণী থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী পথে দক্ষিণ রাঢ়দেশের বন্দর তাম্রলিপ্ত (বা বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহরে) পৌঁছাত। ঐ সময় ত্রিবেণীতে ভাগীরথীর অন্য দুটি শাখানদী, যথা গঙ্গা (আদিগঙ্গা) ও যমুনা গড়ে ওঠায় ভাগীরথীর নিম্নাংশটি সরস্বতী নদী নামে অভিহিত হত। বর্তমানে অবশ্য ভাগীরথীর নিম্নাংশের তিনটি ধারা সরস্বতী, আদিগঙ্গা ও যমুনা বিলুপ্ত হয়ে একটি মাত্র ধারা হুগলী নদীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই হুগলী নদীর উপরাংশে ত্রিবেণী থেকে কলিকাতা পর্যন্ত আদিগঙ্গার পথ আর নিম্নাংশে আন্দুল থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত পরবর্তীকালের সরস্বতী নদীর পথ থেকে গড়ে উঠেছে।

রাজমহল পাহাড় ও ছোটনাগপুর মালভূমির কোল দিয়ে বয়ে আসা গঙ্গার দক্ষিণবাহিনী পথ ভাগীরথীকে পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে গঙ্গার প্রধান ধারা

ছিল বলে মনে করা হয়। কারণ আমরা দেখি, ভাগীরথী ও সরস্বতীর দু'তীরবর্তী ভূমির এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল (যেমন মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলাগুলির পূর্বাংশ এবং হুগলী ও হাওড়া জেলা) গঙ্গার বালুকাময় পলির দ্বারা গঠিত, যাতে ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর ও কংসাবতীর পথে বয়ে আসা রাঙামাটির বা ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার পলির পরিমাণ অতি নগণ্য। অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে অন্তত কয়েক সহস্র বৎসর গঙ্গার এই প্রবাহ বা ভাগীরথী প্রবলতর ছিল।

সেদিন গৌড় থেকে পশ্চিমে গঙ্গার পথে উত্তরভারতের সঙ্গে, পূর্বে বড়াল ধলেশ্বরী বুড়িগঙ্গার পথে বঙ্গভূমির সঙ্গে এবং দক্ষিণে ভাগীরথীর পথে রাঢ়ভূমির সঙ্গে সহজ যোগাযোগ সম্ভব ছিল বলে উহা বাংলার রাজধানীর উপযুক্ত স্থান ছিল। এছাড়া সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্ত (ভাগীরথী বা গঙ্গার পথে বয়ে আসা পলিতে ভরাট হওয়ায় সমুদ্র বহু দক্ষিণে সরে গেছে) গঙ্গার প্রধান ধারা ভাগীরথী ছাড়াও রূপনারায়ণ, পদ্মঘাটা (রূপনারায়ণের নিম্নাংশ) দামোদরের শাখানদী চলকিশোর, কপিশা (বর্তমান কংসাবতী), তাম্বোলি প্রভৃতি নদনদীগুলির মিলনস্থানের কাছাকাছি থাকায় উহা পূর্বভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দররূপে গড়ে উঠেছিল। ঐ তাম্রলিপ্ত থেকে সে যুগে ও তার আগের যুগেও বাংলা ও উত্তরভারতের বাণিজ্যতরীগুলি সাগরপথে দূর প্রাচ্যের ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কাম্বোডিয়া, সুমাত্রা, জাভা এমনকি চীনদেশে এবং ভারতের পূর্ব-উপকূলের সকল বন্দরে এমনকি সিংহলদ্বীপে পাড়ি দিত। এই তাম্রলিপ্ত বন্দরকে গ্রীক ভৌগোলিক টলেমী তামালি নামে বর্ণনা করেন। মৌর্যযুগে মহেন্দ্র ও সংঘামিত্রা এখান থেকে সিংহল যাত্রা করেন বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য। চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েন, হিউয়েন সাঙ্ ও ইৎ সিঙ এই তাম্রলিপ্ত বন্দরের সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। প্রাচীন বন্দর তাম্রলিপ্ত ও বাংলার তৎকালীন রাজধানী গৌড় ছাড়া যে সকল বন্দর সে যুগে ভাগীরথীতীরে অবস্থিত ছিল, সেগুলি হল—লক্ষণাবতী, কর্ণসুবর্ণ, কংকাগ্রাম, নবদ্বীপ, ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম। এছাড়া পরবর্তী যুগের মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজার, হুগলী, চন্দননগর, বেতড় এবং বর্তমান যুগের শিল্পাঞ্চলসহ কলিকাতা ও হলদিয়া বন্দর এই ভাগীরথী-হুগলীর তীরে গড়ে উঠেছে।

ভাগীরথী-হুগলী মজে যাওয়ার বিভিন্ন কারণ—বর্তমান শতাব্দীতে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার সীমানা দিয়ে বয়ে চলা গঙ্গার মূল প্রবাহ পদ্মার বুকে ছুটে চলেছে। ফলে গঙ্গার অন্য ধারা ভাগীরথী-হুগলী মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে আর তারই সাথে পূর্বভারতের বৃহত্তম বন্দর কলিকাতা ও তার শিল্পাঞ্চল ধ্বংস হতে বসেছে। হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবনের জন্য



অষ্টাদশ শতাব্দীর (1764-1776) রেণেলের মানচিত্রে নদনদীর পথ।

মানচিত্রে প্রদর্শিত বিভিন্ন স্থানের নাম : 1—কুর্শেলা, 2—মণিহারী, 3—ফরাক্কা, 4—গৌড়, 5—সুতী, 6—মুর্শিদাবাদ, 7—নবদ্বীপ, 8—ত্রিবেণী, 9—কলিকাতা, 10—মেদিনীপুর, 11—বর্ধমান, 12—লালগোলা, 13—রাজসাহী, 14—জলাঙ্গী, 15—কুষ্টিয়া, 16—গোয়ালন্দ, 17—শিবচর, 18—মেহেন্দীগঞ্জ, 19—ঢাকা, 20—ধুবড়ী, 21—বাহাদুরাবাদ, 22—দৌলতকান্দি, 23—জলপাইগুড়ি, 24—সান্তাহার।

আমরা ফরাক্কা ব্যারাজ প্রকল্প রূপায়িত করেছি। কিন্তু চতুর্থ অধ্যায়ে আমি আলোচনা করেছি যে, ফরাক্কা-জঙ্গীপুর ফীডার ক্যানাল দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট 40 হাজার কিউসেক জলে বয়ে আসা পলি হুগলী নদীকে ধ্বংস করছে এবং যেহেতু হুগলী নদীতে জোয়ার-ভাঁটায় 14 লক্ষ থেকে 9 লক্ষ কিউসেক জল প্রবাহিত হয়, সেহেতু 4-5 লক্ষ কিউসেকের বন্যা ছাড়া এরূপ নদীর চর কাটা অসম্ভব। অতীতে ভাগীরথী, জলঙ্গী, চূর্ণী প্রভৃতি নদনদীগুলি দিয়ে গঙ্গা-পদ্মা থেকে বর্ষাকালে 3-4 লক্ষ কিউসেকের বন্যা আসত এবং জলাধারগুলি নির্মাণের পূর্বে দামোদরের পথে অনুরূপ প্রবাহ নামত বলেই বিশাল হুগলী নদী গড়ে উঠেছিল। দামোদরের 4-5 লক্ষ কিউসেকের বন্যাগুলি আনার উপায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এখন হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবনের জন্য কিভাবে বর্ষাকালে গঙ্গা-পদ্মা থেকে বন্যার জল আনা সম্ভব, তা আলোচনার পূর্বে ভাগীরথী মজে যাওয়ার প্রাকৃতিক কারণগুলি ও তাদের প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করব।

প্রথম কারণ—গঙ্গা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের পর দুটি ধারায় বিভক্ত হয়েছে,—পদ্মা ও ভাগীরথী। যতই দিন যাচ্ছে ভাগীরথীর ধারা ক্রমেই শুষ্ক হয়ে উঠছে আর পদ্মার ধারাটি প্রবল হতে চলেছে। এর কারণ পদ্মার পথ অনেকটা সরল কিন্তু ভাগীরথীর পথে রয়েছে অসংখ্য বাঁক। জল তো সরল পথে দ্রুত গতিতে ছুটে চলবে আর বাঁক থাকলে তার গতি প্রতিটি বাঁকে বাধা পাবে—এত অতি সাধারণ কথা। ফলে ভাগীরথী অসংখ্য বাঁকের বন্ধনে বন্দী হয়ে দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। অতীতে অষ্টাদশ শতাব্দীর রেনেলের মানচিত্রে কিন্তু পদ্মার পথেই ছিল অসংখ্য বাঁক, [রেণেলের মানচিত্র দ্রষ্টব্য] যেগুলি পরবর্তী-কালে সরল হয়ে ওঠে। ফলে গঙ্গার জলধারা ক্রমান্বয়ে অধিকতর হারে পদ্মার পথে ছুটে চলে।

তাই ভাগীরথীকে বাঁচাতে প্রথমেই দরকার মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় এর পথকে সরলায়িত করা, যার ফলে ঐ অংশে নদীটির পথ বর্তমান পথের প্রায় অর্ধেক হয়ে যাবে। ফলে ঢাল দু-গুণ হয়ে প্রবাহমাত্রা দু-গুণ হবে। এছাড়া বাঁক না থাকায় জলের গতি বাধা পাবে না, ফলে প্রবাহমাত্রা আরও বাড়বে। তখন জলের প্রবল গতি নদীখাতমুখী হওয়ায় তার পথের পলি সরিয়ে দেবে। প্রসঙ্গত বলি দু-শ' বছর পূর্বে মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারের মধ্যে ছিল কয়েকটি বাঁক—যার ফলে ঐ দুটি শহরের মধ্যে নৌকাপথে প্রায় একদিন সময় লাগত, যদিও স্থলপথে ঐ দূরত্ব প্রায় 5 মাইল। সে যুগে নৌ-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য 1788 সালে দুটি শহরের মধ্যে একটি খাল কেটে যোগাযোগ করা হয়। পরবর্তীকালে ভাগীরথী সেই ছোট সরল খালটিকে নদীরূপে গড়ে নেয় এবং

পুরানো খাতটি একটি বাওড়ে পরিণত হয়। তাই ঐ অঞ্চলে ভাগীরথীর আর এক নাম কাটিগঙ্গা। আমরা কি অনুরূপ কয়েকটি কাটিগঙ্গা সৃষ্টি করে ভাগীরথীর পথকে সরল করে দিতে পারি না ?

দ্বিতীয় কারণ—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কয়েকটি বড় নদনদী, যথা তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, কুশী ও দামোদর তাদের পথসকল পরিবর্তিত করে। 1787 সালের একটি প্রবল বন্যায় তিস্তানদী তার পথটি পরিবর্তিত করায় তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা (পূর্ববঙ্গে) নদীগুলির মধ্যে সংযোগ ঘটে, ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ব্রহ্মপুত্র নদটি মেঘনা নদীর পথকে পরিহার করে এবং তিস্তার প্রবল বন্যার জন্য যমুনা নদীর প্রায় সরল পথে চলতে শুরু করে। তখন পদ্মার সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের জলরাশির সংযোগস্থল পূর্বেকার সমুদ্রের কাছ থেকে বর্তমানে পদ্মানদীতে প্রায় 80 মাইল উজানে গোয়ালন্দের কাছে এগিয়ে আসে। ফলে ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তার জলধারার দ্রুতগতি পূর্ববঙ্গে যমুনা নদীর পথ ধরে পদ্মার পথকে আরও 80 মাইল পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। অন্যাদিকে যে দামোদর বর্ধমান জেলায় বেহুলা নদীর পথ ধরে প্রবাহিত হয়ে ত্রিবেণী থেকে আদিগঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর পথের পলি তার বন্যাগুলির দ্রুতগতি দিয়ে সরিয়ে দিত, সেই দামোদর 1770 সাল নাগাদ তার পথকে পরিবর্তিত করে প্রায় 50 মাইল দক্ষিণে ফলতার কাছে হুগলীতে পতিত হয়। বর্তমানে দামোদর আরও সরে মুণ্ডেশ্বরী ও রূপনারায়ণের পথে ছুটে চলে। ফলে হুগলী ও দামোদরের সংযোগস্থল প্রায় 60 মাইল দক্ষিণে সরে যায় এবং দামোদরের বন্যাগুলি আর মধ্যাঞ্চল থেকে সরস্বতী-তথা হুগলীর খাত কাটাতে সাহায্য করে না। এছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মণিহারীতে পতিত কুশী নদীর বন্যাগুলি গঙ্গার দক্ষিণমুখী পথ বেয়ে ভাগীরথীতে সঞ্চারিত হত, সেই কুশী নদী এখন বিহারে কুর্শেলার কাছে গঙ্গায় মিলিত হয়। সব মিলিয়ে দেখা যায় যে, একদিকে তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্রের পথ পরিবর্তন পদ্মানদীর পথের উপর যেমন অনুকূল প্রভাব ফেলেছে, অন্যাদিকে কুশী ও দামোদরের পথ পরিবর্তন ভাগীরথী-হুগলীর উপর প্রতিকূল প্রভাব এনেছে। এছাড়া দুর্গাপুর থেকে যে দামোদরের মাইল প্রতি ঢাল ভাগীরথী-হুগলীর চেয়ে প্রায় 4 গুণ বেশী এবং যার বন্যাগুলির তীব্র গতি 25 বৎসর আগেও হুগলী মোহানাকে গভীর করতে বিরাট ভূমিকা নিত, জলাধার-গুলির দ্বারা সেই দামোদরের বন্যানিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হুগলী মোহানার দ্রুত অবনতি ডেকে আনছে।

বর্তমান অবস্থায় ঐ নদীগুলিকে আর তাদের পুরানো পথে ফিরিয়ে আনা যাবে না। কিন্তু ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর প্রভৃতি নদনদীগুলিকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত পথে পরিচালিত করে এবং এদের বন্যাগুলিকে পরিকল্পিতভাবে

ছেড়ে দিয়ে ভাগীরথী-হুগলীর মধ্যাংশ ও নিম্নাংশকে গভীর করতে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

তৃতীয় কারণ—গঙ্গা থেকে উৎপন্ন শাখানদীগুলির মধ্যে প্রথম নদীটি হল ভাগীরথী। ফলে নদীটির পশ্চিমদিকে রয়েছে ছোটনাগপুরের মালভূমি, যা ক্রমান্বয়ে দ্রুত উঁচু হয়ে গেছে এবং পূর্বদিকে রয়েছে গঙ্গার নিম্ন সমভূমি, যা ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে গেছে। ফলে পশ্চিমদিকের উচ্চভূমি থেকে ঝরে পড়া মাটিতে এবং অজয়, ময়ূরাক্ষী, দামোদর, রূপনারায়ণ প্রভৃতি উপনদীগুলির দ্বারা বাহিত পলিতে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরভূমি দ্রুত উঁচু হয়ে উঠেছে। সেজন্য ভাগীরথীকে যুগে যুগে তার পথটিকে আরও পূর্বদিকে সরিয়ে নিতে হয়েছে। পাটন ও হিজল বিল, ময়ূরাক্ষীর নিম্নাংশে দক্ষিণ বাহিনী দ্বারকা নদ, অজয়ের উপনদী ব্রাহ্মণীর উত্তরমুখী অংশ ও খাড়ি নদীর দক্ষিণমুখী পথ দিয়ে একটি নদীপথ কল্পনা করা যায়, যা প্রাচীন ভাগীরথীর পথ হতে পারে। তেমনি ত্রিবেণী থেকে ছোটনাগপুরের মালভূমির কাছ দিয়ে যে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী পথে নদীটি তাম্রলিপ্ত বন্দরে পৌঁছাত, সেই পথটি বিলুপ্ত হয়ে সরস্বতী ও পরবর্তীকালে সরস্বতী বিলুপ্ত হয়ে হুগলী নদী গড়ে ওঠা তো ভাগীরথীর পূর্বদিকে সরে যাওয়ার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

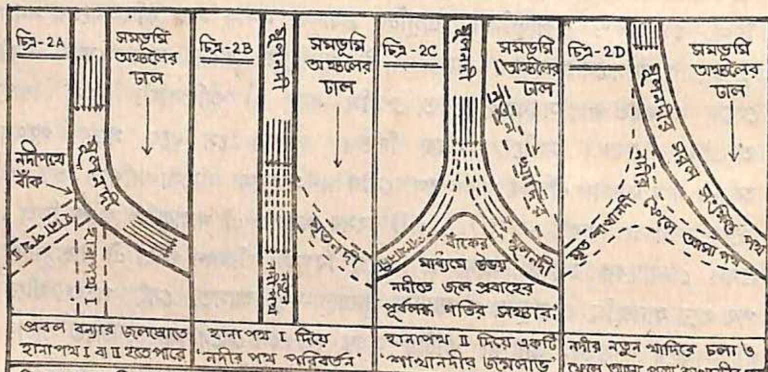
এখন নদীটির উপরাংশে রাজমহল পাহাড় থেকে নেমে আসা পলিতে ভাগীরথীর উৎস অঞ্চলটি যথেষ্ট উঁচু হয়ে গেছে। তাই এবার ভাগীরথীর ঐ অংশের পূর্ব দিকে সরে যাওয়ার পালা। বর্তমানে ভাগীরথী-পদ্মার উৎস অঞ্চলে পদ্মা বয়ে চলেছে দক্ষিণ-পূর্বমুখী ঢালু নীচু পথে আর ভাগীরথী বয়ে আসছে রাজমহল পাহাড়ের কোলে অপেক্ষাকৃত ও ক্রমাগত উঁচু হয়ে ওঠা পথে। জল তো উঁচু পথ পরিহার করে ঢালুতর পথে ছুটে চলবে, এটাই স্বাভাবিক। কাজেই ভাগীরথীর পথকে সরলায়িত করার সময় মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় তাকে আরও পূর্বদিকে সরিয়ে নিয়ে না এলে উৎসমুখেই নদীটি বিলুপ্ত হবে।

চতুর্থ কারণ—মনে রাখতে হবে হুগলী নদীর নিম্নাংশ একটি সামুদ্রিক খাড়ি (Estuary), যাকে প্রধানত জোয়ার-ভাঁটার নদী বলা হয়। চন্দ্রসূর্যের আকর্ষণে সমুদ্রের জলে যে জোয়ার ও ভাঁটার খেলা চলে প্রতিদিন, তা এই নদীপথ বেয়ে সমুদ্র থেকে বহুদূরে নবদ্বীপ পর্যন্ত এগিয়ে চলে। এছাড়া হুগলীর উপনদী রূপনারায়ণে ঘাটাল পর্যন্ত এবং হলদী-কংসাবতীতে পাঁশকুড়া পর্যন্ত জোয়ার-ভাঁটার প্রভাব বিস্তৃত হয়। অতীতে হুগলী, রূপনারায়ণ ও হলদী নদীর সঙ্গে যুক্ত ছিল অসংখ্য খাল ও তাদের শাখাখাল—যারা দক্ষিণ-বঙ্গের দূর-দূরান্তরের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শিরা উপশিরার মত ছড়িয়ে পড়ত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—হুগলী-বিদ্যাধরী খাল, বালি-ডানকুনি খাল,

সার্কুলার ক্যানাল, বেলগাছিয়া-ভাঙড় খাল, বেলিয়াঘাটা ও নিউকাট ক্যানাল, টালি নালা, বজবজ খাল, ফুলেশ্বর-আমতা খাল, কেঁদুয়া-কালসাপা খাল, উলুবেড়িয়া-মেদিনীপুর ক্যানাল, দেওড়ার খাল, ডায়মণ্ড হারবার ক্যানাল, কাকদ্বীপ খাল, হিজলী ক্যানাল, তমলুক ক্যানাল, পাঁশকুড়া-কোলাঘাট খাল ইত্যাদি। এছাড়া আছে সুন্দরবন অঞ্চলের অসংখ্য নদী, নালা, খাল, বিল, ভেড়ি ও জলাভূমি। এগুলি প্রধানত নদীর সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের সমগ্র ভূ-ভাগের যোগাযোগ স্থাপন করত। ঐ খালগুলি খরার সময় যেমন নদী থেকে জমিতে জল সরবরাহ করত, তেমনি বন্যা বা অতিবৃষ্টির সময় এরাই অতিরিক্ত জল নদীতে পৌঁছে দিত। এছাড়া সে যুগে সড়ক পথের অস্তিত্ব কম থাকায় ঐ সব খালপথে নৌকার সাহায্যে ব্যবসা-বাণিজ্য হত ও লোক চলাচল করত। 30 বা 40 বৎসর আগেও ঐ খালগুলি সক্রিয় ছিল। তখন জোয়ারের জলের সঙ্গে নদী থেকে বিপুল পরিমাণ পলি ঐ খালগুলির পথ ধরে ধানজমি, জলাভূমি ও অন্যান্য নিম্নভূমিতে আসত, সেই পলি ধীরে ধীরে ঝরে পড়ত; তারপর ভাঁটার সময় যে জল নেমে আসত, তাতে পলির পরিমাণ অনেক কমে যেত। এভাবে ঐ খালগুলির সাহায্যে একদিকে জমিগুলি উঁচু ও উর্বর হত, অন্যদিকে নদীর জলে পলির পরিমাণ কমে যেত। এই প্রক্রিয়া সারা বৎসর চলত এবং হুগলী, রূপনারায়ণ ও হলদী প্রভৃতি জোয়ার-ভাঁটার নদীকে গভীর রাখতে খালগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করত। আজ সড়কপথের আকর্ষণে ঐ খালগুলির সংস্কারসাধন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে খরার বছর জলের অভাবে চাষ বন্ধ হচ্ছে, অতি-বৃষ্টিতে জলনিকাশী সম্ভব হচ্ছে না, জমি তার উর্বরতা হারিয়ে ফেলছে, জলপথ পরিবহন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, দেশে মাছের অভাব ঘটছে আর সর্বোপরি নদীগুলি দ্রুত মজে যাচ্ছে। কাজেই হুগলী তথা অন্যান্য জোয়ার-ভাঁটার নদীকে বাঁচাতে ঐ খালগুলিকে উপযুক্তভাবে সংস্কার করা একান্ত প্রয়োজন। এরপর যে গুরুত্বপূর্ণ কারণে ভাগীরথী, জলঙ্গী ও চূর্ণীর পথে গঙ্গা বা উৎস থেকে জল (Head water) আগের মত আসছে না, তা আলোচনার পূর্বে আমি নিম্ন সমভূমি অঞ্চলে নদনদীর পথ পরিবর্তন ও শাখা-নদীর জন্ম-মৃত্যুর প্রধান কারণটি সম্বন্ধে আলোচনা করব।

নদনদীর পথ পরিবর্তন ও শাখানদীর জন্ম-মৃত্যু—নদীবিজ্ঞানের মূল কথাগুলি যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, তা একটি মাত্র বাক্যে লিপিবদ্ধ করলে দাঁড়ায় "ঢাল ও গতিমুখের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুষম বিস্তৃত প্রায় সরল পথই যে কোন একটি নদীর কাম্য।" কারণ ঢালই নদীর জলে নতুন গতির সঞ্চার করে, গতিমুখ একই থাকলে পূর্বলব্ধ গতি অনেকটা বজায়

থাকে, সুষম বিস্তার জলের গতিকে সংহত রাখে এবং পথের সরলতা সেই গতিকে নদীখাতমুখী করে। উপরিউক্ত পরিবেশে নদী সাবলীলভাবে বয়ে চলে ও ঐ পরিবেশের অভাব ঘটলে নদী বন্যাপ্রবণ হয়ে পড়ে। পার্বত্য অঞ্চলে ঢালই নদীপথকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু নিম্ন সমভূমি অঞ্চলে



চিত্র 2—সমভূমি অঞ্চলে নদনদীর পথ পরিবর্তন ও শাখানদীর জন্ম-মৃত্যুতে জলের পূর্বলব্ধ গতির ভূমিকা

ঢাল মাইল প্রতি 6 ইঞ্চির কম থাকায় নদী ঢালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন দিকে বইতে পারে। যেমন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ঢাল প্রায় দক্ষিণমুখী হলেও নদী দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বইতে পারে। এখানে জলের পূর্বলব্ধ গতি (Inertia of flow) নদীকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। নদীর পূর্বোক্ত পরিবেশের অভাব ঘটলে কোন এক বর্ষার প্রবল স্রোতে সাধারণত কোন এক বাঁকে নদী একটি হানাপথ কেটে নেয় (চিত্র 2A)। পরে নদীটি তার পূর্বপথে ফিরে যেতে পারে বা ঐ হানাপথ দিয়ে নতুন পথে চলতে পারে কিংবা দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে বইতে পারে। যদি তার পূর্বপথটি ঢাল ও গতিমুখের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে, তবে সে তার পুরানো পথে ফিরে যায়। কিন্তু যদি নতুন পথটি পূর্বপথের চেয়ে ঢাল ও গতিমুখের সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে সে নতুন পথে বইতে থাকে (চিত্র 2B)। এভাবে নদী তার পথ পরিবর্তিত করে। বিহারে কুশীনদীর বারবার পথ পরিবর্তন কিম্বা, 1787 খৃষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গে তিস্তার নতুন পথে চলা এরূপ কয়েকটি ঘটনা। [সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

কিন্তু যদি উপরের নদীর জলের গতি উভয় পথে সঞ্চারিত হয়, তবে উভয় নদীই তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং এভাবে একটি শাখানদী গড়ে ওঠে (চিত্র 2C)। ভবিষ্যতে কখনও যদি মূলনদীটি এমন ভাবে বইতে

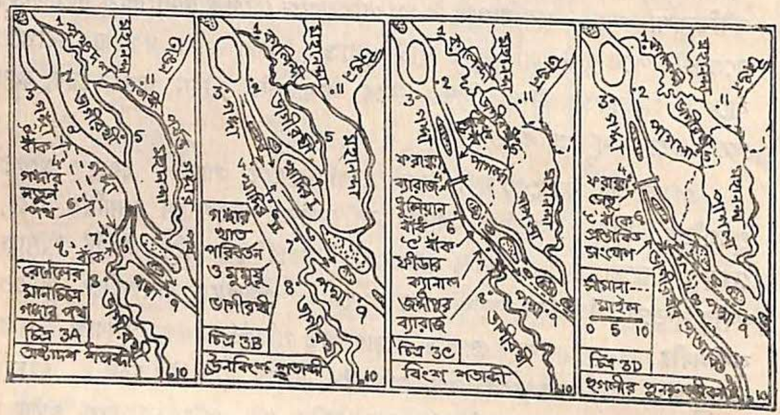
থাকে, যাতে শাখানদীর উৎসের কাছের বাঁকটি মিলিয়ে একটি সরল পথ গড়ে ওঠে, তবে উপরের নদীর জলের গতি আর শাখানদীতে সঞ্চারিত হয় না। তখন শাখানদীর উৎসমুখে জলের গতি স্তব্ধ হওয়ায় ঐ অঞ্চলে পলি জমে সে দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে (চিত্র 2D)। এটাই ভাগীরথী, ভৈরব, জলঙ্গী, মাথাভাঙা প্রভৃতি নদনদীগুলির মৃত্যুর প্রধান কারণ। এমন কি শাখানদীর পথটি উপরের নদীপথের সঙ্গে অধিকতর সরল হলে নিম্নাংশে মূলনদীটিও মিলিয়ে যেতে পারে। পূর্ববঙ্গে পদ্মার কীর্তিনাশা খাতে বয়ে যাওয়া কিংবা পশ্চিমবঙ্গে বেগোর হানা দিয়ে দামোদরের মুণ্ডেশ্বরীর পথে ছুটে চলা এরূপ দুটি দৃষ্টান্ত। মনে রাখা দরকার নদীপথে বাঁকের অবস্থিতির উপর নির্ভর করে শাখানদীর জীবন মাত্র কয়েক বছর থেকে কয়েক শ' বছর হতে পারে।

এছাড়া অন্য কারণেও নদীর পথ পরিবর্তিত হতে পারে। যেহেতু জলের দ্রুতগতির দিক সমভূমি অঞ্চলে নদীপথকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে, সেহেতু হয়তো কোন পার্বত্য উপনদীর বন্যার ক্ষিপ্রগতি একটি বিশাল নদীর খাতকে পরিবর্তনে সাহায্য করতে পারে। এককালে মণিহারীতে পতিত কুশীনদীর জন্য মালদহ জেলায় গঙ্গার খাত পরিবর্তন কিংবা পূর্ববঙ্গে তিস্তার বন্যাগুলির জন্য ব্রহ্মপুত্রের পথ পরিবর্তন এরূপ দুটি উদাহরণ। এছাড়া ভূমিকম্পের ফলে ভূস্তরের পরিবর্তন হয়ে নদীর পথ পরিবর্তন হয়ে থাকে। এখানে বলা দরকার উপরের আলোচনাটি নদীর পথ পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ কারণ, যদিও নদীর অববাহিকায় পলি জমে ঢালের পরিবর্তন এর পরোক্ষ কারণ।

পঞ্চম কারণ—মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাগীরথীর উৎসের কাছে গঙ্গানদী বর্তমানে ঢাল ও গতিমুখের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রায় সরল পথে বয়ে চলেছে এবং ভাগীরথী সেই পথের সঙ্গে 90°-র অধিক কোণে উৎপন্ন হয়েছে। ফলে গঙ্গানদীর মাঝ বরাবর জলের যে তীব্র গতি আছে, তা শুধু পদ্মার পথে ছুটে চলে ও ভাগীরথীর পথে সঞ্চারিত হয় না। ফলে ভাগীরথীতে যে জল আসে তাতে গতি সামান্যই থাকে। আর সেই স্বল্প গতির জল শুধু পলি ঝরিয়ে দিতে পারে, পলি সরিয়ে নদীকে গভীর করার ক্ষমতা তার কোথায়? এই কারণে ঐ অঞ্চলে ভাগীরথীর খাত প্রতি বছর 3 ইঞ্চি হিসাবে উঁচু হয়ে উঠেছে। তাহলে এতদিন ভাগীরথী বেঁচেছিল কেমন করে? এজন্য ঐ অঞ্চলে গঙ্গা-পদ্মা-ভাগীরথীর অতীত পথের মানচিত্র সন্নিবেশিত হল।

দূর অতীতে গঙ্গানদী মালদহ জেলায় কালিন্দী ও মহানন্দার পথে বয়ে

যেত। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মেজর রেণেলের মানচিত্রে দেখা যায় যে, গঙ্গানদী রাজমহলের নীচে যে পথে বয়ে চলেছে তাতে দুটি বাঁক a ও b রয়েছে [চিত্র 3A] ও নদীটি মালদহ জেলার ভিতর দিয়ে চলেছে। নদীর b বাঁকটি ভাগীরথীর উৎসের ঠিক উপরে থাকায় গঙ্গার জলের গতি পদ্মা ও ভাগীরথী উভয়ের পথে সঞ্চারিত হত। পরবর্তীকালে গঙ্গানদী a থেকে b পর্যন্ত রাজমহল পাহাড়ের কোল দিয়ে অন্য একটি পথ কেটে



বিভিন্ন শতাব্দীতে ভাগীরথীর উৎস-অঞ্চলে গঙ্গা, পদ্মা ও ভাগীরথীর পথ। মানচিত্রে প্রদর্শিত বিভিন্ন স্থানের নাম: 1—রতুয়া, 2—মাণিকচক, 3—রাজমহল, 4—ফরাক্কা, 5—গৌড়, 6—ধূলিয়ান, 7—সুতী, 8—জঙ্গীপুর, 9—লালগোলা, 10—মুর্শিদাবাদ, 11—মালদহ।

নেয় এবং উনবিংশ শতাব্দীতে গঙ্গানদী ঐ অঞ্চলে প্রধানত দুটি খাদিরে বয়ে চলে [চিত্র 3B]। [মাঝে দ্বীপ সৃষ্টি করে নদী দু'টি পথে বয়ে চললে সেই পথকে খাদির বলে।] আবার যেহেতু দ্বিতীয় খাদিরের পথটি উপরে ও নীচে পদ্মার পথে সঙ্গে প্রায় সরল ছিল, সেহেতু গঙ্গানদী দ্বিতীয় খাদিরের পথটি বেছে নেয় এবং প্রথম খাদিরটি দ্রুত মিলিয়ে যায়। এভাবে বিংশ শতাব্দীতে গঙ্গার বর্তমান পথটি গড়ে ওঠে [চিত্র 3C]। প্রথম খাদিরটির অবশেষ পাগলা নদী ও ছোট ভাগীরথীর অংশবিশেষ হয়ে সেই গঙ্গার পথরেখারূপে আজও বর্তমান আছে। এভাবে গঙ্গার সমস্ত প্রবাহ পদ্মার পথে ছুটে চলেছে এবং ভাগীরথীর পথটি গঙ্গার পথের সঙ্গে লম্বভাবে থাকায় জলের গতি না পাওয়ার জন্য ভাগীরথী উৎসমুখে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

এখন ভাগীরথীকে পুনর্জীবিত করতে হলে এর উৎস গঙ্গার কোন বাঁকে স্থাপিত করা দরকার। ধূলিয়ান শহরের দক্ষিণপূর্বে নিমতিতার কাছে কাছে গঙ্গার যে স্বাভাবিক বাঁক C আছে এবং যেখানে গঙ্গার তীব্রতম ভাঙন চলছে, সেখান থেকে ভাগীরথীর পথটি এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত, যাতে গঙ্গার জলধারার দক্ষিণমুখী তীব্রগতি ভাগীরথীর পথে বহুদূর পর্যন্ত সঞ্চারিত হয় [চিত্র 3D]। আর তখনই মুমূর্ষু ভাগীরথী নতুন জীবন লাভ করবে বলে আমার বিশ্বাস। এখানে মনে রাখা দরকার, শাখানদীর জন্মমৃত্যুর ইতিহাসে ভাগীরথী একটি উদাহরণ মাত্র। প্রকৃতিতে এরূপ ঘটনা নিয়তই ঘটে চলেছে। পরবর্তী অধ্যায়ে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

ভাগীরথী-হুগলীর পুনরুজ্জীবন ও জলপথ পরিবহন—পূর্বের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় ধূলিয়ান শহরের দক্ষিণ-পূর্বে নিমতিতার কাছে যেখানে গঙ্গার ভাঙন চলছে, সেখান থেকে ভাগীরথীর পথকে গঙ্গার পথের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করলে গঙ্গানদীর জলধারা তার পূর্বলব্ধ প্রবল গতিসমেত আবার ভাগীরথীর পথে ছুটে চলবে এবং নিম্নাংশে মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় ভাগীরথীর পথকে সরলায়িত করলে ঐ জলের তীব্রগতি ভাগীরথীর খাতকে গড়ে তুলবে। এছাড়া অজয় ও ময়ূরাক্ষীর পথগুলি সংযোগস্থলে ভাগীরথীর পথের সঙ্গে প্রায় সরল করলে ঐ নদী দু'টি ঐ অঞ্চলে পলি ঝরিয়ে না দিয়ে বরং পলি সরাতে সাহায্য করবে। তারপর সবশেষে দ্বারকেশ্বর ও দামোদরের 4-5 লক্ষ কিউসেকের বন্যাগুলি দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত পথে ছুটে এসে হুগলী নদীর মোহানার পলি দূর সাগরে নিক্ষেপ করবে। [32 পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য]

অর্থাৎ ঊর্ধে গঙ্গানদী ভাগীরথীতে প্রাণ সঞ্চার করবে, মধ্যে ময়ূরাক্ষী ও অজয় তার পথকে সাবলীল করে রাখবে এবং নিম্নে দামোদর তার পথের সব বাধা সরিয়ে দেবে। তখন ভাগীরথী নবযৌবনা রাজকন্যার মত ছুটে চলবে তার দয়িত সাগরের পানে এবং দু'ধারে স্নেহ-অঞ্চল বিছিয়ে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে শস্যশ্যামল ও সমৃদ্ধ করে তুলবে। তখন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে যে নদীটি ছুটে চলবে সে থাকবে না মুমূর্ষু হুগলী, সে হবে না প্রমত্তা পদ্মা, সে হয়ে উঠবে পুণ্যসলিলা ভাগীরথী—যে ভাগীরথীর জলে অবগাহন করে এককালে জেগে উঠেছিল বাংলার শিল্প, বাণিজ্য ও সংস্কৃতি।

তখন নতুন জীবন লাভ করবে ভাগীরথী-হুগলীর তীরে গড়ে ওঠা কলিকাতা বন্দর ও বহু শহর, ব্যাণ্ডেল ও কাশীপুরের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি, শতাধিক চটকল এবং অসংখ্য কলকারখানা—যেখানে আমরা সহস্র সহস্র কোটি টাকার সম্পদ নিয়োজিত করেছি এবং যেগুলির উপর নির্ভর করে

আছে পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্বভারতের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা। একথা ঠিক যে ভাগীরথী ও অন্যান্য নদনদীতে আলোচিত পথে পরিচালিত করতে ও সরলায়িত করতে আমাদের রেলপথ, সড়কপথ ও সম্পদগুলির পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন হবে। কিন্তু বর্ষার জলস্রোতের প্রবল শক্তি দ্বারা ঐ সকল সম্পদকে বারবার ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার চেয়ে একবার নদীকে তার সরল পথ করে দিয়ে বন্যার সেই প্রবল শক্তিকে নদীখাতমুখী করে আরও বহুগুণ সম্পদকে রক্ষা করা যুক্তিযুক্ত নয় কি ?

আমরা তখন শুধু অতীতের সেই ভাগীরথীকে ফিরে পাব না, চন্দননগর ও ব্যারাকপুরের কাছে বাঁকের অবস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাঁচিয়ে তুলতে পারব সরস্বতী ও বিদ্যাধরীকে,—যে বিদ্যাধরীর পথে সুন্দরবনের নদনদীর পুনরুজ্জীবন সম্ভব হতে পারে। এছাড়া সমগ্র উত্তর ভারতের সঙ্গে কলিকাতার জলপথে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে এবং ঐসব নদীর তীরে গড়ে ওঠা বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র থেকে আমাদের বাণিজ্যতরণীগুলি পণ্যসম্ভার নিয়ে অতীতের মত দূর দূরান্তরে পাড়ি দেবে। আজ সড়ক ও রেলপথের প্রতি অত্যধিক আকর্ষণে আমরা জলপথকে অবহেলা করে চলেছি। অথচ সড়ক ও রেলপথে পরিবহনের জন্য যে বিপুল পরিমাণ শক্তি ব্যয়িত হয়, তার মাত্র এক-দশমাংশ শক্তিতে জলপথে পরিবহন সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা রেলপথ ও সড়ক পথের উন্নয়নের জন্য যত অর্থ ব্যয় করি, তার এক-শতাংশ অর্থও নদীপথ উন্নয়নে ব্যয় করি না। ফলে নদীর কল্যাণময় রূপটি শুধু যে হারিয়ে গেছে তাই নয়, সে আজ তার বন্যাগুলির তাণ্ডবলীলায় আমাদের সব কিছু ধ্বংস করে চলেছে। পৃথিবীর সব দেশই পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে জলপথকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়, আর আমরা এই নদীমাতৃক দেশে জলপথ পরিবহনের বিরাট সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে চলেছি। এছাড়া বর্তমান শক্তি ঘাটতির যুগে সড়ক ও রেলপথের তুলনায় জলপথ পরিবহনকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে শক্তির বিপুল অপচয় নিবারণের চিন্তা করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় নয় কি ?

প্রসঙ্গত বলি যে, বর্তমানে শুখা মরশুমে গঙ্গানদীর জলবণ্টন নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের নদীবিশেষজ্ঞদের মধ্যে আলোচনা চলছে। কিন্তু আমার মনে হয় ভাগীরথী-হুগলীকে বাঁচাতে গ্রীষ্মের জলবণ্টন নিয়ে অহেতুক বিরোধের প্রয়োজন নেই। যেমন গঙ্গার খাত তো গ্রীষ্মকালের 1 বা 2 লক্ষ কিউসেক প্রবাহের জন্য গড়ে ওঠেনি, বর্ষার 18 বা 22 লক্ষ কিউসেকের বন্যাগুলিতেই তা সৃজিত হয়েছে। তাই ভাগীরথীকে বাঁচাতে যে জলের প্রয়োজন, তা হল বর্ষাকালে গঙ্গার খাতে নেমে আসা লক্ষ লক্ষ কিউসেক

জলের প্রবাহ, যা প্রতি বৎসরই গঙ্গা-পদ্মার দু-কূল প্লাবিত করে ছুটে চলেছে এবং যে জলের ভাগাভাগি নিয়ে দু'দেশের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এখন যদি নিবন্ধে বর্ণিত পথে গঙ্গার বন্যাগুলি থেকে 3 বা 4 লক্ষ কিউসেক প্রবাহ ভাগীরথীর বক্ষে বইয়ে দেওয়া যায়, তবে একদিকে যেমনি ভাগীরথী-হুগলী পুনর্জন্ম লাভ করবে, অন্যদিকে তেমনি প্রমত্তা পদ্মাও শান্ত হবে। ফলে ভারত ও বাংলাদেশ উভয়েই উপকৃত হবে।

হুগলীর তলকর্ষণ ও গঙ্গার ভাঙন—বর্তমানে কলিকাতা বন্দরকে বাঁচানোর জন্য হুগলী নদীকে তলকর্ষণ বা ড্রেজিং করতে প্রতি বৎসর 10 কোটি টাকা ব্যয়িত হয়। কিন্তু তলকর্ষণের দ্বারা নদীর পলি অপসারিত হয় অতি সীমিত হারে এবং নদীখাতের সামগ্রিক কোন উন্নতি হয় না। এখন নিবন্ধে বর্ণিত পথে ভাগীরথী-হুগলী এবং অজয় ও দামোদরকে পরিচালিত করলে নদীগুলির জলের গতি নদীখাতমুখী হওয়ায় 5 বা 6 বৎসরের মধ্যে তাদের পথকে গড়ে তুলবে এবং তলকর্ষণের কোন প্রয়োজন থাকবে না।

বিহারের মণিহারী থেকে রাজমহল পাহাড়ের কোল দিয়ে বয়ে চলা প্রায় 50 মাইল দক্ষিণমুখী সরল ঢালু পথে গঙ্গানদীর জলধারা প্রবল গতি পায়। গঙ্গা-পদ্মার পরবর্তী পথটি প্রায় দক্ষিণ-পূর্বমুখী হওয়ায় জলের পূর্বোক্ত দক্ষিণমুখী প্রবল গতি ধূলিয়ান থেকে লালগোলা পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গার তীরবর্তী প্রায় 60 মাইল দীর্ঘ বাঁধের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং প্রতি বৎসর গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে চলে—যা ঐ অঞ্চলে গঙ্গার ভাঙনের প্রকৃত কারণ। এছাড়া ফরাক্কা ব্যারাজের উঁচু ভিত থেকে নেমে আসা জলের গতি সেই ভাঙনকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছে। প্রতি বৎসর গঙ্গার ভাঙনরোধে বিপুল অর্থ ব্যয়িত হলেও পর বৎসর নতুন ভাঙনের সৃষ্টি হয়। কাজেই গঙ্গার ভাঙন রোধের উপায় হল গঙ্গার জলধারার ঐ দক্ষিণমুখী গতিকে কোন নদীখাতে, এখানে ভাগীরথীর খাতে, বইয়ে দেওয়া। আবার ফরাক্কা ব্যারাজের জন্য ও ব্যারাজ-পণ্ডে (Barrage-Pond) পলি জমার জন্য ফরাক্কার উজানে মালদহ জেলার প্রায় 45 মাইল দীর্ঘ বাঁধে প্রবল চাপ পড়ছে [চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য]। সব মিলিয়ে বলা যায় যে, নিবন্ধে বর্ণিত পথে ভাগীরথীর পুনরুজ্জীবন ও ফরাক্কা ব্যারাজের বন্ধন থেকে গঙ্গার মুক্তিই গঙ্গার ভাঙন, ভাগীরথীর প্লাবন ও হুগলীর তলকর্ষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাব্য উপায়।

প্রস্তাবিত নদীসংস্কার প্রকল্পের অনুমিত ব্যয়—গঙ্গার ভাঙন রোধ ও হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবনের জন্য নদীসংস্কারের যে সকল কাজ অবশ্য

করণীয় তা হল—(1) গঙ্গাকে ফরাক্কা ব্যারাজের বন্ধন থেকে ও ভাগীরথীকে জঙ্গীপুর ব্যারাজের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে। (2) ভাগীরথীর উৎসকে ধূলিয়ান সহরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত গঙ্গার একটি বাঁকে সংস্থাপিত করতে হবে, যাতে গঙ্গার জলধারা তার দক্ষিণমুখী পূর্বলব্ধ গতি (বা Inertia of flow) নিয়ে ভাগীরথীর খাতে এগিয়ে চলে। উৎসস্থলে বন্যার জলের গতি সেকেণ্ডে 16 ফুটের অধিক থাকায় 1000 ফুট বিস্তৃত ও 25 ফুট গভীর একটি খাতে 4 লক্ষ কিউসেক জলপ্রবাহ আনা সম্ভব হবে। (3) ভাগীরথীর উৎস থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত নদীর সর্পিল 200 মাইল পথকে সরলায়িত করতে হবে। তখন ঐ পথের দৈর্ঘ্য হবে মাত্র 125 মাইল, যার 75 মাইল বর্তমান নদীখাতের সংস্কার করে গড়ে তোলা যাবে প্রায় 150 কোটি টাকা ব্যয়ে। অবশিষ্ট 50 মাইল নতুন পথের জন্য খরচ হবে আরও 150 কোটি টাকা। (4) দামোদরের 4 লক্ষ কিউসেক বন্যা আনার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত বাঁকুড়া জেলার 16 মাইল দীর্ঘ নতুন পথ [32 পৃষ্ঠার মানচিত্রে 4নং পথ] গড়ে তুলতে হবে, যার বিস্তার ও গভীরতা হবে যথাক্রমে 1000 ফুট ও 20 ফুট। এতে আনুমানিক খরচ 50 কোটি টাকা। এছাড়া নিম্নাংশে দ্বারকেশ্বর ও রূপনারায়ণের পথকে সংস্কার করতে খরচ পড়বে আরও 50 কোটি টাকা। (5) অজয়, ময়ূরাক্ষী, ও কংসাবতীর স্বাভাবিক বা জলাধারগুলি থেকে কৃত্রিম বন্যা আনার জন্য নদীগুলিকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত পথে [32 পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য] পরিচালিত করতে খরচ হবে আনুমানিক 100 কোটি টাকা। (6) গেঁওখালি থেকে হলদিয়া পর্যন্ত 10 মাইল দীর্ঘ হুগলী নদীর সরলায়িত পথটি গড়ে তুলতে হবে প্রায় 50 কোটি টাকা ব্যয়ে এবং (7) সর্বোপরি জোয়ার-ভাঁটার সাহায্যে নদী থেকে পলি আহরণের জন্য চব্বিশ-পরগণা, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার খালগুলির সংস্কারের জন্য খরচ হবে 50 কোটি টাকা। এভাবে সমগ্র নদীসংস্কার প্রকল্পের মোট অনুমিত ব্যয় হল 600 কোটি টাকা।

আমার মনে হয় চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত ব্রহ্মপুত্র নদে ব্যারাজ নির্মাণ ও অন্য রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা সংযোগ খাল খননের মত 1500 কোটি টাকার একটি অকার্যকর ও অবাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ না করে নিজ রাজ্যের মধ্যে উল্লিখিত 600 কোটি টাকার নদীসংস্কার প্রকল্প গ্রহণ করলে একদিকে গঙ্গার ভাঙন রোধ ও হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবন এবং অন্যদিকে সমগ্র গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বন্যানিয়ন্ত্রণ, নদী-সেচব্যবস্থা, সুষ্ঠু জলনিকাশী ব্যবস্থা, জলপথ পরিবহন ও নদীখাতের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব হবে।*

* ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু জ্ঞান ও বিজ্ঞান, এপ্রিল 1980 সংখ্যায় প্রকাশিত।

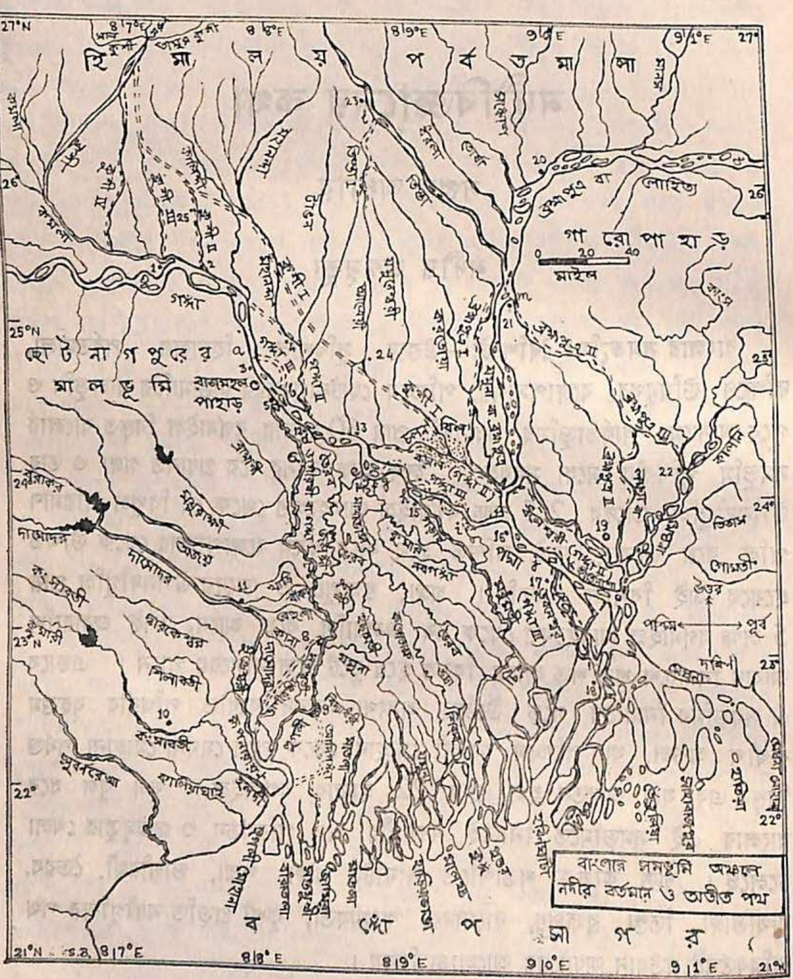
নদীবিজ্ঞানের কথা

সপ্তম অধ্যায়

নদীর জন্মমৃত্যু

বাংলার সমভূমির বৈশিষ্ট্য—উত্তরে সুবিশাল হিমালয় পর্বতমালা, দক্ষিণে ঊর্মিমুখর বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে ছোটনাগপুরের রাঙামাটির মালভূমি ও পূর্বে আসামের পার্বত্যভূমির মধ্যবর্তী প্রায় 60 হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত বাংলার সমভূমি পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে প্রধানত গঙ্গা ও তার উপনদীগুলি তাদের 2·5 লক্ষ বর্গমাইল আবহক্ষেত্র থেকে যে বিপুল পরিমাণ পলি বয়ে এনেছে, তাই সঞ্চিত হয়ে ধীরে ধীরে বঙ্গোপসাগর থেকে উত্থিত হয়েছে এই বিশাল সমভূমি। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও তাদের উপনদীগুলি প্রায় 5 লক্ষ বর্গমাইল আবহক্ষেত্র থেকে যে জলরাশি বয়ে আনে, সেই জলরাশি আবার নিম্নাংশে শত শত ধারায় বিভক্ত হয়ে ছুটে চলে সাগরের পানে। এভাবে ঐ সমভূমির নিম্নাংশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য নদনদীবিধৌত পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ অঞ্চল, যা পশ্চিমে হুগলী মোহানা থেকে পূর্বে মেঘনা মোহানা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং যার আয়তন হল প্রায় 22 হাজার বর্গমাইল। যুগ যুগ ধরে বাংলার এই সমভূমিতে নিয়তই নদনদীর পথ পরিবর্তন ও জন্মমৃত্যুর খেলা চলেছে। গত কয়েক শতাব্দীতে সংঘটিত গঙ্গা, পদ্মা, ভাগীরথী, ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, দামোদর, কংসাবতী, কুশী প্রভৃতি নদীগুলির পথ পরিবর্তনই বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

বাংলার এই সমভূমি দক্ষিণে সমুদ্রোপকূল থেকে ধীরে ধীরে প্রধানত উত্তরে উঁচু হয়ে গেছে। উত্তরে সমভূমিটির মাইল প্রতি ঢাল 6 ইঞ্চির কাছাকাছি আর দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলের মাইল প্রতি ঢাল মাত্র 1 ইঞ্চি। সমভূমিটির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হল, মাইল প্রতি ঢাল অত্যন্ত কম থাকায় এটি প্রায় অনুভূমিক (nearly horizontal) হয়ে ওঠে। ফলে প্রায় দক্ষিণমুখী ঢালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নদীগুলি পরস্পরকে ছেদ করে বিভিন্ন দিকে যথা দক্ষিণ, দক্ষিণপূর্ব বা দক্ষিণপশ্চিম দিকে বয়ে যেতে পারে এবং বর্ষায় নরম পলিমাটির মধ্য দিয়ে হানাপথ কেটে নিত্য নতুন পথে প্রবাহিত হতে পারে। ঢাল কম থাকায় ঢাল নদীর জলে গতি সঞ্চার করে না



নদীর বর্তমান পথ———, নদীর অতীত পথ = = =

ভাগীরথী I—প্রাচীন ভাগীরথী বা গঙ্গা, গঙ্গা I—চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত গঙ্গার প্রধান ধারা, গঙ্গা II—পঞ্চদশ শতাব্দীতে গঙ্গা, গঙ্গা III–অষ্টাদশ শতাব্দীতে গঙ্গা ; ব্রহ্মপুত্র I—প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র, ব্রহ্মপুত্র II—পঞ্চদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মপুত্র ; ব্রহ্মপুত্র III—অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মপুত্র ; কুশী I—প্রাচীন কুশী, কুশী II–অষ্টাদশ শতাব্দীতে কুশী, কুশী III—উনবিংশ শতাব্দীতে কুশী, কুশী IV—বিংশ শতাব্দীর প্রথমে কুশী ; খাড়ি, বাঁকা বেহুলা, কানা ইত্যাদি—দামোদরের অতীত পথ। মুণ্ডেশ্বরী—দামোদরের বর্তমান পথ।

বললেই চলে ; ফলে নদীর উচ্চ ও মধ্য প্রবাহ থেকে জল যে গতি নিয়ে আসে, সেই পূর্বলব্ধ গতি (Inertia of flow) নদীর পথকে প্রধানত নিয়ন্ত্রিত করে। অর্থাৎ গতিমুখের (Direction of flow) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার জন্য যখন যে হানাপথে জলের পূর্বলব্ধ গতি এগিয়ে চলে, সেই নদীখাতই বড় হয়ে ওঠে। এভাবে নদীর পথ পরিবর্তিত হয়। আবার নদীতে বাঁকের মাধ্যমে জলের পূর্বলব্ধ গতি দুটি নদীখাতে সঞ্চারিত হলে একটি শাখানদীর সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ডানদিকের জলরাশি গতিসমেত ডানদিকের নদীতে এবং বামদিকের জলরাশি গতিসমেত বামদিকের নদীতে এগিয়ে চললে নিম্নাংশে নদীটি দ্বিধাবিভক্ত হয় ; এছাড়া নদীর সামান্য পথ পরিবর্তনের ফলে যদি দুটি নদীর উৎস অঞ্চলে বাঁকটি মিলিয়ে যায়, তবে নদী আবার একটি ধারায় বয়ে চলে। নদীর পথ পরিবর্তন ও জন্মমৃত্যুর ইতিহাসে নদীতে জলের পূর্বলব্ধ গতির এই ভূমিকা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। [74 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] এখানে তারই কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

নদীর পথ পরিবর্তন ও শাখানদীর জন্মমৃত্যুর কয়েকটি উদাহরণ—
(1) পঞ্চদশ শতাব্দীতে গঙ্গানদী মালদহ জেলায় কালিন্দী-মহানন্দার পথে বয়ে যেত এবং গৌড় শহরের কাছে পদ্মা ও ভাগীরথী নামে দুটি ধারায় বিভক্ত হত। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে গঙ্গানদী যখন মালদহ জেলার বর্তমান পাগলা নদীপথে (1নং চিত্রে গঙ্গা II) ছুটে চলত, তখন সুতীর কাছে অবস্থিত 'b' বাঁকের মাধ্যমে গঙ্গাজলের পূর্বলব্ধগতি পদ্মা ও ভাগীরথী উভয় পথে বজায় থাকায় দুটি নদীই সাবলীলভাবে বয়ে চলত। পরবর্তীকালে গঙ্গা ফরাক্কার কাছে 'a' বাঁক থেকে 'b' বাঁক পর্যন্ত একটি নতুন পথ গড়ে তোলে। ঐ পথ পদ্মাপথের সঙ্গে সরল থাকায় গঙ্গাজলের পূর্বলব্ধ গতি শুধু পদ্মার পথে ছুটে চলে এবং সেই পথ থেকে লম্বভাবে উৎপন্ন ভাগীরথী গঙ্গাজলের গতি না পাওয়ায় দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে। প্রসঙ্গত বলি, বর্তমানে ভাগীরথীর পথকে সরলায়িত করে যদি এর উৎস ধুলিয়ান শহরের কাছে গঙ্গার 'c' বাঁকে স্থাপিত করা হয়, তবে ভাগীরথী-হুগলী পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারে। [ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত]

---

82 পৃষ্ঠায় মানচিত্রে প্রদর্শিত বিভিন্ন স্থানের নাম : 1—কুর্শেলা, 2-মণিহারী, 3-ফরাক্কা, 4—গৌড়, 5-সুতী, 6-মুর্শিদাবাদ, 7-নবদ্বীপ, 8-ত্রিবেণী, 9-কলিকাতা, 10-মেদিনীপুর, 11-বর্ধমান, 12-লালগোলা, 13-রাজসাহী, 14-জলাঙ্গী, 15-কুষ্টিয়া, 16-গোয়ালন্দ, 17-শিবচর, 18-মেহেন্দীগঞ্জ, 19-ঢাকা, 20-ধুবড়ী, 21-বাহাদুরবাদ, 22-দৌলতকান্দি, 23-জলপাইগুড়ি, 24-সান্তাহার, 25-পূর্ণিয়া।

(2) অতীতে মুর্শিদাবাদ জেলায় লালগোলার কাছে গঙ্গানদী দুটি খাদিরে বয়ে চলত, যার দক্ষিণের খাদিরের 'd' বাঁক থেকে উৎপন্ন হয়েছিল গঙ্গার অন্যতম প্রধান শাখানদী ভৈরব। [মানচিত্র দ্রষ্টব্য] ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে গঙ্গা-পদ্মা প্রধানত দক্ষিণের খাদির দিয়ে বয়ে চলত বলে সে যুগে ভৈরব একটি বিশাল নদ ছিল। এই ভৈরব নদের তীরে গড়ে উঠেছিল দর্শনা, যশোহর ও খুলনা প্রভৃতি বন্দর এবং দক্ষিণ বঙ্গের সমৃদ্ধির পিছনে ঐ বন্দরগুলির অবদান ছিল বিরাট। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে পথের সরলতার জন্য গঙ্গার মূলধারা উত্তরের খাদিরের পথে বয়ে চলে। ফলে দক্ষিণের খাদির ও 'd' বাঁকটি মিলিয়ে যায় ও মহাপরাক্রম ভৈরব নদও মৃত্যুপথযাত্রী হয়।

(3) অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে পদ্মানদী রাজসাহী থেকে দক্ষিনমুখী হয়ে প্রায় 15 মাইল চলার পর মুর্শিদাবাদ জেলায় জলাঙ্গীর কাছে হঠাৎ 90°-র অধিক কোণে ঘুরে উত্তর-পূর্বমুখী হয়েছিল আর পদ্মার সেই বাঁক 'e' থেকে উৎপন্ন হয়েছিল ভাগীরথীর প্রধান উপনদী জলঙ্গী। [মানচিত্র দ্রষ্টব্য] এই জলঙ্গী ও ভাগীরথীর মিলনস্থলে ছিল সে যুগের বাংলার প্রধান সংস্কৃতিকেন্দ্র নবদ্বীপ। রেণেলের মানচিত্রে [69 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] দেখা যায় যে, ঐ অঞ্চলে পদ্মানদী দ্বিতীয় একটি খাদির গড়ে তুলেছে, যে খাদিরের 'f' বাঁক থেকে গড়ে উঠেছে মাথাভাঙা—কুমার, ইছামতী ও পরবর্তীকালে চূর্ণী প্রভৃতি যার শাখানদী। তখনও পদ্মা ঐ অঞ্চলে দু'টি খাদিরে প্রবাহিত হত বলেই জলঙ্গী, মাথাভাঙা, কুমার, ইছামতী প্রভৃতি নদনদীগুলি গাঙ্গেয় নিম্নভূমিতে সাবলীলভাবে বয়ে চলত, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে পদ্মানদী সেখানে তৃতীয় একটি খাদির গড়ে নেয় এবং সংক্ষিপ্ত পথের জন্য পদ্মার মূলধারা বর্তমানে ঐ তৃতীয় খাদিরের পথে ছুটে চলেছে। ফলে পূর্বোক্ত যে দু'টি খাদিরে পদ্মার অস্তিত্বই প্রায় নেই, সেই সব খাদির থেকে উৎপন্ন নদীগুলি বাঁচবে কেমন করে? আর সেইজন্যে তো জলঙ্গী, মাথাভাঙা ও তাদের শাখানদীগুলি যথা কুমার, ইছামতী ও চূর্ণী আজ দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। এখন পদ্মাকে তার পুরানো খাদিরে ফিরিয়ে আনলে অথবা তৃতীয় খাদিরের 'g' বাঁকে মাথাভাঙার উৎসটি স্থাপিত করলে ঐ সব নদীগুলি নতুন জীবন লাভ করতে পারে।

(4) অষ্টাদশ শতাব্দীর রেণেলের মানচিত্রে মাথাভাঙা-ইছামতীর অস্তিত্ব থাকলেও চূর্ণী নদীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতা ও ঢাকার মধ্যে পরিবহণের উদ্দেশ্যে জলপথ সংক্ষেপ করার জন্য নদীয়া জেলায় কয়েকটি খালের সংস্কার ও সংযোগ সাধন করা হয়, যাতে হুগলী নদী থেকে সরাসরি মাথাভাঙা হয়ে পদ্মায় পৌঁছান সম্ভব হয়। কিন্তু ঐ খালের উৎসটি মাথাভাঙা-ইছামতীর একটি বাঁকে অবস্থিত থাকায় মাথাভাঙার জলরাশির একাংশ

ঐ খাল পথে প্রবাহিত হয়ে ভাগীরথীতে পতিত হয় এবং খালটি চূর্ণীনদীতে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে অবশ্য মাথাভাঙার মৃত্যুই চূর্ণী নদীর মৃত্যু ডেকে এনেছে।

(5) মেজর রেণেলের মানচিত্রে পদ্মানদীর অনেকগুলি বাঁকের মধ্যে একটি বাঁক কুষ্ঠিয়ার কাছে অবস্থিত। ঐ বাঁক 'h' থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পদ্মার একটি হানাপথ গড়ে ওঠে। [মানচিত্র দ্রষ্টব্য] সেই হানাপথ গড়াই নদীর মধ্য দিয়ে নিম্নাংশে পদ্মার অপর শাখানদী মধুমতীর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং 1820 সাল থেকে 1830 সাল পর্যন্ত মাত্র 11 বৎসরে গড়াই-মধুমতী একটি বিশাল নদীতে রূপান্তরিত হয়—যে নদীপথ ধরে বাণিজ্য-জাহাজগুলি বাংলাদেশের কুষ্ঠিয়া বন্দরে পৌঁছায়। পদ্মার পথে 'h' বাঁকটি আজও অবস্থান করছে বলে গড়াই-মধুমতী পদ্মার একটি বড় শাখানদীরূপে বয়ে চলেছে। প্রসঙ্গত বলি, রেণেলের মানচিত্রে রাজবাড়ীর কাছে গঙ্গার একটি বাঁক 'i' ছিল মধুমতী নদীর উৎসস্বরূপ। পরে ঐ বাঁকটি মিলিয়ে যাওয়ায় উর্ধ্বাংশে মধুমতী শীর্ণকায়া হয়ে পড়ে। কিন্তু গড়াই নদীর জল পাওয়ায় মধুমতীর নিম্নাংশটি আজও সজীব রয়েছে, যা পূর্বে বলেছি।

(6) হিমালয় থেকে উত্তরবঙ্গে নেমে আসা নদীগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হল তিস্তা। রেণেলের মানচিত্রে [69 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] দেখা যায় যে, তিস্তানদী নিম্নাংশে তিনটি পথে তার জলরাশি গঙ্গা-পদ্মায় ঢেলে দিচ্ছে—পথগুলি হল পুণর্ভবা, আত্রেয়ী ও করতোয়া। আজ থেকে প্রায় দু'শ বৎসর আগের কথা—1787 সালের 27শে অগাষ্ট। হিমালয়ের কোলে অঝোর ধারায় বৃষ্টির ফলে তিস্তার বুকে নেমে এল এক প্রলয়ঙ্কর বন্যা। জলপাইগুড়ি শহরের কাছে একটি বাঁক 'l' থেকে হানাপথ কেটে নিল তিস্তা, ছুটে চলল দূর অতীতে তারই ফেলে আসা একটি দক্ষিণ-পূর্বমুখী পথে। [মানচিত্র দ্রষ্টব্য] নতুন পথটি উপরে পাহাড়ী পথের সঙ্গে অনেকটা সরল থাকায় তিস্তার প্রবল বন্যাগুলি দ্রুত গতিতে ছুটে চলল সেই পথে এবং 3-4 বৎসরের মধ্যে শুরু হল তিস্তার নতুন পথে চলা। এভাবে তিস্তার জলরাশি গঙ্গা-পদ্মায় না এসে ব্রহ্মপুত্র-যমুনায় পতিত হল। পিছনে ফেলে আসা পথের ত্রিধারা,—পুণর্ভবা, আত্রেয়ী আর করতোয়া তিস্তার সঙ্গে সকল সংযোগ হারিয়ে এক একটি নদীরূপে আজও বয়ে চলেছে।

(7) দূর অতীতে ব্রহ্মপুত্র শুধু আসাম উপত্যকার জলরাশি নিয়ে একটি ছোট নদরূপে বয়ে আসত। তারপর কোন ভূকম্পনের ফলে তিব্বত থেকে সাংপো নদ ডিহং-এর পথে ব্রহ্মপুত্রে এসে মিলিত হয়। (1556 সালের এক প্রবল ভূমিকম্পে চীনদেশে 8 লক্ষ 30 হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছিল, সম্ভবত সেই ভূমিকম্পের ফলে সাংপো নদ পথ পরিবর্তিত করে ডিহং নদের সঙ্গে যুক্ত হয়, যে ডিহং ছিল ব্রহ্মপুত্রের একটি উপনদী।) পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে এই নদ

বাংলার সমভূমিতে দক্ষিণ-পশ্চিমবাহিনী হয়ে বর্তমান করতোয়ার পথে বয়ে যেত এবং চলন বিলে সেদিনের গঙ্গায় তার জলরাশি ঢেলে দিত। তারপর পঞ্চদশ ও যোড়শ শতাব্দীতে গঙ্গানদী যখন পূর্ববঙ্গে বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরী দিয়ে প্রবাহিত হত, তখন ব্রহ্মপুত্র নদের দ্বিতীয় একটি শাখা শীতলক্ষ্যার (বা লক্ষ্যার) পথ ধরে ঢাকার কাছে নারায়ণগঞ্জে সেই গঙ্গায় পতিত হত। পরবর্তীকালে ব্রহ্মপুত্র ময়মনসিং শহরের দক্ষিণে শ্রীপুরের কাছ থেকে তৃতীয় একটি দক্ষিণ-পূর্বমুখী পথ কেটে নেয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রধানত সেই পথে দৌলতকান্দির নিকট মেঘনা নদীতে পতিত হয়। [69 পৃষ্ঠায় রেণেলের মানচিত্র দ্রষ্টব্য] 1787 সালের প্রবল বন্যায় তিস্তানদী তার পথ পরিবর্তিত করে বাহাদুরাবাদের কাছে ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হয় আর ঐ সময়ই বাহাদুরাবাদের কাছে ব্রহ্মপুত্র নদের 'm' বাঁক থেকে কয়েকটি ধারা এসে যুক্ত হয় যমুনা নদীতে। তারপর তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্রের প্রবল বন্যাগুলি পথের সরলতার জন্য তাদের পূর্বলব্ধ দক্ষিণমুখী তীব্র গতি নিয়ে ছুটে চলে যমুনানদীর বক্ষ দিয়ে এবং শীর্ণকায়া যমুনানদীর খাত অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে ব্রহ্মপুত্র নদ তার পূর্ব পথকে পরিহার করে ময়মনসিং জেলার পশ্চিম দিক দিয়ে দক্ষিণমুখী পথে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মায় এসে মিলিত হয়। ফলে যে যমুনানদীতে 1787 সালের পূর্বে মাত্র 1 লক্ষ কিউসেক প্রবাহ বয়ে যেত, 37 বৎসর পরে 1824 সালে সেই নদীর বাহাদুরাবাদ থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত 100 মাইল দীর্ঘপথে তিস্তা-ব্রহ্মপুত্রের 20 লক্ষ থেকে 25 লক্ষ কিউসেকের বন্যাগুলি ছুটে চলল। এভাবে তিস্তার সাহায্যে যমুনার মাধ্যমে মিলন ঘটল ভারতের দু'টি বিশাল নদনদীর, ব্রহ্মপুত্র আর পদ্মা।

(8) রেণেলের মানচিত্রে দেখা যায় যে, নিম্নাংশে পদ্মা ও মেঘনা নদী-দু'টি প্রায় সমান্তরাল দক্ষিণমুখী পথে সাগরের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং একটি ছোট নদী কালীগঙ্গা (বা রথখোলা) বিক্রমপুরের কাছে পদ্মা ও মেঘনাকে যুক্ত করেছে। পরবর্তীকালে কালীগঙ্গার উৎসের কিছু উজানে 'j' বাঁক থেকে পদ্মার একটি ছোট হানাপথ গড়ে ওঠে, যেটি কালীগঙ্গার উৎপত্তিস্থল শিবচরের কাছে 'k' অঞ্চলে পতিত হয়। [মানচিত্র দ্রষ্টব্য] পরে পদ্মানদী যখন পূর্বোক্ত নতুন খাদির দিয়ে বইতে থাকে, তখন 'k' থেকে কালীগঙ্গার পথটি ঐ খাদিরের পথের সঙ্গে সরল থাকায় পদ্মার জলধারার পূর্বলব্ধ পূর্বমুখী তীব্র গতি কালী-গঙ্গার পথে ছুটে চলে। অনন্তর 1794 সালের এক প্রবল বন্যায় পদ্মা কালী-গঙ্গার পথ ধরে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের বিখ্যাত মন্দির ও প্রাসাদ এবং পরবর্তীকালে রাজা রাজবল্লভের প্রাসাদ ধ্বংস করে নিজ ললাটে 'কীর্তিনাশা পদ্মা' নাম অংকিত করে। 1794 সাল থেকে 1818 সাল পর্যন্ত মাত্র 25 বৎসরে

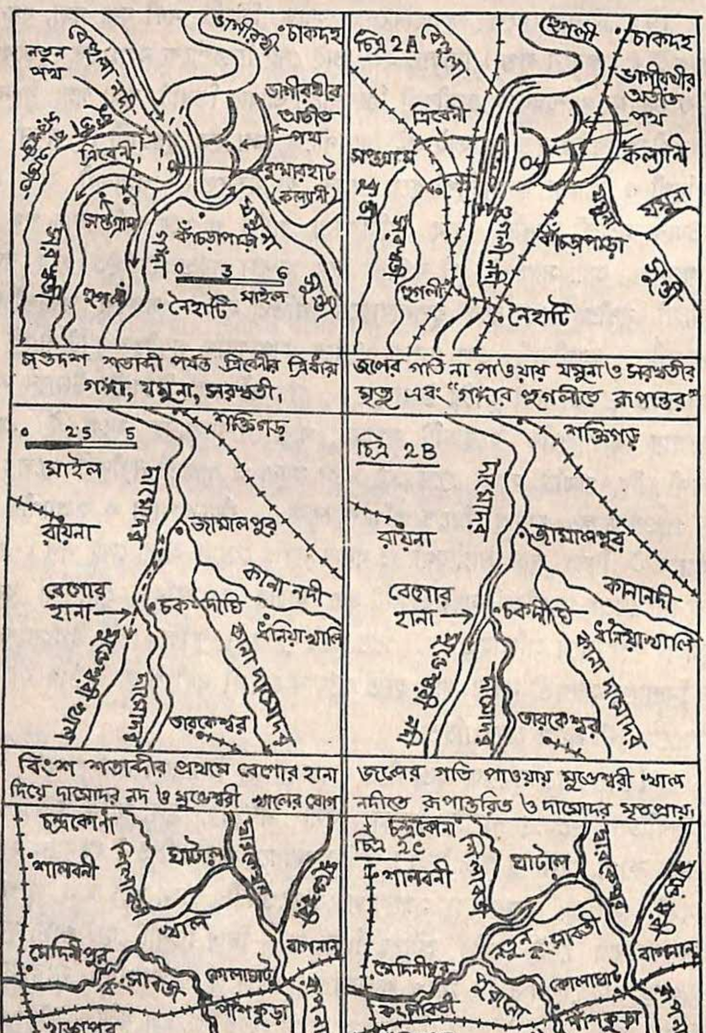
পদ্মার মূল প্রবাহ ঐ কীর্তিনাশা খাতে মেঘনার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে পদ্মা ও মেঘনার মিলনস্থল মেহেন্দীগঞ্জ থেকে 40 মাইল উজানে চাঁদপুরের কাছে এগিয়ে আসে। শিবচর থেকে মেহেন্দীগঞ্জ পর্যন্ত পদ্মার ফেলে আসা পথটি আজ আড়িয়াল খাঁ বা ভুবনেশ্বর খাত নামে অভিহিত হয়।

(9) উত্তরপ্রদেশে এলাহাবাদের কাছে তিনটি নদী যথা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী (বর্তমানে লুপ্ত) মিলিত হত, তাই সেই ত্রিবেণীকে বলা হত যুক্তবেণী। ঠিক তেমনি পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী ত্রিবেণীতে আবার তিনটি ধারা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীতে বিভক্ত হত। তাই এই ত্রিবেণীকে বলা হত মুক্তবেণী। যমুনা নদী পূর্বমুখী ও পরে দক্ষিণপূর্বমুখী হয়ে পড়ত ইছামতীতে। গঙ্গানদী বয়ে চলত বর্তমান হুগলী নদীর পথে কলিকাতা পর্যন্ত ও পরে আদিগঙ্গার পথ ধরে সাগরে। আর সরস্বতী নদী বর্তমান পথে আন্দুল পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে বর্তমান হুগলী নদীর পথ ধরে রূপনারায়ণে পতিত হত। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ত্রিবেণীতে ভাগীরথী তথা গঙ্গার দু'তীরে কাছাকাছি অবস্থিত দু'টি বাঁকই ছিল যমুনা ও সরস্বতী নদী দু'টির উৎসস্থল। পরবর্তীকালে ত্রিবেণীর উজানে নদীয়া জেলায় ভাগীরথীর কয়েকটি সামান্য খাত পরিবর্তনের ফলে ঐ অঞ্চলে ভাগীরথীর পথটি সরল হয়ে ওঠে এবং যমুনা ও সরস্বতী নদীদু'টি জলের গতি না পাওয়ায় দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে। কাঁচড়াপাড়া ও কল্যাণীর কাছে কয়েকটি ঝিল হল ভাগীরথী ও যমুনা নদীর ফেলে আসা সেই পথ। এভাবে ত্রিবেণী থেকে ভাগীরথী নদী একটি মাত্র ধারায় রূপান্তরিত হয়, যা বর্তমানে হুগলী নদী নামে অভিহিত। [চিত্র 2A দ্রষ্টব্য] কলিকাতার উপরাংশে গঙ্গা ও নিম্নাংশে সরস্বতী নদীর খাত হতে বর্তমান হুগলী নদী গড়ে উঠেছে। [দ্বিতীয় অধ্যায়ে 34 পৃষ্ঠায় আলোচিত]

(10) গত কয়েক শতাব্দীতে দামোদর নদ নিম্নাংশে তার পথকে বারবার পরিবর্তিত করেছে—সেই ফেলে আসা পথগুলি হল, খাড়ি, বাঁকা, বেহুলা, কানা, কানা দামোদর ইত্যাদি। [তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত] বর্তমানে হাওড়া ও হুগলী জেলায় দামোদরের জলরাশি যে মুণ্ডেশ্বরীর পথে ছুটে চলে, এ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সেই নদীর অস্তিত্ব ছিল না,—ছিল তিনটি ছোট খাল, মুণ্ডেশ্বরী, হুড়হুড়ে আর বেশোর। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জলসেচের সুবিধার জন্য বেগোর হানা দিয়ে ঐ খালগুলির সঙ্গে দামোদরের সংযোগ ঘটানো হয়। কিন্তু শক্তিগড় থেকে বেগোর হানা পর্যন্ত নদীজলের পূর্বলব্ধ গতি পথের সরলতার জন্য মুণ্ডেশ্বরী খালের পথে ছুটে চলে বলেই আজ দামোদরের শতকরা প্রায় 80 ভাগ জল ঐ পথে রূপনারায়ণে পতিত হচ্ছে। এভবে হুগলী ও হাওড়া

জেলায় দামোদর মৃত নদীতে রূপান্তরিত হচ্ছে আর নতুন করে গড়ে উঠছে মুণ্ডেশ্বরী নদী [চিত্র 2B দ্রষ্টব্য]

(11) বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মেদিনীপুর জেলায় জলসেচের সুবিধার জন্য কংসাবতী থেকে একটি খাল কেটে নাড়াজোলের কাছে শিলাবতীর সঙ্গে



সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ত্রিবেণীর ত্রিধারা গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী.

জলের গতি না পাওয়ায় যমুনা ও সরস্বতীর মৃত্যু এবং "গঙ্গার হুগলীতে রূপান্তর"

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে বেগোর হানা দিয়ে দামোদর নদ ও মুণ্ডেশ্বরী খালের যোগ

জলের গতি পাওয়ায় মুণ্ডেশ্বরী খাল নদীতে রূপান্তরিত ও দামোদর মৃতপ্রায়.

বাঁকের মাধ্যমে জলের গতি পাওয়ায় মেদিনীপুর জেলায় একটি খাল থেকে এই বিংশ শতাব্দীতে জন্ম নিয়েছে 'নতুন কংসাবতী'.

সংযোগ করা হয়। কিন্তু খালের উৎসটি কংসাবতীর পথের একটি বাঁকের কাছে থাকায় ঐ খালটি দ্রুত বড় হয়ে ওঠে এবং একটি নদীতে রূপান্তরিত হয়। তাই আজ কংসাবতীর বেশির ভাগ জল নিম্নাংশে হলদী নদীর পথ পরিহার করে নতুন কংসাবতী ও শিলাবতীর পথ ধরে ঘাটালের কাছে রূপনারায়ণে পতিত হচ্ছে। ফলে পুরানো কংসাবতী ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। [চিত্র 2C দ্রষ্টব্য] এভাবে আমাদের শত বাধা সত্ত্বেও এই বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গে গড়ে উঠছে দু'টি নতুন নদীপথ—মুণ্ডেশ্বরী আর নতুন কংসাবতী।

(12) নদীর ইতিহাসে সবচেয়ে বিস্ময়কর পথ পরিবর্তন ঘটেছে কুশী নদীর, যে নদীটি গত পাঁচশ' বৎসরে পাঁচটি বড় ধরনের পথ পরিবর্তনসহ অন্তত ষোলটি পথ পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রায় 225 মাইল সরে গেছে। [মানচিত্র দ্রষ্টব্য] কুশী নদীর ঐ সব পথ পরিবর্তনের ফলে উত্তর বিহার বারবার প্রলয়ঙ্কর বন্যার কবলে পড়ায় একে বিহারের দুঃখের নদ বলা হয়। মধ্য হিমালয়ে নেপাল ও তিব্বতের প্রায় 6 হাজার বর্গমাইল এলাকার বৃষ্টি ও তুষারগলা জল সান কুশী, অরুণ ও তামুর কুশীর পথ ধরে নেমে আসে সপ্তকুশীতে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই নদী উত্তর বিহারে পূর্ণিয়ার উত্তর দিয়ে বয়ে এসে প্রায় পূর্বমুখী পথে এগিয়ে চলত এবং বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা শহরের প্রায় 15 মাইল উত্তরে চলন বিলে সেদিনের গঙ্গা বা বর্তমান বড়াল নদীতে এসে মিলিত হত। লোহনধারা, মহানন্দা, পুণর্ভবা, আত্রেয়ী (বা সেদিনের তিস্তা) প্রভৃতি উত্তর বিহার ও উত্তরবঙ্গের বহু নদীই ছিল সেই কুশী নদীর উপনদী। দু'শ বৎসর আগেও কুশী নদী দক্ষিণমুখী পথে মণিহারীর কাছে গঙ্গায় পতিত হত আর বর্তমানে সে প্রায় অর্ধ-বৃত্তাকার পথে কমলা নদীর পথ ধরে বয়ে চলেছে কুর্শেলার কাছে গঙ্গায় মিলিত হতে। উত্তর বিহারের অধিকাংশ নদনদীই হল কুশী নদীর ফেলে আসা খাত। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, নদীটি প্রবল বন্যায় কোন একটি বাঁকে হানাপথ কেটেছে এবং তারপর জলের পূর্বলব্ধ প্রচণ্ড গতির সাহায্যে সে নতুন পথে এগিয়ে গেছে।

এই সকল উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, সমভূমি-প্রবাহে নদীতে জলের পূর্বলব্ধ গতি একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে, অর্থাৎ বর্ষাকালে প্রবল বন্যায় নদীর কোন বাঁকে হানাপথ গড়ে ওঠে। উপযুক্ত পরিবেশে সেই হানাপথে জলের পূর্বলব্ধ গতি সঞ্চারিত হয় ও হানাপথটি একটি নতুন নদীতে রূপান্তরিত হয়। আবার কখনও বা মূলনদীপথের একটি বাঁক মিলিয়ে যায় এবং জলের গতি না পাওয়ায় ঐ বাঁক থেকে উৎপন্ন শাখানদীটিও মিলিয়ে যায়। এমনি করেই প্রকৃতিতে চলে নদনদীর জন্মমৃত্যুর নিত্য নতুন খেলা।

নদীপথে পলি ও ভূমির উর্বরতা—নদীপথে জমে যাওয়া পলিই দু'তীর-

ভূমিতে প্লাবন এবং পরবর্তীকালে নদীর পথ পরিবর্তন বা মৃত্যুর জন্য দায়ী। এই পলি প্রধানত পাহাড় থেকে জলস্রোতে বয়ে আসে, কিছু দু'তীরভূমি থেকে ধুয়ে আসে আর জোয়ার-ভাঁটার নদীতে কিছু পলি সাগর থেকে জোয়ার জলে উঠে আসে। নদনদীর অববাহিকায় বনভূমি সৃজন করে ঐ পলি আসার পরিমাণ বহুলাংশে কমানো যায়। নদীখাতে জমা পলি প্রধানত দু'ভাবে আল্‌গা হয়ে যেতে পারে। যেমন বায়ুমণ্ডলে উত্থিত দমকা বাতাস ও ঘূর্ণিঝড় তার চলার পথে সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যায়, সেরূপ নদীখাতে নেমে আসা হঠাৎ বন্যা বা বর্ষার প্রবল স্রোতে সৃষ্ট ঘূর্ণিগুলি নদীর পলিকে তুলে ফেলতে কার্যকর ভূমিকা নেয়। এছাড়া প্রবল বন্যার পর নদীগর্ভে জলের চাপ হ্রাসপ্রাপ্ত হলে নদীগর্ভে সঞ্চিত জল উঠে আসার সময় কিছু পলিও উঠে আসে। তারপর সেই সব পলি প্রধানত দু'ভাবে নদী তার পথ থেকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। একভাগ বর্ষার প্রবল স্রোতে সাগরের পানে ছুটে চলে ও সাগর-মোহানায় নতুন নতুন বদ্বীপ গড়ে তোলে এবং অন্যভাগ প্লাবনের মাধ্যমে দু'তীরভূমিতে বা প্লাবন-ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে তাকে উন্নত, উর্বর ও শস্যশ্যামল করে তোলে। এইভাবেই তো সুনীল সাগর থেকে উঠে এসেছে পৃথিবীর সকল নদীবিধৌত সমভূমিগুলি—যে সমভূমিগুলি আজ পৃথিবীর শতকরা 75 ভাগ মানুষের বাসভূমি, যার উর্বর মাটি থেকে আসে আমাদের খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য সম্পদ। আমাদের কর্তব্য হবে নদীর ঐ সকল স্বাভাবিক কাজে তাকে সাহায্য করা। তবেই নদীর কল্যাণময়ী রূপটি ফুটে উঠবে এবং তার রুদ্রবেশ দূরে সরে যাবে।

নদীপথে বাঁক, সেতু ও ব্যারাজ নামক বন্ধনগুলি জলের গতি স্তিমিত করে নদীর প্রথম কাজে বাধা সৃষ্টি করে। কাজেই নদীকে যথা সম্ভব বাঁক মুক্ত করা দরকার এবং সেতু ও ব্যারাজের গঠন কৌশল এরূপ পরিবর্তিত করা দরকার, যাতে এরা নদীর জলের গতিতে স্বল্পতম বাধা দেয়। এছাড়া নদীর দু'তীরে স্বাভাবিক ও মানুষের দেওয়া সমান্তরাল বাঁধগুলি নদীর দ্বিতীয় কাজে বাধা সৃষ্টি করে। তবে ঐ সমান্তরাল বাঁধগুলির মাঝে মাঝে স্লুইসগেটের সাহায্যে বিভিন্ন সেচখাল পথে সীমিত প্লাবনের মাধ্যমে নদীপথ থেকে পলি আহরণ করে আমাদের জমিগুলি উঁচু ও উর্বর করে তুলতে পারি, অথচ প্রবল বন্যার সময় স্লুইস-গেটগুলি বন্ধ রেখে আমাদের সম্পদগুলি রক্ষা করতে পারি। [জলাধারগুলি থেকে সীমিত প্লাবনের উপযোগী হঠাৎ কৃত্রিম বন্যা সহজেই সৃষ্টি করা সম্ভব।] [তৃতীয় অধ্যায়ে উপসংহার দ্রষ্টব্য] আমরা যদি নদীপথ থেকে ঐভাবে পলি আহরণ না করি, তবে ভবিষ্যতে হয়তো সব নদীই তাদের তীর-ভূমির তুলনায় উঁচু খাতে বয়ে যাবে। ফলে নদীর বাঁধ ভেঙে বর্তমানের মত

শুধু সর্বনাশা প্লাবনই হবে না, জল নির্গমন না হওয়ায় আমাদের বাসভূমিগুলি ভবিষ্যতে হয়তো জলাভূমিতে রূপান্তরিত হবে। এ কথা ঠিক যে, বর্ষার প্রবল স্রোত নদীর পথকে আঁকাবাঁকা করতে চাইবে এবং নদীর দু'তীরভূমি উঁচু হলে ঢালের পরিবর্তন ঘটবে—যা নদীর পথ পরিবর্তনের পরোক্ষ কারণ। কিন্তু আমরা যদি সমান্তরাল বাঁধগুলি সড়কের ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ করি এবং সেচ-খালগুলির সাহায্যে সীমিত প্লাবনের দ্বারা নদীর পলি দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে দিতে পারি, তবে নদীকে একই খাতে বহু শতাব্দী ধরে সাবলীলভাবে প্রবাহিত রাখা সম্ভব হবে।

নদীর প্রাণধারা ও পরিবেশ—যখন গ্রীষ্ম আসে, নদী রূপালী বালুকারাশির নীচে ঘুমিয়ে পড়ে; যেন রূপালী পালঙ্কে ঘুমন্ত কোন রাজকন্যা। আবার যখন বর্ষার বারিধারা মেঘলোক থেকে সঞ্জীবনী সুধার মত ঝরে পড়ে, তখন রূপকথার রাজকন্যার মত তার ঘুম ভাঙে। তারপর হিল্লোলে কল্লোলে দু'কূল মুখরিত করে ছুটে চলে তার দয়িত সুনীল সাগরের পানে। ঐ ভাবে পৃথিবীকে সুন্দর, সজীব ও শস্যশ্যামল করে সাগরের জল ফিরে যায় সাগরে। কাজেই গ্রীষ্মের কোন শীর্ণধারা নয়, বর্ষার প্রবল ধারার গতিই নদীর প্রাণ।

অতএব সেচের জন্য ও সর্ব ঋতুকে পরিবহনের জন্য হিমালয়ের তুষার গলা কিংবা কোন হ্রদ থেকে নেমে আসা জলের একান্ত প্রয়োজন থাকলেও ভাগীরথী তথা কোন নদীকে বাঁচাতে গ্রীষ্মের শীর্ণধারার কোন ভূমিকা নেই। নদীকে বাঁচাতে আমাদের প্রয়োজন বর্ষার লক্ষ লক্ষ কিউসেক জলধারার প্রবাহ, যে জলপ্রবাহ গতিমুখ ও ঢালের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ সরলপথে পরিচালিত হলে নদী তার পথকে গড়ে তুলবে। আবার সেই প্রবাহ ব্যারাজ ও বাঁক নামক বন্ধনে বন্দী হলে নদী দু'কূল ভেঙে বা ছাপিয়ে সর্বনাশা প্লাবন ডেকে আনবে। এছাড়া সীমিত প্লাবনের মাধ্যমে নদীপথ থেকে পলি আহরণ তো বর্ষার জলধারার দ্বারা সম্ভব।

প্রসঙ্গত বলি, ফরাক্কা ও জঙ্গীপুর ব্যারাজ কিংবা প্রস্তাবিত ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজ কি বর্ষাকালে গঙ্গা থেকে লক্ষ লক্ষ কিউসেক জলের প্রবাহকে তার পূর্বলব্ধ গতিসমেত ভাগীরথীর বক্ষে বইয়ে দিতে পারবে? কিংবা সেই জলের দ্রুতগতিকে সর্বত্র নদীখাতমুখী করে নদীকে গড়ে তুলতে পারবে? অথবা ঐ ব্যারাজগুলি কি নদীপথ থেকে পলি আহরণ করে দু'তীরভূমিতে ছড়িয়ে দিতে পারবে? তবে ঐ ব্যারাজগুলি ভাগীরথী-হুগলীকে বাঁচাবে কেমন করে? কাজেই গ্রীষ্মকালে মানুষের দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট সামান্য জলের দাক্ষিণ্যে কোন নদী বাঁচে না। নদী বেঁচে থাকে তার আপন প্রাণধারায় ও পরিবেশে। সে বয়ে চলে আপন মহিমায় ও গরিমায়।

নদীর যখন জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, তখন তার জীবনও আছে। সকল জীবের মত তারও জীবন নির্ভর করে তার প্রাণধারা ও পরিবেশের উপর। নদীর সেই প্রাণধারাটি হল বর্ষায় পাহাড় থেকে নেমে আসা বিপুল জলের প্রবল গতি। আর পরিবেশগুলি হল (1a) কোন একটি নদীর ক্ষেত্রে ঢাল ও গতিমুখের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রায় সরল পথ। (1b) দু'টি ধারায় বিভক্ত নদীগুলির ক্ষেত্রে বাঁকের মাধ্যমে উৎস অঞ্চলে উভয় নদীখাতে জলধারার পূর্বলব্ধ গতির সঞ্চার। (1c) দু'টি ধারায় একত্রিত নদীগুলির ক্ষেত্রে উভয় নদীর পথের সংগে নিম্নাংশের নদীর সামঞ্জস্যপূর্ণ পথ। এছাড়া (2) সীমিত প্লাবনের মাধ্যমে এবং খাঁড়িগুলির ক্ষেত্রে জোয়ারভাঁটার সাহায্যে নদীবক্ষ থেকে তীরভূমিতে পলি আহরণ। [দ্বিতীয় অধ্যায়ে পলির আশীর্বাদ ও তৃতীয় অধ্যায়ে উপসংহার দ্রষ্টব্য] দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচিত উপায়ে এখন আমরা সম্ভবক্ষেত্রে নদীপথকে পরিবর্তিত করতে পারি, কিংবা নদীকে দুটি ধারায় বা বারবার দ্বিধা বিভক্ত করে বহু ধারায় বইয়ে দিতে পারি, এমন কি প্রয়োজনে কোন শাখা-নদীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারি, সেহেতু আমরা নদীকে আমাদের কল্যাণে আরও ভালোভাবে নিয়োজিত করতে পারি। তবে সকল ক্ষেত্রেই নদীর প্রাণ-ধারা ও পরিবেশগুলির কথা আমাদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে। তা না উপলব্ধি করে আমরা যদি যেখানে সেখানে বা কারণে অকারণে নদীপথে বন্ধন (যথা সেতু, জলাধার, ব্যারাজ, সমান্তরাল বাঁধ ইত্যাদি) গড়ে চলি, তবে নদীর পথগুলি দ্রুত ধ্বংস হবে। কিন্তু নদীর চলা তো কখনও থামতে পারে না, তাই তখন সে প্রলয়ঙ্কর রূপ ধরে আমাদের সম্পদগুলি ধ্বংস করে চলবে। সবশেষে বলব, বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সূত্রগুলির সাহায্যে নদীর অতীত ও বর্তমান পথসকল সম্যক্ বিশ্লেষণ করে নদী পরিকল্পনা রচিত হওয়া আবশ্যক। না হ'লে আমরা শত শত কোটি টাকা ব্যয়ে যে পরিকল্পনা রূপায়িত করব, (যেমন ফরাক্কা ব্যারাজ প্রকল্প, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সংযোগ প্রকল্প, গঙ্গা-কাবেরী গ্রাণ্ড ক্যানাল ইত্যাদি), সে উদ্দেশ্য তো সাধিত হবে না, পরন্তু তা হয়তো ভবিষ্যতে কোনদিন সহস্র সহস্র জীবন ও বিপুল সম্পদ ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠতে পারে।*

*সপ্তম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু জ্ঞান ও বিজ্ঞান, শারদীয় 1980 সংখ্যায় প্রকাশিত।

নদীবিজ্ঞানের কথা

অষ্টম অধ্যায়

প্রশ্নোত্তরে নদীর কথা

প্রশ্ন—নদীর উপত্যকায় বন্যা ও প্লাবন বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর—সাধারণত বর্ষাকালে প্রবল বর্ষণের পর যে বিপুল জলরাশি নদীখাত বেয়ে তীব্র গতিতে নেমে আসে, তাকে বলে বন্যা (Discharge) আর ঐ জলরাশি যখন নদীখাতের দু'কূল ছাপিয়ে তীরভূমিতে বা প্লাবনভূমিতে (Flood-plain-এ) ছড়িয়ে পড়ে, তখন তাকে বলে প্লাবন (Flood)। তবে সাধারণভাবে প্লাবনকে অনেক সময় বন্যা বলে অভিহিত করা হয়। বন্যার পরিমাপ করা হয় তার তীব্রতা ও আয়তন দিয়ে। বন্যার তীব্রতা (Flood intensity) বলতে বুঝায় প্রতি সেকেণ্ডে যত ঘন ফুট হারে জল নেমে আসে। এর পরিমাপ করা হয় কিউসেকে। আর বন্যার আয়তন (Flood volume) হল বন্যার কয়েক দিনে বা মাসে মোট যে পরিমাণ জল নদীপথ বেয়ে নেমে আসে। এর পরিমাপ করা হয় একরফুটে।

প্রশ্ন—বিভিন্ন নদীতে বন্যার প্রকৃতি কি একই রকম হয় ?

উত্তর—নদীতে বন্যা সাধারণত দু'ধরণের হয়ে থাকে। দামোদর, কংসাবতী, তিস্তা, মহানন্দা, কুশী প্রভৃতি যে সব নদীর আবহক্ষেত্র কম (কয়েক হাজার বর্গমাইল) এবং পাহাড়ী উপত্যকার ঢাল বেশী, সেই সব নদী-উপত্যকায় প্রবল বর্ষণের পর বৃষ্টির জল হঠাৎ অতি দ্রুত গতিতে নেমে আসে। এদের বন্যার স্থায়িত্ব কয়েকদিন হলেও তীব্রতা অনেক বেশী। আবার গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীর বিশাল অববাহিকার কোন না কোন অংশে বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। ফলে এদের বন্যা সারা বর্ষাকালব্যাপী স্থায়ী হয়,—কখনও বেশী, কখনও কম। যদিও আবহক্ষেত্রের তুলনায় এদের বন্যার তীব্রতা কম, তবু দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ায় বন্যায় নেমে আসা জলের আয়তন বেশী। যেমন দুর্গাপুরে দামোদরের খাতে 7·5 হাজার বর্গমাইল আবহক্ষেত্র থেকে যেখানে সর্বোচ্চ 10 লক্ষ কিউসেকের বন্যা নেমে আসতে পারে, সেখানে ফরাক্কায় প্রায় 3 লক্ষ বর্গমাইল আবহক্ষেত্র থেকে গঙ্গায় সর্বোচ্চ বন্যা নামে 30 লক্ষ কিউসেক। অর্থাৎ দামোদরের থেকে গঙ্গার আবহক্ষেত্র 40 গুণ হলেও গঙ্গার

সর্বোচ্চ বন্যার তীব্রতা দামোদরের চেয়ে মাত্র 3 গুণ। এছাড়া দামোদরের একটি বন্যার স্থায়িত্ব যেখানে মাত্র 3-4 দিন, সেখানে গঙ্গার বন্যার স্থায়িত্ব থাকে বর্ষা-কালের 3-4 মাস ধরে।

প্রশ্ন—প্লাবনকে প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করা যায় ?

উত্তর—নদীর উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন উপত্যকায় এবং সমুদ্রোপকূলে বিভিন্ন ধরণের প্লাবন হয়ে থাকে। কাজেই প্লাবনকে মোটামুটি চারভাগে বিভক্ত করা যায়। (1) নদীর উচ্চ বা পার্বত্য উপত্যকার জল দ্রুত নেমে আসে নদীখাত বেয়ে এবং নদীর দু'তীরভূমি যথেষ্ট উঁচু থাকে। ফলে সেখানে প্লাবন বড় একটা হয় না। কিন্তু অনেক সময় পাহাড়ী ধস নেমে নদীখাত বন্ধ হলে যে বিশাল হ্রদ সৃষ্টি হয়, তার তলে ঘরবাড়ী, গাছপালা সবই ডুবে যায়। তারপর হঠাৎ সেই হ্রদ ভেঙে লক্ষ লক্ষ কিউসেকের বন্যা এসে নদীতীরবর্তী সকল গ্রাম ও শহরকে মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। একে বলা হয় আকস্মিক বন্যা (Flush flood)। 1950 ও 1968 সালে তিস্তানদীতে এ ধরণের বন্যায় 3-4 হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে। বর্তমান যুগে জলাধার ভেঙে বা ব্যারাজ-সংলগ্ন বাঁধ ভেঙে এ ধরনের আকস্মিক প্লাবন হয়ে থাকে। 1978 সালে খয়রাশোলে হিংলোর ছোট একটি জলাধারের ও তিলপাড়ায় ময়ূরাক্ষী ব্যারাজের পার্শ্ব-সংলগ্ন বাঁধ ভেঙে শুধু বীরভূম জেলায় যেখানে 700 লোকের সলিল সমাধি হয়েছিল, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য বারটি জেলায় ঐ প্রলয়ঙ্কর প্লাবনেও জীবনহানি হয়েছিল মাত্র 300 জনের। এতে বোঝা যায়, এই Flush flood কত ভয়ঙ্কর। (2) নদীর মধ্য উপত্যকায় বন্যার প্রবল জলস্রোতে পাড়বাঁধে, বিশেষত বাঁকের কাছে, ভাঙন সৃষ্টি হয়। তারপর বন্যার জল এক বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত করে। কখনও বা ঐ ভাঙনের মধ্য দিয়ে নদী তার লব্ধ গতি নিয়ে একটি হানাপথ কেটে এগিয়ে চলে তার পথের উপর সবকিছু ধ্বংস করে। এমনকি পাকাবাড়ী, রেলপথ, সড়কপথ কিছুই রেহাই পায় না। কখনও কখনও নদী এভাবে তার পথ পরিবর্তিত করে। [ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত] 1978 সালে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন নদীর মধ্য-উপত্যকার প্লাবনে যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, তা অভূতপূর্ব [21 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] গঙ্গা-পদ্মা, দামোদর, কংসাবতী প্রভৃতি সকল নদীই মধ্য-উপত্যকাতে প্রায়শই প্লাবন সৃষ্টি করে থাকে। (3) নদীর নিম্ন উপত্যকায় জলের গতি স্তিমিত হয়ে পড়ে। ফলে এখানে পাড়বাঁধ ভেঙে প্লাবন বেশী না হলেও জলস্ফীতি হয়ে দু'কূল ছাপিয়ে প্লাবন হয় এবং এ প্লাবনে জলস্রোত কম থাকে। নিম্ন-উপত্যকার প্লাবন অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষিজমি ডুবিয়ে ফসলের ক্ষতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সুন্দরবন অঞ্চলের বিদ্যাধরী, মাতলা, ইছামতী, কালিন্দী, মধুমতী প্রভৃতি নদীতে এ ধরণের

প্লাবন হয়। প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে নদী-উপত্যকায় নেমে আসা বিপুল জলরাশি উপরোক্ত তিন ধরণের প্লাবন সৃষ্টি করে থাকে। (4) কিন্তু সমুদ্রোপকূলে সাধারণত যে প্লাবন হয়, তার প্রধান কারণ হল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস (Tidal wave), যা নদীর খাড়ি বা মোহানা থেকে নদীপথ বেয়ে দেশের অভ্যন্তরে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে আসে। সাগর থেকে উত্থিত নিম্নচাপ যখন উপকূল অতিক্রম করে, তখন যে বিরাট ঝড়-ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হয়, তা অনেক সময় সমুদ্রে জলস্ফীতি ঘটিয়ে সমুদ্রোপকূলবর্তী এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্লাবন ও ধ্বংস ডেকে আনে। 1942 সালের আশ্বিনের ঝড়ের সময় মেদিনীপুর, হাওড়া ও চব্বিশ-পরগণা জেলার দক্ষিণাংশে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। 1981 সালের সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে উড়িষ্যার পারাদ্বীপ বন্দরটি প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এছাড়া 1876 সালে আশ্বিনে বঙ্গোপসাগরে যে 30 ফুট উঁচু বিরাট জলোচ্ছ্বাস ঘটে, তাতে খুলনা, বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি জেলায় 4 লক্ষ লোক ডুবে মারা যায় এবং সুন্দরবন এলাকা জনশূন্য হয়ে পড়ে। এতে বোঝা যায় যে, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ধ্বংস ক্ষমতা কী অসাধারণ।

প্রশ্ন—1978 সালে পশ্চিমবঙ্গে শতাব্দীর প্রলয়ঙ্কর প্লাবনের মুখ্য কারণ কী?

উত্তর—উল্লিখিত প্লাবনের মুখ্য কারণ ছিল একটি নিম্নচাপের বিস্ময়কর পথ পরিক্রমার ফলে কয়েকদিনের মধ্যে প্রবলতম বর্ষণ। অবশ্য নানা কারণে নদীখাত মজে জলনিকাশী ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ায়ও এই প্লাবনের অন্যতম কারণ। বঙ্গোপসাগর থেকে উত্থিত ঐ নিম্নচাপটি 21শে সেপ্টেম্বর উড়িষ্যার বালেশ্বরের কাছে উপকূল অতিক্রম করে উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও বিহার ঘুরে 26শে সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। তারপর পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলের কাছে প্রায় স্থায়ী হয়ে 26শে সেপ্টেম্বর থেকে 28 সেপ্টেম্বর তিনদিনে সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে 25 ইঞ্চি থেকে 30 ইঞ্চির মত বৃষ্টি ঝরিয়ে দেয়। এতে ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী, কংসাবতী প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের সকল নদীই একসঙ্গে স্ফীত হয়ে প্রবল প্লাবন সৃষ্টি করে। আবার অন্যদিকে ঐ নিম্নচাপটি উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারে যে বৃষ্টি আগেই ঝরিয়ে দিয়েছিল, তাতে গঙ্গার বুকে 20 লক্ষ কিউসেকের বন্যা নামে এবং একই সময়ে গঙ্গা, ভাগীরথী, জলঙ্গী, চূর্ণী ও ইছামতীর পথে বিপুল পরিমাণ জল নেমে আসে। এভাবে সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ প্রবল প্লাবনের কবলে পড়ে। নিম্নচাপটি এরপর বঙ্গোপসাগরের দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু আরও জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে অপর একটি ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে আবার পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে এগিয়ে যায়। ফলে পূর্ববর্তী প্লাবনের জলরাশি কমার আগেই 4ঠা অক্টোবর থেকে 6ই অক্টোবর

পশ্চিমবঙ্গে প্রবল বর্ষণ হয়। ফলে একদিকে নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়, অন্যদিকে পূর্ব-প্লাবিত এলাকায় জলবৃদ্ধি ঘটে। এভাবে সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের বারটি জেলা 15-20 দিন ধরে 5 ফুট থেকে 10 ফুট জলের তলে ডুবে থাকে। এতে শুধু যে ফসলের ক্ষতি হয় তাই নয়, দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের 2 লক্ষ বাসগৃহ ভেঙে পড়ায় 2 কোটি মানুষকে খোলা আকাশের নীচে নিরন্ন অবস্থায় কাটাতে হয়। নদীর পাড়বাঁধ, রেলপথ, সড়কপথ ভেঙে সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত থাকায় সকল পশ্চিমবঙ্গবাসীকে উদ্বেগের মধ্যে থাকতে হয়।

প্রশ্ন—1978 সালের বন্যায় দামোদর উপত্যকার বন্যানিয়ন্ত্রণে জলাধারগুলি কতটা কার্যকর ছিল ?

উত্তর—আমি পূর্বেই বলেছি, নদীতে বন্যার পরিমাপ করা হয় তীব্রতা আর আয়তন দিয়ে। যেখানে নদীর জলবহন ক্ষমতা (Discharge Capacity) কম, সেখানে বন্যার জল তো সহজে নদীখাত বেয়ে নেমে যাচ্ছে না। কাজেই বন্যার তীব্রতা নয় তার আয়তনের উপর নির্ভর করে প্লাবিত অঞ্চল কতটা হবে এবং ঐ অঞ্চলে জলতল কত উঁচু হবে। কাজেই ডি. ভি. সি থেকে বলা হয় যে, জলাধারগুলিতে সর্বোচ্চ 8·5 লক্ষ কিউসেকের বন্যা এসেছিল, এর সঙ্গে জলাধারগুলির নিম্ন-উপত্যকার 2·5 লক্ষ কিউসেকের বন্যা যুক্ত হয়ে মোট 11 লক্ষ কিউসেকের বন্যা দুর্গাপুরে দামোদরের পথে নামতে পারত। সেই বন্যাকে মাত্র 3·8 লক্ষ কিউসেকে কমিয়ে আনা হয়েছে। অতএব বন্যানিয়ন্ত্রণে জলাধারগুলির ভূমিকা বিরাট। কিন্তু এক্ষেত্রে প্লাবন নির্ভর করছে প্রধানত বন্যার জলের আয়তনের উপর। কাজেই যদি বলা হত যে, যখন দামোদরের পথে প্রায় 50 লক্ষ একরফুট এবং দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী ও কংসাবতীর পথে আরও 10 লক্ষ একরফুট জল নেমে এসে সমগ্র নিম্ন দামোদর উপত্যকাকে প্রবলভাবে প্লাবিত করেছে, তখন মাত্র 10 লক্ষ একরফুট জল জলাধারগুলিতে ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে এবং এরূপ প্লাবনরোধে জলাধারগুলির ক্ষমতা অতি সীমিত, তাহলে ডি. ভি. সি.-র বক্তব্য ও প্লাবিত অঞ্চলের মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকত। এছাড়া দামোদর উপত্যকার কয়লা-সমৃদ্ধ অঞ্চলে প্লাবনের জন্য যে দুর্গাপুর ব্যারাজ দায়ী, তা তো পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। [তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন—জলাধারগুলি বড় ধরণের বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সেটা তো 1978 সালের মহাপ্লাবনে বোঝা গেছে। তবে ছোটখাটো বন্যানিয়ন্ত্রণে জলাধারগুলির ভূমিকা কি ?

উত্তর—দামোদরে বড় ধরণের বন্যা আসে 15-20 বৎসর অন্তর, যেমনটি এসেছিল 1913, 1935, 1943, 1959 ও 1978 সালে। এদের মধ্যবর্তী

সময়ে সাধারণত 2-3 বৎসর অন্তর দামোদরে মাঝারি ধরণের 3-4 লক্ষ কিউসেকের বন্যাগুলি নেমে আসে। ঐসব বন্যাগুলি হয় জলাধারে সম্পূর্ণরূপে আটকে দেওয়া হয়েছে অথবা ওদের তীব্রতাকে 50-60 হাজার কিউসেকে নামিয়ে দামোদরের পথে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঐসব বন্যায় জলের আয়তন ছিল 10 লক্ষ একর-ফুটেরও কম। কাজেই এ ধরণের বন্যা নেমে এলে নিম্ন দামোদর উপত্যকার কিছু অঞ্চল প্লাবিত হত ঠিকই, কিন্তু সে প্লাবন প্রধানত ধানজমি ডুবিয়ে দিত আর সেই প্লাবনের জলও 3-4 দিনের মধ্যে নেমে যেত। আর ধানগাছ 3-4 দিন ডুবে থাকলে কোন ক্ষতি হত না, বরং বন্যার জল ও পলি পেয়ে তারা আরও সবুজ ও সতেজ হয়ে উঠত। কিন্তু ঐসব বন্যাগুলি আটকে দেওয়ার ফলে একটি মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গেছে।

প্রশ্ন—ছোট ও মাঝারি বন্যা জলাধারে আটকে দেওয়ায় কী ধরণের ক্ষতি হয়েছে ?

উত্তর—চল্লিশের দশকে যখন দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা গৃহীত হয় তখন নিম্নাংশে দামোদরের বিভিন্ন খাতের (মুণ্ডেশ্বরী, দামোদর, কানা দামোদর, কানা নদী ইত্যাদি) মোট জলবহন ক্ষমতা (Discharge capacity) ছিল প্রায় 2·5 লক্ষ কিউসেক। অর্থাৎ ঐ সব খাত দিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে 2·5 লক্ষ ঘনফুট জলনিকাশ করা সম্ভব হত। আর সেজন্যই দামোদরের উচ্চ প্রবাহকে জলাধারের সাহায্যে 2·5 লক্ষ কিউসেকে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা গৃহীত হয় প্লাবন-নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু 2-3 বৎসর অন্তর দামোদরে নেমে আসা 3-4 লক্ষ কিউসেকের বন্যাগুলিই ছোটখাটো প্লাবন সৃষ্টি করে দামোদরের বুকে জমা পলি দু'তীরভূমিতে (বা প্লাবনভূমিতে) ছড়িয়ে দিয়ে একদিকে নদীখাতের জলবহন ক্ষমতা বজায় রাখত অন্যদিকে দু'তীর-ভূমিকে উঁচু ও উর্বর করত। ঐ সব বন্যাকে জলাধারে আটকানোর ফলে গত 25-30 বৎসরে মুণ্ডেশ্বরীসহ দামোদরের জলবহন ক্ষমতা কমে মাত্র 60 হাজার কিউসেকে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় সিকি হয়ে গেছে। নদী যদি তার খাতের উপযোগী জলপ্রবাহ না পায়, তবে সে বাঁচবে কেমন করে ? এভাবে জলাধারগুলি দামোদর-মুণ্ডেশ্বরীর মৃত্যু ডেকে এনেছে আর তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ হুগলী মোহনাও দ্রুত মজে গেছে।

প্রশ্ন—দামোদরের জলবহন ক্ষমতা আগের মত 2·5 লক্ষ কিউসেকে রাখা হলে 1978 সালের প্লাবনে কি ধরণের সুবিধা হত ?

উত্তর—1978 সালের বন্যার সময় যখন জলাধারগুলিতে মাত্র 10 লক্ষ একর-ফুট জল ধরে রেখে প্লাবন নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ প্রচেষ্টা চলছিল, তখন সমগ্র

নিম্ন দামোদর উপত্যকা প্রায় 50 লক্ষ একর-ফুট জলের তলে ডুবেছিল। কিন্তু যদি দামোদরের জলবহন ক্ষমতা 2·5 লক্ষ কিউসেকে বজায় রাখা হত, তবে প্রতিদিন নদীপথে 5 লক্ষ একর-ফুট হারে জল নেমে যেত। অর্থাৎ বৃষ্টির 4-5 দিনের মধ্যে 20 লক্ষ থেকে 25 লক্ষ একর-ফুট জল নেমে যাওয়ায় প্লাবিত অঞ্চলে জলের উচ্চতা প্রায় 3 ফুট কম হত। ফলে রেলপথ, সড়কপথ প্রভৃতি ডুবে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হত না এবং লক্ষ লক্ষ বাসগৃহ ধ্বংস হয়ে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে গৃহহারা ও সর্বহারা হতে হত না। এছাড়া 10 দিন পরে অক্টোবরে দ্বিতীয় বন্যা আসার আগেই অধিকাংশ প্লাবিত অঞ্চল জলমুক্ত হত একমাত্র কৃষিজমি ও কয়েকটি নিম্নাঞ্চল ছাড়া, কারণ 10 দিনে নদীখাত দিয়ে 50 লক্ষ একর-ফুট জল নিকাশ করা সম্ভব হত। কাজেই জলাধার নির্মাণ নয়, নদীকে সজীব ও জীবন্ত রাখাই প্লাবন নিয়ন্ত্রণের শ্রেষ্ঠ পন্থা।

প্রশ্ন—নদীখাতের উৎকর্ষের জন্য জলাধার থেকে স্বাভাবিক ও কৃত্রিম বন্যা ছেড়ে দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু জলাধারের জল ছেড়ে দিলে সেচের জল দেওয়া হবে কিভাবে?

উত্তর—আমরা যে জলাধারগুলি নির্মাণ করেছি, তাতে নদী উপত্যকা দিয়ে জলাধারে নেমে আসা সারা বৎসরের জল ধরে রাখা যায় না। যেমন দামোদর, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী প্রভৃতি নদীগুলির পার্বত্য উপত্যকায় বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় 50 ইঞ্চি—যে বৃষ্টিজলের শতকরা 60 ভাগ জলাধারগুলিতে নেমে আসে। অতএব দামোদর, ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতীর জলাধারগুলির আবহক্ষেত্র যথাক্রমে 6600, 720 ও 1400 বর্গমাইল হওয়ায় ওদের জলাধারগুলিতে নেমে আসা জলের পরিমাণ যথাক্রমে 105 লক্ষ, 11·5 লক্ষ ও 22·4 লক্ষ একরফুট আর জলাধারগুলিতে ধরে রাখা জলের সর্বোচ্চ পরিমাণ হল যথাক্রমে 22 লক্ষ, 5 লক্ষ ও 8 লক্ষ একরফুট মাত্র। কাজেই জলাধারে নেমে আসা জলের বেশীর ভাগ বর্ষাকালেই নদীখাতে ছেড়ে দিতে হয়, যা খরিফ মরশুমে বা বর্ষাকালে আমনচাষের জন্য ব্যবহৃত হয়। ঐ বাড়তি জল সাধারণত ধীরে ধীরে ছেড়ে দেওয়া হয় নদীখাতে। কিন্তু ঐ সব নদী উপত্যকায় খরার বৎসরগুলি ছাড়া আমনচাষে জলের বড় একটা প্রয়োজন হয় না এবং খরিফ মরশুমে ঐ সেচের জল অপচয় ছাড়া কিছুই নয়। কাজেই সুবৃষ্টির বৎসরগুলিতে যখন আকাশ পরিষ্কার থাকবে, তখন নিম্ন-উপত্যকায় অধিবাসীদের সতর্ক করে ঐ বাড়তি জল স্বচ্ছন্দে 1টি বা 2টি বন্যার আকারে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে, যাতে নদীখাত থেকে পলি এসে একদিকে জমিকে উঁচু ও উর্বর করবে, অন্যদিকে নদীকে গভীর রাখতে সাহায্য

করবে। মনে রাখা দরকার, এভাবে সীমিত প্লাবনের আশীর্বাদকে গ্রহণ করে নদীকে জীবন্ত রাখাই প্রলয়ঙ্কর প্লাবন-নিয়ন্ত্রণের শ্রেষ্ঠ পথ। [90 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন—মানুষ যে নদীর চর ঘিরে চাষবাস করছে, ঘরবাড়ি এমন কি কল-কারখানা গড়ে তুলছে, নদীখাত মজে যাওয়ার জন্য সেগুলি কি দায়ী নয় ?

উত্তর—নদীর বুকে জলাধার, ব্যারাজ, সেতু প্রভৃতি যে কোন বন্ধন গড়ে তোলা অত্যন্ত দুঃসাধ্য কাজ। আসলে জলাধারে জল ধরে রাখায় দামোদর, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী প্রভৃতি নদী মজে গেছে আর প্রাকৃতিক কারণে [সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত] ভাগীরথী, জলঙ্গী, চূর্ণী, বিদ্যাধরী প্রভৃতি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে বলেই মানুষের পক্ষে ঐ সব কাজ করা সম্ভব হয়েছে, নইলে সাধারণ মানুষের সাধ্য কি সজীব ও প্রাণবন্ত নদীর চরে ঘরবাড়ি বানায় ?

প্রশ্ন—সাগর থেকে উঠে আসা জোয়ারের জল বন্যার জলরাশিকে নেমে যেতে বাধা দেয়। কাজেই জোয়ারের জল আটকানোর জন্য হুগলী নদীতে একটি ব্যারাজ গড়লে কেমন হয় ?

উত্তর—সাগর থেকে উঠে আসা জোয়ারের জল বন্যার জলরাশিকে নেমে যেতে বাধা দেয় সত্য ; কিন্তু 1978 সালের প্রবল প্লাবনের সময় দেখা গেছে যে, জোয়ারের সময় বন্যার জলের গতি কমে যাওয়ায় জলস্ফীতি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ঐ সময়ে নদীতে জলের গতি সাগর অভিমুখে ছিল। অর্থাৎ কোন ব্যারাজ দ্বারা জোয়ারের জল আটকালে দেখা যাবে যে ব্যারাজের নিম্নাংশে জোয়ারের জল যত না উঁচু হয়েছে, নদীখাতে প্লাবিত অঞ্চল থেকে নেমে আসা জলে ব্যারাজের উর্ধাংশে জলতল তার চেয়ে অধিক উঁচু হবে। ফলে প্লাবন প্রবলতর হবে।

প্রশ্ন—হুগলী নদী মজে যাওয়ার অন্যতম কারণ জোয়ারের জলস্রোতে সাগর থেকে উঠে আসা পলি। ঐ পলি আটকানোর জন্যে হুগলী নদীতে একটি ব্যারাজ নির্মাণ করা যেতে পারে কি ?

উত্তর—যদি জোয়ারের ফলে সাগর থেকে উঠে আসা পলি নদীর মৃত্যুর কারণ হয়, তবে ভাগীরথী-হুগলীসহ গঙ্গার অসংখ্য শাখানদীগুলি জোয়ার-ভাঁটা থাকা সত্ত্বেও অতীতে যুগ যুগ ধরে সাবলীলভাবে বয়ে যেত কিভাবে ? আর হুগলী নদীতে জোয়ার-ভাঁটার খেলা চলে নবদ্বীপ পর্যন্ত, কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাগীরথী, জলঙ্গী, মাথাভাঙা, ভৈরব প্রভৃতি নদীগুলি দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে কেন ? আসলে পলি তো পাহাড় থেকে বিপুল পরিমাণে বয়ে আসে জলস্রোতে, কিছু দু'তীরভূমি থেকে ধুয়ে আসে আর কিছু হয়তো সাগর থেকে উঠে আসে। কিন্তু ঐ ব্যারাজ

বর্ষাকালে নেমে আসা পলি সরিয়ে দেবে কেমন করে ? পরন্তু ব্যারাজের জন্য জলের গতি স্তিমিত হওয়ায় পলি দ্রুত ঝরে পড়ে হুগলী নদীর মৃত্যু ত্বরান্বিত হবে।

প্রশ্ন—এমন জলাধার কি করা যায় না যাতে নদীখাতে নেমে আসা সারা বৎসরের জল সম্পূর্ণভাবে আটকে দেওয়া যায় ?

উত্তর—প্রযুক্তিগত দিক থেকে এরূপ জলাধার করা সম্ভব হলেও আমাদের এই ঘনবসতিপূর্ণ দেশে জলাধারের জন্য যে বিশাল এলাকা নিমজ্জিত করা দরকার হবে, তা পাওয়া দুঃসাধ্য। মিশরে নীলনদে আসোয়ান বাঁধের জলধারণ ক্ষমতা হল 10 কোটি 60 লক্ষ একরফুট। অথচ নীলনদের বাৎসরিক গড় জলপ্রবাহ হল 7 কোটি 50 লক্ষ একরফুট অর্থাৎ নীলনদের সারা বৎসরের জলরাশি সম্পূর্ণরূপে আটকে দেওয়া হয়েছে আসোয়ান বাঁধে। এতে কিন্তু নিম্ন-উপত্যকায় পরিবেশগত সমস্যা দেখা দিয়েছে। সবচেয়ে মজার কথা, বছর সাতেক আগে নীলনদের উপত্যকা প্রবল প্লাবনের কবলে পড়েছিল। কারণ আর কিছুই নয়,—বৎসরের পর বৎসর বন্যার জল সম্পূর্ণ ধরে রাখায় নিম্নাংশে নীলনদ দ্রুত মজে গেছে। এদিকে ঐ বৎসর নিম্ন-উপত্যকায় অর্থাৎ আসোয়ান বাঁধের নিম্নাংশে হয়েছে প্রবল বর্ষণ। নিম্ন উপত্যকার জল ধরে রাখার ক্ষমতা নেই জলাধারের আর নীলনদও জলনিকাশ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। কাজেই দেশ প্রবল প্লাবনের কবলে পড়েছে। এছাড়া চীনদেশে নদনদীর বুকে অসংখ্য জলাধার সৃষ্টি করে মানুষ ভেবেছিল যে, তারা বন্যার কবল থেকে চিরতরে মুক্ত হবে। কিন্তু না, 1981 সালের ইংয়াসি নদীর বন্যায় 2 কোটি মানুষ গৃহহীন হয়েছে আর কয়েক হাজার মানুষ জলস্রোতে ভেসে গিয়েছে। প্রসঙ্গত বলি, জলাধারের পরিবর্তে নদীকে উপযুক্তভাবে সংস্কার করলে নদী-উপত্যকার সকল অংশের বন্যাকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

প্রশ্ন—নদীখাত ধ্বংস করা ছাড়া জলাধার ও ব্যারাজ আর কি ধরণের ক্ষতি করে থাকে ?

উত্তর—অনেক সময় জলাধার কিংবা ব্যারাজ-সংলগ্ন বাঁধ ভেঙে ভয়ঙ্কর Flush Flood হয়। তখন জলাধারে সঞ্চিত বিপুল জলরাশি হঠাৎ দ্রুতবেগে নেমে এসে গ্রাম-শহর সবই নিশ্চিহ্ন করে দেয়। একে বলে Dam Failure, আবার কখনও ব্যারাজ-পণ্ডে জমা পলির জন্য ব্যারাজের উর্ধাংশে নদীখাত উঁচু থাকায় ব্যারাজ-সংলগ্ন পাড় বাঁধ (Afflux Bund) ভাঙলে নদীর জল ব্যারাজ পথে না এসে পার্শ্ব বাঁধে ক্ষয় সৃষ্টি করে দ্বিতীয় নদীরূপে এগিয়ে চলে। 1978 সালের বন্যার সময় খয়রাশোলে হিংলো জলাধার,

তিলপাড়ায় ময়ূরাক্ষী ব্যারাজ ও দামোদরের দুর্গাপুর ব্যারাজে এরূপ ঘটনা ঘটেছিল তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

প্রশ্ন—এ ধরণের Dam Failure-এর ঘটনা কি শুধু পশ্চিমবঙ্গে ঘটেছিল ?

উত্তর—পৃথিবীর সব দেশে Dam Failure প্রায়ই ঘটে থাকে এবং এ পর্যন্ত প্রায় 350টি এরূপ ঘটনার কথা জানা যায়। ভারতেই এ পর্যন্ত 25টির অধিক বড় ও মাঝারি জলাধার ভেঙে পড়েছে, যাদের কয়েকটিতে দেশের বিপুল ক্ষতি হয়েছে। হঠাৎ নেমে আসা জলস্রোতে বহু গ্রাম ও শহর নিশ্চিহ্ন হয়েছে, সড়ক ও রেলপথ ভেঙে গেছে এবং বহু মানুষ ভেসে গেছে। Dam Failure-এর ঘটনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—উত্তরপ্রদেশে গোহ্না লেক ও নানকসাগর ; মধ্যপ্রদেশে স্বপ্না, কুয়ারপুরা, দুধবা ও চাপ্রি ; গুজরাটে মাচ্চু, খামবালা ও শেক্রোঞ্জি এবং মহারাষ্ট্রে পানশেট, তুলসী ও খাডাক্ভাস্লা। 1961 সালের 12ই জুলাই মহারাষ্ট্রে পুনার অদূরে পানসেট জলাধার ভেঙে যে প্রবল বন্যা নামে, তাতে পুনা শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। কয়েক হাজার মানুষ ভেসে যায় এবং 1 লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়। সাত-আট বৎসর আগে মহারাষ্ট্রে কয়না জলাধারের চাপে ভূ-নিম্নে শিলাস্তরের পরিবর্তন হওয়ায় যে ভূমিকম্প হয়, তাতে বহু মানুষ মারা যায় ও বিপুল সম্পত্তির ক্ষতি হয়।

1967 সালে উত্তরপ্রদেশে নানকসাগর জলাধার ভেঙে পড়ায় যে বিরাট বিপর্যয় ঘটে তা অবর্ণনীয়। 1978 সালে পশ্চিমবঙ্গে উপরোক্ত ঘটনাগুলি ছাড়া উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানায় কয়েকটি জলাধার ভেঙে পড়ায় কয়েক হাজার মানুষ জলস্রোতে ভেসে যায়। 1979 সালে গুজরাটে মাচ্চুর একটি মাঝারি ধরণের জলাধার থেকে ছাড়া পাওয়া বিপুল জলরাশি এক সূর্যালোকিত দিনে হঠাৎ মোরভি নামে একটি শহরের উপর দিয়ে বয়ে যায়। [মোরভি শহরটি এত সুন্দর যে, একে ভারতের প্যারিস বলা হয়।] 10-15 ফুট উঁচু হয়ে আসা বিপুল জলস্রোতে 7-8 হাজার মানুষ সঙ্গে সঙ্গে ভেসে যায়। 2-3 ফুট পলি ও কাদার উপর ছড়ানো অসংখ্য মৃতদেহে সুন্দর শহরটি একটি নরকে রূপান্তরিত হয়। 1980 সালে আগষ্ট মাসের 5-6 দিনের বর্ষণে গুজরাটের সমস্ত শুষ্ক জলাধার পরিপূর্ণ হয়ে উপচে যায় এবং খামবালা, সত্তপুর ও সায়না বাঁধের ক্ষতি হয়। 1981 সালে কর্ণাটকে 3টি জলাধার ভেঙে পড়ায় কয়েকটি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয় এবং দক্ষিণ ভারতে রেলপথ ও সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। ঐ বৎসর আগষ্টে জব্বলপুরের কাছে বাগরী জলাধারে ফাটল হওয়ায় নর্মদা নদীতে প্রবল বন্যা

নামে। 1983 সালে জুলাই-এ গুজরাটে প্রবল বর্ষণে 30টি জলাধার উপচে পড়ে। এছাড়া শেত্রুঞ্জি ও অন্য দু'টি জলাধারের ফাটলপথে হঠাং নেমে আসা জলরাশি বৃষ্টির জলের সংগে যুক্ত হয়ে এক বিশাল এলাকাকে প্লাবিত করে এবং প্রায় 2 হাজার লোকের মৃত্যু হয়। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বরে ভূটানে একটি জলাধার ভেঙে পড়ায় আসামের সংগে অবশিষ্ট ভারতের সড়ক ও রেলপথে যোগাযোগ এক সপ্তাহের জন্য বিচ্ছিন্ন থাকে।

প্রশ্ন—জলাধার বা ব্যারাজের পার্শ্ব-সংলগ্ন বাঁধ ভেঙে যাতে বিপর্যয় ডেকে না আনে, সেজন্য কি ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে ?

উত্তর—সাধারণভাবে জলাধারের জলনিগর্মন দ্বারের (Spillway) কাছের অংশ কংক্রীট দিয়ে নির্মিত হলেও নদীবাঁধের (Dam-এর) অন্য অংশ থাকে মাটির (বা পাথরের) তৈরী। ঐ মাটির বাঁধ খুব মজবুত হওয়া দরকার; যাতে কোন ফাটল না ধরে। ঐ মাটির বাঁধে গাছপালা লাগানো দরকার এবং শক্ত হওয়ার জন্য 5-6 বৎসর সময় দেওয়া উচিত। এছাড়া মাটির তৈরী বাঁধ সর্বত্র জলাধারের কংক্রীট বাঁধের চেয়ে 8-10 ফুট উঁচু থাকা আবশ্যক, যাতে জলাধারের সমস্ত গেট খোলা থাকা সত্ত্বেও জলাধারের জলতল হঠাং বৃদ্ধি পেলে সেই জল কংক্রীট বাঁধের উপর দিয়ে জলপ্রপাতের মত ঝরে পড়বে; কিন্তু কোথাও মাটির বাঁধ একটুও ডুববে না। কারণ মাটির বাঁধের উপর দিয়ে জল উপচে পড়লে সে বাঁধ দ্রুত ক্ষয় পাবে এবং জলাধারের সঞ্চিত জল একসঙ্গে বিপুল বেগে ছুটে এসে নিম্ন-উপত্যকাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ব্যারাজের ক্ষেত্রে তার গঠন-কৌশলের পরিবর্তন করা একান্ত দরকার। ব্যারাজের কংক্রীট ভিতটি নদীতে একই তলে না রেখে নদীগর্ভের (River-bed-এর) অনুরূপে গড়তে হবে, যাতে ব্যারাজটি নদীর জলপ্রবাহে একটি সাধারণ সেতুর চেয়ে বেশী বাধা সৃষ্টি না করে। [পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত] এছাড়া যে সকল ব্যারাজ নির্মিত হয়েছে, তাদের ব্যারাজ-পণ্ডে জমা পলি প্রতি বৎসর সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রশ্ন—পৃথিবীর সব দেশে হাজার হাজার জলাধার ও ব্যারাজ নির্মিত হয়েছে, তারা কি নদীখাতের ক্ষতি করছে না ?

উত্তর—নদীর উপর যে কোন ধরণের বাধা, তা সেতু, ব্যারাজ, জলাধার এমনকি সমান্তরাল পাড় বাঁধ হোক না কেন, তা অবশ্যই নদীর পক্ষে ক্ষতিকারক। কিন্তু ঐ ক্ষতির পরিমাণ কিরূপ হবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে ঐ নদীতে নেমে আসা পলির পরিমাণের উপর। আবার সেই পলির পরিমাণ প্রধানত নির্ভর করে থাকে, নদী যে পার্বত্য উপত্যকা থেকে নেমে আসছে তার শিলার গঠন এবং নদীর আবহক্ষেত্রে বৃষ্টিপাতের ধরণের উপর। পৃথিবীর

অধিকাংশ পর্বতমালা গ্রানাইট, ব্যাসল্ট প্রভৃতি আগ্নেয়শিলা দ্বারা গঠিত। এ সমস্ত আগ্নেয়শিলা অত্যন্ত কঠিন হওয়ায় এদের ক্ষয় খুবই কম। এশিয়ার হিমালয়, আফ্রিকার আটলাস আর ইউরোপের আল্পস্ পর্বতমালা হল ভাঁজ পর্বতমালা, যারা বেলেপাথর, কাদাপাথর প্রভৃতি নরম পাললিক শিলার দ্বারা গঠিত। এইসব পাললিক শিলা অত্যন্ত ক্ষয়প্রবণ হওয়ায় ঐ তিনটি পর্বতমালা থেকে নেমে আসা নদ-নদীগুলিতে পলির পরিমাণ হয় বেশী, অন্যদিকে আগ্নেয়-শিলায় গঠিত অন্য সব পর্বতমালা থেকে বয়ে আসা নদনদীতে পলির পরিমাণ খুবই কম।

প্রশ্ন—আল্পস্, আটলাস ও হিমালয় পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন নদনদীর অববাহিকায় ভূমিক্ষয় কিরূপ ?

উত্তর—ইউরোপের আল্পস্ পর্বতমালা শীতল অঞ্চলে অবস্থিত থাকায় সেখানে অধিকাংশ সময়ই বৃষ্টির পরিবর্তে ঝরে পড়ে তুষারকণা আর সেই তুষারের স্তরে ঢাকা পার্বত্য-উপত্যকায় ভূমিক্ষয় হয় কম। আবার আফ্রিকার আটলাস পর্বতমালার উত্তরে আছে ভূমধ্যসাগর ও দক্ষিণে সাহারা মরুভূমি। এখানে বৃষ্টিপাতও খুব কম। কাজেই কোন বড় নদীই ঐ পর্বতমালা থেকে নেমে আসেনি। অন্যদিকে হিমালয় পর্বতমালা অববাহিকায় পশ্চিমে আরব সাগর, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও পূর্বে চীন সাগর থেকে উৎপন্ন মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রবল মুষলধারে বর্ষণ হয়। এজন্য হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদনদীতে নেমে আসে বিপুল পরিমাণ পলি।

হিমালয় পর্বতমালা উত্তরে লরেসিয়া ও দক্ষিণে গণ্ডোয়ানা নামে দু'টি প্রাচীন মহাদেশের মধ্যবর্তী টেথিস সাগর থেকে উঠে এসেছে ভূ-আন্দোলনের ফলে মাত্র কয়েক কোটি বৎসর আগে। এই হিমালয় পর্বতমালা প্রধানত প্রায় সমান্তরাল চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত। দক্ষিণ থেকে উত্তরে ঐ পর্বতশ্রেণীগুলি হল ;—(1) অবহিমালয় (Sub-Himalaya), (2) হিমাচল (Lesser Himalaya), ( ) হিমগিরি (Great Himalaya) এবং (4) বহি-হিমালয় (Trans-Himalaya)। এদের মধ্যে হিমগিরি পর্বতশ্রেণী হল সর্বোচ্চ। হিমগিরির দক্ষিণে হিমাচল ও অবহিমালয় থেকে উৎপন্ন নদীগুলি প্রধানত ভারত, পাকিস্থান, বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত। আর বহি-হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদীগুলি প্রধানত তিব্বত ও চীনদেশের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে চীন সাগরে। এই পর্বতশ্রেণীগুলির মধ্যে অবহিমালয় সবচেয়ে নবীন (মাত্র 70 লক্ষ বৎসর আগে এর উৎপত্তি) এবং নুড়ি, কাদা ও বেলেমাটিতে গঠিত হওয়ায় ক্ষয়প্রবণ ও ভঙ্গুর। গাঙ্গেয় সমভূমির উত্তরে রয়েছে অবহিমালয় আর দক্ষিণে আছে অতি প্রাচীন আগ্নেয়-

শিলা দ্বারা গঠিত বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণী ও ছোটনাগপুরের মালভূমি। অর্থাৎ গঙ্গা বয়ে চলেছে অত্যন্ত ক্ষয়প্রবণ দু'টি পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়ে। আবার ঐ গাঙ্গেয় অববাহিকাতেই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রভাবে আনীত নিম্নচাপগুলি কয়েকদিনের মধ্যে যে বিপুল পরিমাণ বৃষ্টি (কয়েক কোটি একর-ফুট) ঝরিয়ে দেয়, তা কল্পানাতীত। একারণে গাঙ্গেয় উপত্যকায় শিলার ক্ষয় এবং প্রতি ঘনফুট গঙ্গাজলে বয়ে আসা পলির পরিমাণ পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ। হিমালয় থেকে উৎপন্ন অন্য নদীগুলিতে, যথা সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, মেকং, সিকিয়াং, ইয়াং সিকিয়াং, হোয়াংহো প্রভৃতির অববাহিকায় ভূমিক্ষয় অপেক্ষাকৃত কম।

প্রশ্ন—অন্যান্য নদনদীর তুলনায় গাঙ্গেয় অববাহিকার ভূমিক্ষয় কতটা বেশী ?

উত্তর—একটি হিসাবে দেখা যায়, উত্তর আমেরিকার মিসিসিপি নদীর পার্বত্য উপত্যকায় এক ফুট আগ্নেয়শিলার ক্ষয় হ'তে যেখানে 6000 বৎসর সময় লাগে, সেখানে আফ্রিকার নীল নদের, চীনের হোয়াংহো বা পীত নদীর ও ভারতের গঙ্গা নদীর পার্বত্য-উপত্যকায় এক ফুট ভূমিক্ষয়ের জন্য সময় লাগে যথাক্রমে 3000 বৎসর, 1500 বৎসর ও 750 বৎসর। অর্থাৎ গঙ্গার পার্বত্য উপত্যকার প্রতি বর্গমাইল আবহক্ষেত্র থেকে আনীত পলির পরিমাণ মিসিসিপির তুলনায় 8 গুণ, নীলনদের তুলনায় 4 গুণ আর হোয়াংহোর তুলনায় 2 গুণ। এজন্য গঙ্গার জলে পলির পরিমাণ গড়ে তিন হাজার ভাগের একভাগ এবং বর্ষাকালে বন্যার সময় তা এক হাজার ভাগের একভাগে পরিণত হয়। গঙ্গা তার পার্বত্য-উপত্যকা থেকে প্রতি বৎসর গড়ে 640 কোটি ঘনফুট বা 40 কোটি টন পলি বহন করে আনে। তাইতো গঙ্গা পৃথিবীর নবীনতম নদী হওয়া সত্ত্বেও সে শুধু উত্তরপ্রদেশে ও বিহারে অবস্থিত প্রাচীন টেথিস সাগরের অবশেষটুকুই ভরাট করেনি, বাংলার সমভূমিতে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ অঞ্চল গড়ে তুলেছে। একারণে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের গাঙ্গেয় সমভূমিতে আগ্নেয় শিলার স্তর 2-3 হাজার ফুট এবং ব-দ্বীপ অঞ্চলে 5-6 হাজার ফুট পলির স্তরে ঢাকা পড়ে গেছে। রামায়ণ-মহাভারতে বর্ণিত 3-4 হাজার বৎসর আগের অযোধ্যা, মিথিলা, ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনাপুর, দ্বারকা প্রভৃতি ঐশ্বর্যময় নগরগুলি আজ পলিমাটির নীচে হারিয়ে গেছে। এমনকি ঐতিহাসিক কালের মগধ, পাটলিপুত্র, নালন্দা প্রভৃতি আজ মাটির তলায়। 5-6 হাজার বৎসর আগে সিন্ধুনদের উপত্যকাতেও প্রবল বৃষ্টি হত। তাইতো হরপ্পা, মহেঞ্জোদারোর সিন্ধু-সভ্যতার নগরীগুলি বারবার পলির নীচে চাপা পড়েছিল আবার নতুন করে গড়ে উঠেছিল। সিন্ধু-সভ্যতার মানুষেরা উপর্যুপরি

সাতটি নগরী গড়ে তুলেছিল, তবুও তারা সিন্ধুনদের পলিমাটির নীচে আজ এক বিস্মৃত ইতিহাস হয়ে আছে।

প্রশ্ন—ভূমিক্ষয়ের ফলে কি পরিমাণ পলি বিভিন্ন জলাধারে নেমে আসছে?

উত্তর—ভূমিক্ষয়ের ফলে ভারতের বিভিন্ন জলাধারে যে পরিমাণ পলি আসবে বলে বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেছিলেন, বাস্তব ক্ষেত্রে তার তুলনায় 2-3 গুণ, কোন কোন ক্ষেত্রে 7-8 গুণ পলি এসে জলাধারগুলিতে জমা হচ্ছে। এছাড়া পার্বত্য অঞ্চলে অরণ্যের বৃক্ষছেদনের ফলে সেই ভূমিক্ষয় ও পলি আসার বাৎসরিক পরিমাণ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। 1972 সালের সেচ কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারতের কয়েকটি জলাধারে পলি জমার বাৎসরিক প্রকৃত পরিমাণ ও বন্ধনীতে অনুমিত পরিমাণ একরফুটে দেওয়া হল—মাইথন 5,980 (684), পাঞ্চেত 9,533 (1,982), ময়ূরাক্ষী 2,000 (538), ভাক্রা 33,475 (23,000), রামগঙ্গা 4,376 (1,089), তুঙ্গভদ্রা 41,058 (9,796), উকাই 21,758 (7,448) ও নিজামসাগর 8,725 (530)।

জলাধারগুলিতে অনুমিত পরিমাণের চেয়ে বহুগুণ বেশী পলি আসায় ভবিষ্যতে জলাধারগুলি থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ সেচের জল দেওয়া সম্ভব হবে না অর্থাৎ তাদের সেচসেবিত এলাকা দ্রুত কমে যাবে এবং একসময় তাদের আয়ুও শেষ হয়ে যাবে। ভারতের বিভিন্ন সেচপ্রকল্পের প্রকৃত পলি জমার ভিত্তিতে বর্তমান আয়ু এবং বন্ধনীতে জলাধার নির্মাণকালে অনুমিত আয়ু বৎসরের হিসাবে দেওয়া হল—মাইথন 153 (212), পাঞ্চেত 138 (216) ময়ূরাক্ষী 200 (872), ভাকরা 291 (40), হীরাকুঁদ 147 (386), গান্ধীসাগর 350 (930) ও তুঙ্গভদ্রা 245 (311); অর্থাৎ জলাধারগুলি নির্মাণকালে পার্বত্য-উপত্যকার ভূমিক্ষয়ের বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করা হয়নি।

প্রশ্ন—ভূমিক্ষয় ছাড়া নদী-উপত্যকার আর কি কি বৈশিষ্ট্য জলাধার ও ব্যারাজ নির্মাণকালে বিবেচিত হওয়া উচিত?

উত্তর—হিমালয় পর্বতমালায় ভাঙাগড়ার খেলা এখনও চলছে। এজন্য ভূমিকম্প ও ধস এখানকার নিত্য ঘটনা। 1556 সালে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে চীনদেশের সেনসাই-তে 8 লক্ষ 30 হাজার লোকের মৃত্যু হয়। 1762 ও 1897 সালের দুটি ভূমিকম্পে উত্তর বিহারে বহু লোক মারা যায়, এমন কি কয়েকটি নদী পথ পরিবর্তিত করে। 1934 সালে নেপাল অঞ্চলে ভূমিকম্প ও ধসের ফলে 10 হাজার মানুষ মারা যায়। হিমালয়ের মত ভঙ্গিল

পর্বতমালায় জলাধারের প্রবল চাপে শিলার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে ভবিষ্যতে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হতে পারে, যেমনটি হয়েছিল মহারাষ্ট্রের কয়না নদী-উপত্যকায়।

এছাড়া হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে প্রায়ই ধস নেমে যাতায়াতের পথ বন্ধ হয়ে যায়, কখনও বা পাহাড়ের কোলে গড়ে তোলা গ্রাম ও শহর নিশ্চিহ্ন হয়। কখনও কখনও ঐ ধসের ফলে নদীখাত বন্ধ হয়ে সাময়িক-ভাবে গড়ে ওঠে একটি হ্রদ. যা পরবর্তীকালে ভেঙে আকস্মিক বন্যা (Flush Flood) সৃষ্টি করে। 1841 সালে হিমালয়ের নন্দা পর্বতের পশ্চিমদিক থেকে বিশালাকার শিলাখণ্ড সিন্ধুনদের উপর এসে পড়ে এবং সিন্ধুনদের বুকে 40 মাইল দীর্ঘ একটি বিশাল হ্রদ গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে সেই বাধা ভেঙে এক আকস্মিক প্রবল জলস্রোতে সিন্ধুনদের দু'তীরবর্তী গ্রাম ও শহর ভাসিয়ে নিয়ে যায়। 1978 সালের আগস্ট মাসের প্রথমে উত্তরপ্রদেশে শিবকাশীর কাছে হিমালয়ের কোলে কানোরিয়াগাড় নদীতে ধস নেমে একটি বিশাল হ্রদ গড়ে ওঠে। পরে 5ই আগস্ট সেই হ্রদটি ভেঙে পড়ায় কয়েকটি বিশালাকার শিলাখণ্ড ছিটকে পড়ে গঙ্গানদীর বুকে। ফলে উচ্চ-উপত্যকায় প্রবল বর্ষণ সত্ত্বেও গঙ্গার জলধারা 18 ঘণ্টার মত স্তব্ধ হয়ে যায় এবং গঙ্গার বুকে গড়ে ওঠে একটি বিশালায়তন হ্রদ, যার তলে কয়েক শ' ফুট দীর্ঘ পাইন, দেওদার ও চিনার গাছগুলি নিমজ্জিত হয়। পরদিন ৬ই আগস্ট সেই সদ্য গড়ে-ওঠা হ্রদটি ভেঙে পড়ে বিপুল জলরাশি প্রায় একশ' ফুট উঁচু বন্যা সৃষ্টি করে ছুটে আসে গঙ্গার পথে। ফলে বহুসংখ্যক গ্রাম, গঙ্গোত্রী যাবার পথ, হিন্দুস্থান কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশনের কারখানা, সামরিক বাহিনীর গ্যারেজ, সিনেমা হল এবং সবশেষে মনেরীর সদ্য-সমাপ্ত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটিও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। 1968 সালের সেপ্টেম্বরের শেষদিকে উচ্চ-উপত্যকায় ধস নামার ফলে তিস্তার পথে নেমে আসে বিশালাকার শিলাখণ্ড ও বড় বড় বৃক্ষ। জলস্রোতে বয়ে আসা শিলাখণ্ড ও বৃক্ষরাজি কার্সিয়াং-এর সঙ্গে সংযোগকারী পথের উপর তিস্তা-নদীর সেতুর থামগুলিতে আটকে যায় এবং সেখানে একটি ছোটখাটো জলাধার গড়ে ওঠে। তারপর জলের প্রবল চাপে তিস্তানদীর সেতু মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে পড়ে এবং বন্যার জল হঠাৎ ছাড়া পেয়ে তিস্তার নিম্ন-উপত্যকার বহু ঘরবাড়ি ধ্বংস করে প্রায় সাড়ে তিন হাজার লোককে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। 1950 সালে অনুরূপ একটি ধসে তিস্তানদীতে 27 ফুট উঁচু বন্যা এসে আসাম-লিংক রেলপথের সেতু ভেঙে গিয়েছিল। মনে রাখতে হবে হিমালয় ভঙ্গিল পর্বতমালা হওয়ায় এতে প্রায়শই ধস নামে। কে বলতে পারে, ভবিষ্যতে ধস নামার ফলে নদীখাতে বয়ে আসা শিলাখণ্ড ও বৃক্ষরাজি

তিস্তা, মহানন্দা, কুশী, ঘর্ঘরা, রামগঙ্গা, কিংবা যমুনার পথে গড়ে তোলা ব্যারাজ ও জলাধারগুলির জলনির্গমন-দ্বার বন্ধ করে তাদের ভেঙে দেবে না এবং আকস্মিক বন্যা সৃষ্টি করে নদীর নতুন পথে চলা শুরু হবে না ?

এছাড়া ভারতে প্রধানত তিন ধরণের মাটি দেখা যায়—উত্তরভারতে বালিমাটি, মধ্যভারতে লালমাটি আর দক্ষিণভারতে কালমাটি। জলধারগুলির জন্য নদীর উপর যে আড়াআড়ি বাঁধ নির্মিত হয়, তার বেশীর ভাগই মাটির তৈরী, শুধু জলনির্গমণের দ্বারের কাছাকাছি অংশটি হয় সিমেণ্ট ও কংক্রীট দিয়ে। জলাধারের বাঁধ নির্মাণে কালমাটি উপযোগী কিন্তু লালমাটি বিশেষ উপযোগী নয়, আর বালিমাটি আদৌ উপযোগী নয়। কারণ লালমাটি ও বালিমাটিতে গড়া বাঁধে সহজে ধস, ফাটল ও ছিদ্র হয়ে থাকে এবং সেগুলি দ্রুত বড় হয়ে জলাধারটি হঠাৎ ভেঙে পড়ে আকস্মিক বন্যা সৃষ্টি করে। এজন্য ভারতে যতগুলি জলাধার ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটেছে, তার অধিকাংশ উত্তর ও মধ্যভারতে হয়েছে।

জলাধার নির্মাণকালে আর যে বিষয়টি বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল, তা হল হঠাৎ প্রচুর বৃষ্টিপাত। ভারত মহাসাগর থেকে আগত একটি নিম্নচাপ হঠাৎ যে কি বিপুল পরিমাণ (কয়েক কোটি একরফুট) বৃষ্টি ঝরিয়ে দিতে পারে, তার সাম্প্রতিক কয়েকটি উদাহরণ হল, 1978 সালের আগস্টে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে, সেপ্টেম্বরে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে, 1980 সালের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বরে উত্তরভারতে, 1981 সালের আগস্টে গুজরাটে, এবং 1983 সালের জুলাই-এ গুজরাটে সংঘটিত প্রবল প্লাবনগুলি। দক্ষিণের সীমাহীন সুনীল সাগর থেকে গ্রীষ্মকালের প্রখর সূর্যকিরণে উত্থিত পুঞ্জীভূত মেঘরাজিকে আটকে রাখার মত বিশালকার সুউচ্চ পর্বতমালা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই, একথা স্মরণে রেখে আমাদের নদীপরিকল্পনাগুলি রচিত হওয়া আবশ্যক।

সব মিলিয়ে বলা যায় যে, আমেরিকা, রাশিয়া, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, এমনকি দক্ষিণভারতে ও সিন্ধুনদের উপত্যকায় যে নদীপরিকল্পনা সুফল আনতে পারে, শিলার গঠন, ভূমিক্ষয়, মাটির প্রকৃতি, বৃষ্টিপাতের ধরণ প্রভৃতি বিষয়গুলি সুবিবেচিত না হওয়ায় অনুরূপ পরিকল্পনার অন্ধ অনুসরণ আমাদের দেশে বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন—জলাধারগুলি নির্মাণের ফলে দেশ কতটা লাভবান হয়েছে ?

উত্তর—আমাদের দেশ প্রধানত কৃষিনির্ভর। কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রতি বৎসর সেচখাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয় আর তার সিংহভাগই ব্যয়িত হয় বৃহৎ সেচপ্রকল্পে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আগে পর্যন্ত 10

হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে সারা দেশে 1554টি জলাধার নির্মিত হয়েছে। ফলে ভারতে সেচসেবিত কৃষিজমির পরিমাণ হয়েছে 6 কোটি 70 লক্ষ হেক্টর। এছাড়া জলাধারগুলি থেকে প্রায় 10 হাজার মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে 10 হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে 200টি জলাধার নির্মাণ করে আরও 1 কোটি 30 লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের সুবিধা দেওয়া হবে। কিন্তু জলাধারগুলি থেকে সেচসেবিত জমিতে সেচের জল দেওয়া হয় প্রধানত খরিফ মরশুমে অর্থাৎ বর্ষাকালে, যখন খরার বৎসরগুলি ছাড়া জমিতে জলের বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। রবি মরশুমে বা শীতকালীন ফসলে অনেক কম জমিতে সেচের জল পৌঁছায় আর বোরো মরশুমে বা গ্রীষ্মকালে অতি অল্প জমিই জলাধার থেকে সেচের জল পায়। যেমন পশ্চিমবঙ্গে দামোদর, ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতীর জলাধারগুলি থেকে খরিফ মরশুমে যেখানে 8·6 লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের জল দেওয়া হয়, রবি মরশুমে সেখানে মাত্র 1 লক্ষ থেকে 1·5 লক্ষ হেক্টর জমি সেচের জল পায় আর বোরো মরশুমে অধিকাংশ বৎসরই অতি অল্প জমিতে সেচের জল দেওয়া সম্ভব হয়। কাজেই আমাদের কৃষিবিপ্লবে জলাধার থেকে সেচের জল সরবরাহের যে বিরাট ভূমিকা আছে, তা বলা যায় না। আসলে উচ্চ ফলনশীল ধান, গম, আলু, তৈলবীজ প্রভৃতির আবিষ্কার, প্রচুর পরিমাণ সারের ব্যবহার এবং শীত ও গ্রীষ্মকালীন জলসেচ ব্যবস্থা (যা প্রধানত ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্পের উপর নির্ভরশীল।) কৃষি বিপ্লব তথা শস্য-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দায়ী। তাছাড়া জলাধারগুলি থেকে যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়, তা উপযুক্তস্থানে অসংখ্য ছোট ছোট জলবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করে করা যেত, যাতে নদীর তথা পরিবেশের ক্ষতি হত অনেক কম। [111 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন—জলাধারগুলি নির্মাণের ফলে দেশের ক্ষতিই বা কতটুকু ?

উত্তর—একটি বৃহৎ নদীপরিকল্পনা গড়ে তোলার জন্য শুধু শত শত কোটি টাকা ব্যয়িত হয়নি, বিপুল পরিমাণ সিমেণ্ট, লোহা ইত্যাদি অত্যাবশ্যক দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, যা অন্য প্রকল্পে নিয়োজিত করা যেত। বর্তমানে জলাধারের সাহায্যে কৃষিজমিতে সেচের সুবিধা পৌঁছে দিতে হেক্টর প্রতি মূলধনী খরচ পড়ে 15-20 হাজার টাকা, যা খুবই ব্যয়বহুল। এছাড়া জলাধার গড়ে তুলতে নদীউপত্যকায় এক বিশাল বনাঞ্চল নিমজ্জিত করার প্রয়োজন হয়, যা প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে। কখন বা পাহাড়ের কোলে লালিত বহু গ্রামের হাজার হাজার আদিবাসীদের বাস্তুচ্যুত করা হয়, যারা হয়ে যায় ছিন্নমূল এক শ্রমিকগোষ্ঠী। ময়ূরাক্ষী প্রকল্পে 26 বর্গমাইল কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টির জন্য 25 হাজার মানুষকে বাস্তুচ্যুত করা হয়। তিলাইয়া,

কোণার, পাঞ্চেত, মাইথন জলাধার নির্মাণের ফলে 100 বর্গমাইল বনভূমি নিমজ্জিত হয় এবং প্রায় 1 লক্ষ লোক ছিন্নমূল হয়। কংসাবতী জলাধারটি প্রায় 50 বর্গমাইল বনভূমি নিমজ্জিত করে এবং পুরুলিয়া জেলার 77টি গ্রামের 1 লক্ষ অধিবাসী বাস্তহীন হয়। উড়িষ্যার হীরাকুঁদ জলাধারের জন্য সম্বলপুর ও সুন্দরগড়ের সুগভীর বনভূমি জলের তলে তলিয়ে গেছে এবং 1 লক্ষ মানুষ তাদের সবকিছু হারিয়েছে। সুবর্ণরেখা প্রকল্পে চাণ্ডিল জলাধারে 32টি গ্রাম সম্পূর্ণভাবে ও 57টি গ্রাম আংশিকভাবে ডুবে যাবে এবং ঐ প্রকল্পের ইচা জলাধারে 12টি গ্রাম সম্পূর্ণভাবে ও 60টি গ্রাম আংশিক-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কোয়েল-কারো জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের দু'টি জলাধারে 100টি গ্রামের আদিবাসী মানুষদের ঘর-বাড়ি-জমি থেকে উচ্ছেদ করা হবে। এভাবে প্রতিটি জলাধারের জন্যে একদিকে যেমন বিশাল বনভূমি নিমজ্জিত হচ্ছে; অন্যদিকে হাজার হাজার আদিবাসী গরীব মানুষ বাসগৃহ, বাস্তুজমি, কৃষিজমি, অরণ্য সম্পদ হারিয়ে ছিন্নমূল শ্রমিক-গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হচ্ছে আর জলাধারের জল, বিদ্যুৎ ও সস্তা শ্রমিক পেয়ে সমৃদ্ধশালী মানুষ আরও সম্পদের অধিকারী হচ্ছে।

জলাধার থেকে কৃষিজমিতে সেচের জল পৌঁছে দিতে এক একটি প্রকল্পে শাখা-প্রশাখাযুক্ত কয়েক হাজার মাইল সেচখাল খনন করতে হয়। সাধারণভাবে দেখা যায়, ঐ সমস্ত সেচখাল ও তাদের পাড়বাঁধ গড়ে তুলতে সেচসেবিত জমির দশ ভাগের একভাগ প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষে ভারতের মোট 8 কোটি হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনতে অতি মূল্যবান 80 লক্ষ হেক্টর উর্বর জমিই সেচখাল কাটাতে নষ্ট হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে দামোদর উপত্যকা প্রকল্পে খরিপ মরশুমে 3·2 লক্ষ হেক্টর এবং রবি ও বোরো মরশুমে প্রায় 80 হাজার হেক্টর জমিতে সেচের জল পৌঁছে দিতে যে 1550 মাইল দীর্ঘ সেচখালগুলি কাটানো হয়েছে, তাতে প্রায় 40 হাজার হেক্টর জমি হারিয়ে গেছে। যেহেতু খরিফ মরশুমে জলসেচ অধিকাংশ বৎসরই অপ্রয়োজনীয়, তাহলে বলা যায় যে, প্রয়োজনের সময় প্রতি 2 হেক্টর জমিতে জলসেচ দিতে প্রায় 1 হেক্টর জমি নষ্ট হয়।

বিপুল পরিমাণ পলি জমার ফলে জলাধারগুলি দ্রুত ভরাট হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন জলাধারে প্রতি বৎসর জমা হচ্ছে মোট 20 লক্ষ একর ফুট পলি। একারণে প্রতি বৎসর সেচসেবিত জমির পরিমাণ 3 লক্ষ হেক্টর হারে কমে যাচ্ছে এবং মূলধনী সম্পদের হিসাবে এ বাবদ বাৎসরিক ক্ষতি 400 কোটি টাকা। জলাধারে পলি জমার জন্য দেশের যে ক্ষতি হচ্ছে এটি তার হিসাব। কিন্তু জলাধারে বন্যার জল ধরে রাখায় নিম্নাংশে নদীখাত

ধ্বংস হয়ে কি ধরণের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, এজন্য দেশ কতটা বন্যাপ্রবণ হয়ে উঠছে, অথবা উর্বর পলি জলাধারে আটকে যাওয়ায় কৃষিজমির মাটির গুণ ও উর্বরতা কতটা নষ্ট হচ্ছে কিংবা প্রতি বৎসর কয়েকটা জলাধার ভেঙে পড়ায় আকস্মিক বন্যাতে কি ক্ষতি হচ্ছে, তার হিসাব আজও করা হয় নি। অর্থাৎ জলাধারগুলি নির্মাণকালে তাদের কুফল সম্বন্ধে যতটা চিন্তা করা দরকার ছিল, তা করা হয় নি। সর্বদিক বিবেচনা করে ভারতের মত বৃষ্টিবহুল দেশে এবং পলিবহুল মাটিতে জলাধার নির্মাণ সামগ্রিকভাবে লাভজনক কিনা, তা খতিয়ে দেখা আবশ্যক।

50 বা 100 বৎসর পরে জলাধারগুলির জন্য অতি ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, যখন জলাধারগুলি ভরাট হওয়ায় বন্যার জল ধরে রাখার ক্ষমতা হারাবে আবার নিম্নাংশে নদীখাত মজে যাওয়ায় জলনিকাশী ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবে। কাজেই প্রতি বৎসরই দেশ প্রলয়ঙ্কর প্লাবনের কবলে পড়বে। এছাড়া কোন জলাধার ভেঙে পড়লে জলাধারে সঞ্চিত বিপুল পরিমাণ পলি, কাদা ও বালি জলস্রোতে নেমে এসে নিম্ন-উপত্যকার গ্রাম ও শহরকে ঢেকে দেবে। প্রসঙ্গত বলি, এশিয়া মাইনরের মেসোপোটেমিয়ার সুমেরীয় সভ্যতার মানুষেরা 5 হাজার বৎসর পূর্বে ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ নদীদুটির উপর জলাধার নির্মাণ করে সেচব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। পরবর্তীকালে পলি জমে নদী ও জলাধার উভয় ভরাট হওয়ায় প্রলয়ঙ্কর প্লাবন ও পলিপ্রবাহের সৃষ্টি হয়, যা ঐ সভ্যতা ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সিন্ধুসভ্যতার শহরগুলি সম্ভবত অনুরূপ কারণে সিন্ধুনদের পলির নীচে বারবার চাপা পড়েছিল।

প্রশ্ন—আমাদের জলসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার কিভাবে করা উচিত?

উত্তর—ভারত মহাসাগর থেকে আগত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রভাবে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতে প্রচুর বৃষ্টি হয়, আবার দাক্ষিণাত্যের পূর্ব-উপকূলে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুতে শীতকালেও বৃষ্টি হয়ে থাকে। এ কারণে জলসম্পদে ভারত একটি সমৃদ্ধ দেশ। হিমালয় পর্বতমালার তুষারগলা জলও জলসম্পদের অন্য একটি উৎস। এই জলসম্পদকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। ভূপৃষ্ঠের জলসম্পদ, যা নদী, হ্রদ, খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতি জলাশয় থেকে আহরণ করা হয় এবং ভূগর্ভের জলসম্পদ, যা মাটির নীচে বিভিন্ন পলিস্তরের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। ভূ-পৃষ্ঠের জলসম্পদ ব্যবহারের প্রধান উপায় হল জলাধার নির্মাণ। দাক্ষিণাতের মালভূমিসহ পশ্চিমঘাট পর্বতমালা কঠিন ব্যাসল্ট শিলা এবং পূর্বঘাট পর্বতমালা গ্রানাইট শিলা দ্বারা গঠিত হওয়ায় দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী ও তাদের উপনদীগুলিতে পলি আসার পরিমাণ অত্যন্ত কম। আবার ভারতে অবস্থিত সিন্ধুনদের

উপত্যকা অধিকাংশ সময় তুষারাবৃত থাকায় এবং সেখানে বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় সিন্ধুনদ ও তার উপনদীর অববাহিকায় ভূমিক্ষয় কম। এজন্য দাক্ষিণাত্যে ও উত্তর ভারতে সিন্ধুনদের অববাহিকায় জলাধার নির্মাণ করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য হলেও উত্তর ভারতে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ও তাদের উপনদীগুলিতে জলাধার নির্মাণ করা সমীচীন নয়।

ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা হল চিরতুষারের রাজ্য। হিমালয়ের তুষাররাজি শত শত হিমবাহরূপে অতি ধীরে নেমে আসে এবং 10-12 হাজার ফুটে উচ্চে আসার পর হিমবাহের তুষাররাজি জলে রূপান্তরিত হয়। তুষারগলা জলের রূপালী ঝর্ণাগুলি একত্রিত হয়ে সৃষ্টি হয় চঞ্চলা পাহাড়ী নদী আর বহু পাহাড়ী নদী মিলিত হয়ে নেমে আসে সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের উপনদীরূপে। হাজার হাজার ফুট থেকে নেমে আসা প্রতিটি পাহাড়ী নদীই হল জলশক্তির এক চিরন্তন উৎস। এইসব পাহাড়ী নদীর পথের উপযুক্ত স্থানে ছোট ছোট বাঁধ দিয়ে টানেল বা পাইপের সাহায্যে উচ্চ চাপযুক্ত জল এনে সহজেই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। এছাড়া যেহেতু হিমালয়ের তুষাররাজ্য থেকে নেমে আসা নদীগুলি সারা বৎসরই সজীব থাকে, সেহেতু এই সব ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র সারা বৎসর বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম। সারা ভারতের জলাধারগুলি থেকে যেখানে বর্তমানে 10 হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুতশক্তি উৎপন্ন হয়, সেখানে নদীর ক্ষতি না করে শুধু হিমালয়ের নদীগুলি থেকে প্রায় 30 হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুতশক্তি উৎপাদন করা যায়, যার অতি সামান্য অংশই বর্তমানে আহরিত হচ্ছে। এর মধ্যে কারিগরী ও অর্থনৈতিক বিচারে আহরণযোগ্য যে 20 হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুত-শক্তি হিমালয়ের কোলে বিভিন্ন রাজ্যে পাওয়া যেতে পারে, তার পরিমাণ হল—আসাম উপত্যকা (11,099), পশ্চিমবঙ্গ (1,325), বিহার (910), উত্তরপ্রদেশ (3,764), হিমাচল প্রদেশ (1,868), পাঞ্জাব ও হরিয়ানা (1,361) জম্মু ও কাশ্মীর (3,591)। পশ্চিমবঙ্গে সম্ভাব্য জলবিদ্যুত-শক্তি হল,—তোর্ষা-জলঢাকা বেসিন (400 MW), জলঢাকা বেসিন (150 MW), তিস্তা বেসিন (570MW), রায়ঢাক বেসিন (152 MW) এবং বালাসন বেসিন (43 MW)। এ পর্যন্ত জলঢাকা জলবিদ্যুত প্রকল্পে মাত্র 27 MW বিদ্যুত উৎপাদিত হচ্ছে এবং তিস্তা বেসিনে রম্মাম জলবিদ্যুত প্রকল্পে 50 MW বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলছে। [16 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

গাঙ্গেয় সমভূমির হাজার হাজার ফুট গভীর পর্যন্ত রয়েছে পলি ও বালিমাটির স্তর। ঐ সকল স্তরে জল সহজেই শোষিত হয় বলে এ সমভূমির একটু নীচেই রয়েছে ভূগর্ভস্থ জলের অফুরন্ত ভাণ্ডার। কূয়া,

অগভীর নলকূপ বা গভীর নলকূপের থেকে এই জল আহরণ করা যায় বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের সাহায্যে। এছাড়া গবাদি পশুচালিত পার্শিয়ান্ হুইলের সাহায্যে কূয়া থেকে জলসেচ সম্ভব। 3-4 বৎসর খরা হলেও ভূগর্ভস্থ জলসম্পদের বিশেষ হেরফের হয় না। শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে প্রয়োজনের সময় ভূগর্ভস্থ জলের সাহায্যে উত্তরভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সেচসেবিত কৃষিজমির পরিমাণ লক্ষ হেক্টরে দেওয়া হল বন্ধনীর মধ্যে—পাঞ্জাব (28), হরিয়ানা (12), গুজরাট (13), রাজস্থান (15), উত্তরপ্রদেশ (81), মধ্যপ্রদেশ (10), বিহার (15), উড়িষ্যা (3), পশ্চিমবঙ্গ (5) ও আসাম (0·3)। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ তাদের ভূগর্ভস্থ জলসম্পদের শতকরা 70 থেকে 88 ভাগ কাজে লাগিয়ে সকল ঋতুতেই বিপুল শস্য উৎপাদন করে সমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত হয়েছে আর পূর্বাঞ্চলের উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম ভূগর্ভস্থ প্রাপ্ত জলের শতকরা 20 ভাগের কম কাজে লাগানোয় শস্যের ক্ষেত্রে বিরাট ঘাটতি বহন করছে।

হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদীগুলিতে সারা বৎসর বরফগলা জল নেমে আসে। কাজেই নদীজল উত্তোলক পাম্পের সাহায্যে নদীর জল আহরণ করে সেচব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 2500 নদীজল উত্তোলক পাম্প, 2500 গভীর নলকূপ, 3500 অগভীর নলকূপ ও 25 হাজার কূয়ার সাহায্যে বর্তমানে প্রায় 10 লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ দেওয়া হয়। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে 11 লক্ষ পুকুর ও দীঘি আছে, যাদের মোট আয়তন 3 লক্ষ হেক্টর। ঐ সকল জলাশয় সংস্কার করে 5·5 লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ সম্ভব।

উত্তর ভারতের হিমালয় থেকে উৎপন্ন অসংখ্য পাহাড়ী নদীতে ছোট ছোট জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র নির্মাণ করা সম্ভব এবং সেই বিদ্যুতের সাহায্যে পাম্প চালিয়ে সহজলভ্য ভূ-পৃষ্ঠের ও ভূ গর্ভের জল আহরণ করে সেচের ব্যবস্থা করা যায়। অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলবিদ্যুত কেন্দ্র ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প হল গাঙ্গেয় উপত্যকার জলসম্পদ ব্যবহারের সুষ্ঠু পদ্ধতি। [দ্বিতীয় অধ্যায়ের 29 পৃষ্ঠায় আলোচিত]

এছাড়া বিভিন্ন ফসলে জলের প্রয়োজন বিভিন্ন। ধানচাষে যে পরিমাণ জল লাগে, গমচাষে তার অনেক কম জলের প্রয়োজন হয়। ভুট্টা, আলু, কলাই, তৈলবীজ প্রভৃতির চাষে আরও কম জল লাগে। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন জমিতে জলের প্রাপ্যতা অনুযায়ী যদি আমরা উপযুক্ত শস্য, সবজি বা বৃক্ষ রোপণ করি, তবে সেচের জলের উপর নির্ভরশীলতা বহুলাংশে কমানো যায় এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট না করে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়। এটাই হবে জলসম্পদের সবচেয়ে উপযুক্ত (optimum) ব্যবহার।

প্রশ্ন—পরিকল্পিত নদীসংস্কারের জন্য বিভিন্ন নদীপথকে সরলায়িত করা দরকার। এ ধরণের নদীসংস্কার প্রকল্প পূর্বে কোথাও গৃহীত হয়েছে কী ?

উত্তর—ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে রাইন্ (Rhine) নদীর অনেক বাঁককে কেটে সরল করে দেওয়া হয়। তাই আজও রাইন্ নদীর পথ ধরে জাহাজগুলি জার্মানীর রূঢ় (Ruhr) অঞ্চলে বিভিন্ন নদীবন্দরে সহজে পাড়ি দেয়। আমেরিকার যে টেনেসি ভ্যালি প্রকল্পের অনুসরণে আমাদের দামোদর ভ্যালি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে, সেই টেনেসি নিম্নাংশে মিসিসিপিতে এসে মিলিত হয়েছে। টেনেসি নদীর বন্যানিয়ন্ত্রণে জলাধার নির্মাণ করা ছাড়াও মিসিসিপি নদীর পথকে সরলায়িত করা হয়েছে। আমাদের দেশে পশ্চিমবঙ্গে 1967—'69 সালে মেদিনীপুর জেলায় কালিয়াঘাই নদীকে গভীর করা ছাড়াও তার বাঁককে কেটে সরল করা হয়েছিল আর সেজন্য 1978 সালের প্রবলতম প্লাবনেও কালিয়াঘাই নদীর অববাহিকায় প্লাবনের প্রকোপ কম ছিল। অবশ্য বিভিন্ন নদীর মধ্যে বিজ্ঞানসম্মতভাবে যোগসাধন করে তাদের পথকে সরল ও সংক্ষিপ্ত করার কোন প্রচেষ্টা এ পর্যন্ত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

প্রশ্ন—কংসাবতী, দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী বা ভাগীরথী-হুগলীর পথকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য যে 15-20 মাইল নতুন পথ গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে, তা কি সম্ভব ?

উত্তর—আজ থেকে শত বৎসর আগে 100 মাইল দীর্ঘ সুয়েজ খাল খনন করা হয়েছে মরুময় আরব দেশে। তারপর পৃথিবীর বুকে অনেক বড় খাল খনন করা হয়েছে, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাশিয়ার স্ট্যালিন্‌স্ খাল (152 মাইল দীর্ঘ), সুইডেনের গোটা খাল (125 মাইল দীর্ঘ), রাশিয়ার ভল্গা খাল 80 মাইল দীর্ঘ), জার্মানির কিয়েল খাল (61 মাইল দীর্ঘ) এবং আমেরিকার পানামা খাল (46 মাইল দীর্ঘ)। এই তো সম্প্রতি প্রায় 30 কোটি টাকা ব্যয়ে 600 ফুট বিস্তৃত একটি নদীর ন্যায় 26 মাইল দীর্ঘ ফরাক্কা-জঙ্গীপুর ফীডার ক্যানাল কাটা হল হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবনের এক ব্যর্থ প্রচেষ্টায়। কাজেই নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমির বন্যা নিয়ন্ত্রণে এবং হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবনে এরূপ কয়েকটি খাল কাটা অসম্ভব নয়। তাছাড়া ঐ খালগুলিকে তো নদী নিজেই তার প্রবাহের উপযোগী করে গড়ে নেবে।

প্রশ্ন—ঘাটাল মাষ্টার প্ল্যান, কান্দী মাষ্টার প্ল্যান, যমুনা বেসিন ড্রেনেজ স্কীম, নিম্ন দামোদর সংস্কার প্রকল্প প্রভৃতি যে সমস্ত পরিকল্পনা রচিত হয়েছে, তাতে কী সুফল পাওয়া যাবে ?

উত্তর—ঐ সকল প্রকল্পে বিভিন্ন নদীর খাতকে গভীর করা হবে আর তা করা হবে নদীর বর্তমান পথে। [প্রথম অধ্যায়ে 18 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] কিন্তু

নদীর ঐসব পথে আছে অজস্র বাঁক, যার প্রতিটিতেই জলপ্রবাহ ব্যাহত হবে এবং ঐ সব পুরানো পথে পাহাড়ী পথের জলপ্রবাহের অর্জিত গতিও বজায় থাকবে না। ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে আবার তা ভরাট হয়ে যাবে। তাছাড়া হুগলী নদীই হল সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র জলনিকাশী পথ, তাই হুগলী নদীখাতের উন্নতি না হলে সকল প্রকল্পই অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

প্রশ্ন—সমভূমি অঞ্চলে নদনদীর পথ পরিবর্তনে ঢাল ছাড়া জলের পূর্বলব্ধ গতি একটি বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। জলের পূর্বলব্ধ গতি ও জলপ্রবাহের জাড্যতা (Inertia of flow) বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর—সকল বায়বীয় পদার্থ নমনীয় (Compressible) অর্থাৎ চাপের বৃদ্ধির সঙ্গে তাদের আয়তন কমে। মাটি, পাথর, পিতল, লোহা প্রভৃতি পদার্থেরও চাপবৃদ্ধির সঙ্গে অল্পাবিস্তর নমনীয়। কিন্তু জল প্রায় অনমনীয় (Incompressible) [প্রতি বায়ুমণ্ডলের চাপে অর্থাৎ প্রতি বর্গ ইঞ্চির উপর 14·7 পাউণ্ড চাপ প্রয়োগে জলের আয়তনের ·000046 ভগ্নাংশ মাত্র কমে]। আর সেজন্য জলের স্থিতিস্থাপকতা গুণ মাটি, পাথর, পিতল এমনকি লোহার চেয়েও বেশী। কাজেই বন্যার জল যখন তীব্রগতিতে ছুটে চলে, তখন বিশালায়তন স্থিতিস্থাপক অনমনীয় পদার্থে এক বিপুল শক্তি আশ্রয় নেয়, যে শক্তি তার পথের সকল বাধাকে মুহূর্তে অপসারিত করে এগিয়ে চলে। অর্থাৎ জল তখন একটি কঠিন পদার্থের ন্যায় আচরণ করে। একেই আমরা জলপ্রবাহের জাড্যতা (Inertia of flow) বলতে পারি। এজন্য বন্যার জল তার প্রবাহপথের উপর থাকা নদীর পাড়বাঁধ, সড়কপথ, রেলপথ, ঘরবাড়ি, গাছপালা প্রভৃতি সবই ধ্বংস করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, 1978 সালে দামোদর, রূপনারায়ণ ও কংসাবতীর বন্যায় নদীর পাড়বাঁধ, দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ, হাওড়া-বোম্বাই সড়ক পথ ও মেদিনীপুর ক্যানেলের পাড়বাঁধ যেখানে ভেঙেছে তা প্রায় একই সরলরেখায় অবস্থিত। অর্থাৎ বন্যার জল ছড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও জলপ্রবাহের জাড্যতা একই সরলরেখা বরাবর এগিয়ে গেছে। এছাড়া স্বাভাবিকভাবে জল জমার জন্য যে মাটির বাড়ী ধসে পড়তে কয়েকদিন লাগে, জলের গতির জন্য বন্যার সময় সেই বাড়ীই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভেঙে পড়তে দেখা যায়।

প্রশ্ন—নদীখাতে জলের পূর্বলব্ধ গতি কিভাবে কাজ করে ?

উত্তর—সাধারণের ধারণা, নদী সর্বদাই সবচেয়ে বেশী ঢালের দিকে বয়ে যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে কোন একটি স্থানে নদীর একটিমাত্র পথ নির্দিষ্ট হত। তাহলে প্রায় 20 হাজার বর্গমাইল-বিশিষ্ট গঙ্গার নিম্ন-সমভূমিতে

অজস্র নদনদী বারবার তাদের পথকে ছেদ করে পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ, এমনকি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বয়ে যেত না। বাঁকের মাধ্যমে জলের পূর্বলব্ধ গতি বিভিন্ন নদীখাতে সঞ্চারিত হয় বলেই নদীর অজস্র শাখা-প্রশাখা গড়ে ওঠে। [সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত] নদীর জল যে ঢালের বিপরীতেও প্রবাহিত হয়ে থাকে, তা জোয়ারের সময় আমরা দেখেছি। জলপ্রবাহের জাড্যতার জন্যই জোয়ারের জল হুগলী নদীখাত বেয়ে ঢালের বিপরীতে সমুদ্র থেকে বহুদূরে নবদ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছে যায় ; নইলে শুধু সমুদ্রের জল স্ফীত হয়ে নবদ্বীপ পৌঁছাতে হলে কলিকাতায় একতলা, ডায়মণ্ডহারবারে দোতলা ও সাগরদ্বীপে তিনতলা বাড়িগুলো ডুবে যাওয়ার পরই তা সম্ভব হত। জোয়ারের জল যেমন একটা গতি নিয়ে এগিয়ে চলে, (এমনকি ঢালের বিপরীতে) তেমনি বন্যার জলও একটা তীব্র গতি নিয়ে ছুটে চলে নদীখাত বেয়ে। এজন্য নদীর যে কোন স্থানে বন্যার সময় জলের গতি অন্য সময়ের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। যেমন গঙ্গানদীর একই ঢালুপথে বয়ে আসা সত্ত্বেও ফরাক্কায় জলের গতি যেখানে গ্রীষ্ম বা শীতকালে সেকেণ্ডে মাত্র 3-4 ফুট, বর্ষাকালে বন্যার সময় সেখানে জলের গতি দাঁড়ায় সেকেণ্ডে 15—20 ফুট।

প্রশ্ন— জলপ্রবাহের জাড্যতার জন্য নদী যদি সরলপথে চলতে চায়, তবে নদীপথে এত বাঁক কেন ?

উত্তর—সরল পথ পেলে নদী যে বক্রপথ পরিহার করে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, সমভূমি অঞ্চলে নদীর দু'তীরভূমিতে পড়ে থাকা অজস্র অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ ; যেগুলি অতীতে নদীর কোন বক্র খাত ছিল। আসলে নদীপথে কোথাও একটি বাঁক থাকলে জলপ্রবাহ সেই বাঁকে শুধু বাধাই পায় না, প্রতিহত হয়ে নদীর বিপরীত পারে কিছুটা ভাটিতে আঘাত হানে আবার সেখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসে অন্য পারে। অর্থাৎ নদীর জলপ্রবাহের সঙ্গে এক ধরণের কম্পন (oscillation) সৃষ্টি হয় এবং নদীর জল এগিয়ে চলার পথে তীর থেকে অন্য তীরে ছুটে চলে নতুন নতুন বাঁক গড়ে তুলতে। তারপর প্রবল জলস্রোতে প্রতিটি বাঁকের উত্তল অংশে (বা নদীর অবতল অংশে) চলে মাটির ক্ষয় আর বাঁকের অবতল অংশে (বা নদীর উত্তল অংশে) চলে পলির সঞ্চয়। এভাবে বাঁকের মাত্রা ও সংখ্যা বাড়তে থাকে। পরে নদী একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ সৃষ্টি করে নতুন সরলপথে চলতে থাকে। [দ্বিতীয় অধ্যায়ে 23 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] এছাড়া প্রাকৃতিক কারণে কিংবা জলাধার নির্মাণের ফলে জলপ্রবাহ কমে যাওয়ায় যখন কোন নদী শীর্ণকায়া হয়ে পড়ে, তখন তার পূর্বের বিশাল খাত দ্রুত পলি জমে ভরাট হতে থাকে। এই পলি জমা সর্বত্র সমান হয় না। শীর্ণধারা নদী তার খাতের মধ্যে অত্যন্ত সর্পিল এক

পথে এগিয়ে চলে। নদীর ঐ অবস্থাকে বার্ধক্য বলা হয়। ভাগীরথী, জলঙ্গী, ভৈরব, ইছামতী প্রভৃতি এককালের বিশাল নদী তাই আজ অজস্র বাঁকের বন্ধনে বন্দী। প্রাকৃতিক কারণে কোন বৃদ্ধ নদীতে যদি আবার বিপুল জলপ্রবাহ বয়ে আসে, সে তখন তার পথের বাঁক সরল করে নবযৌবন লাভ করে। এভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর পদ্মাপথের বহু বাঁক আজ বহুলাংশে সরলায়িত হয়ে গেছে। [82 পৃষ্ঠায় মানচিত্র দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন—নদী তার গর্ভ কাটে কিভাবে এবং নদীর দু'তীরে স্বাভাবিক সমান্তরাল বাঁধ (Natural leeve) গড়ে ওঠে কেন ?

উত্তর—বন্যার সময় নদীর জল যখন তীব্র গতিতে এগিয়ে চলে ; তখন নদীর প্রায় মাঝ বরাবর যেখানে জলের গতি সর্বোচ্চ হয়, সেখানে জলের চাপ সবচেয়ে কম থাকে। ফলে নদীর উপরিভাগে তীরের কাছের জল নদী বরাবর এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে সর্বোচ্চ প্রবাহের দিকে এগিয়ে চলে। তারপর নদীর মাঝ বরাবর ঐ জল নিম্নাভিমুখী গতি পায় এবং নদীগর্ভের দিকে ছুটে চলে। তখন নদীগর্ভের পলি কাটিয়ে ঐ জল নদীর নিম্নাংশ দিয়ে তীরের দিকে চলে আসে এবং দু'তীরে সেই পলি জমা করে। [নদীতে জলের পথকে অনেকটা পাশাপাশি রাখা দুটি পাকানো (Helical) দড়ির অসংখ্য সুতোর মত মনে করা যেতে পারে, যার প্যাকগুলি মাঝ বরাবর নীচের দিকে নেমে গেছে আর ধার বরাবর উপরের দিকে উঠে এসেছে।] এভাবে একদিকে সর্বোচ্চ প্রবাহের নীচে নদীর গর্ভ কাটে, অন্যদিকে নদীর দুতীরে স্বাভাবিক সমান্তরাল বাঁধ সৃষ্টি হয়ে নদীখাত গড়ে উঠে। বাঁকের নিকট জলের সর্বোচ্চ প্রবাহ বাঁকের উত্তল অংশের দিকে থাকে বলে নদীগর্ভের গভীর অংশটি ক্রমাগত বাঁকের উত্তল অংশের দিকে এগিয়ে চলে। যুগ যুগ ধরে নদীর সামগ্রিক গড় জলপ্রবাহেয় উপর নির্ভর করে নদীখাত গড়ে উঠে এবং তার গভীরতা ও স্বাভাবিক সমান্তরাল বাঁধের সঙ্গে এক স্থিতাবস্থা বজায় থাকে। এজন্য প্রাকৃতিক কারণে অথবা কৃত্রিমভাবে (জলাধার নির্মাণের ফলে) স্বাভাবিক জলপ্রবাহ ব্যাহত হলে নদীখাতও ধ্বংস হয়ে যায়। এছাড়া কৃত্রিমভাবে সমান্তরাল বাঁধ (বা পাড়বাঁধ) গড়ে তুললে নদীখাতের গভীরতা ও দু'তীরের বাঁধের মধ্যে স্থিতাবস্থা আনার জন্য নদীগর্ভ দ্রুত উ'চু হয়ে ওঠে। এভাবে পশ্চিমবঙ্গে দামোদরের গর্ভ দুতীরভূমির চেয়ে 15-20 ফুট উ'চু হয়ে গেছে আর চীনদেশে ইয়াংসি নদীর গর্ভ দুতীরবর্তী ভূমির চেয়ে প্রায় 100 ফুট উ'চু। এজন্য ঐসব নদীর পাড়বাঁধ ভেঙে প্লাবন হলে তা প্রলয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। কিন্তু বাংলাদেশে বিভিন্ন নদীতে কৃত্রিম পাড়বাঁধ দেওয়া হয়নি বলে নদীগর্ভ দু'তীরভূমির সঙ্গে সমভাবে উ'চু হয়েছে।

সেজন্য বাংলাদেশে প্রতি বৎসরই প্লাবন হলেও তা বড় একটা ভয়ঙ্কর রূপ নেয়নি। কাজেই জলাধার ও কৃত্রিম পাড়বাঁধ সাময়িকভাবে সীমিত প্লাবনকে নিয়ন্ত্রণ করলেও পরবর্তীকালে তা প্রলয়ঙ্কর প্লাবনের কারণ হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন—প্লাবন নিয়ন্ত্রণের সুষ্ঠু পদ্ধতি কি ?

উত্তর—প্লাবন নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রধানত যে পাঁচটি পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে, সেগুলি হল—(1) নদী-উপত্যকায় বৃক্ষরোপণ ও বনভূমি সৃজন, যাতে ভূমিক্ষয় কম হয়ে নদীতে অল্প পরিমাণ পলি আসে। (2) নদীর দু'তীরে সমান্তরাল বাঁধ নির্মাণ, যাতে বন্যার জলরাশিকে নদীখাতে আটকে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। (3) জলাধার নির্মাণ, যাতে প্রবল বর্ষণের সময় উচ্চ-উপত্যকার জলরাশিকে ধরে রাখা হয়। (4) সেচখাল ও নাব্যখালের জাল, যাতে বন্যার জলরাশিকে বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে প্লাবনের জলতল সীমিত রাখা যায়। এবং (5) পরিকল্পিত নদীসংস্কার, যাতে বিভিন্ন নদনদীর মধ্যে যোগসাধন করে বন্যার জলরাশিকে দ্রুতগতিতে ও স্বল্প সময়ে সাগরে পৌঁছে দেওয়া যায়। কিন্তু মনে রাখা দরকার, দু'কূলে প্লাবন সৃষ্টি করে দু'তীরভূমিকে উঁচু ও উর্বর করাই নদীর প্রধান কাজ। কাজেই প্লাবনকে নিরুদ্ধ করার অর্থই হল নদীর ধ্বংস, যা পরবর্তীকালে প্রবলতর প্লাবনের সম্ভাবনা ডেকে আনে। উপরোক্ত পাঁচটি পদ্ধতির সুষ্ঠু সমন্বয়ে সীমিত-হারে ও সহনীয় মাত্রায় প্লাবন সৃষ্টি করে নদীকে জীবন্ত রাখাই প্রলয়ঙ্কর প্লাবন নিয়ন্ত্রণের শ্রেষ্ঠ পথ। [সপ্তম অধ্যায়ের শেষাংশ দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন—অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থার তুলনায় জলপথ-পরিবহনে খরচ কত কম ?

উত্তর—একটি হিসাবে দেখা যায়, রেলপথ ও পাকা সড়কপথ গড়ে তুলতে মাইল প্রতি খরচ যেখানে প্রায় 20 লক্ষ ও 2·5 লক্ষ টাকা, জলপথের জন্য নাব্যখাল সৃষ্টিতে মাইল প্রতি খরচ সেখানে 2 লক্ষ টাকার কম। রেলপথ, সড়কপথ ও জলপথের মাইল প্রতি বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খরচ যথাক্রমে 15 হাজার টাকা, 7·5 হাজার টাকা ও 1·5 হাজার টাকা। এছাড়া 1 হর্সপাওয়ার (Horse Power) বা 746 ওয়াট শক্তি খরচ করে যেখানে রেলপথে ও সড়কপথে 400 কিলোগ্রাম ও 250 কিলোগ্রাম মাল বহন করা যায়, সেখানে ঐ শক্তিতে জলপথে 4,000 কিলোগ্রাম মাল পরিবহন সম্ভব। জোয়ার-ভাঁটার সাহায্যে বা অনুকূল বাতাসে পাল তুলে বিনা খরচেও জলপথে যাতায়াত করা যায়, যদিও তা সময়সাপেক্ষ। অর্থাৎ প্রাথমিক মূলধন, রক্ষণাবেক্ষণ ও শক্তি ব্যয়ে জলপথ-পরিবহন সবচেয়ে সুলভ।

এ কারণে আমেরিকা, রাশিয়া ও ইউরোপের সকল উন্নত দেশ মাল

পরিবহনে জলপথকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। আমেরিকায় সেণ্ট লরেন্স নদী সুপিরিয়র, হিউরণ, ইরি ও অণ্টারিও হ্রদের পথে বহুদূর পর্যন্ত নাব্য। পরে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের পাশ দিয়ে ওয়েল্যাণ্ড ক্যানাল নামে খাল কেটে সেই নাব্যতাকে সুপিরিয়র হ্রদের পশ্চিমাংশ পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়। ফলে বড় বড় জাহাজ দেশের 2500 মাইল অভ্যন্তরে বিভিন্ন বন্দরে যাতায়াত করে। সোভিয়েট দেশে বাল্টিক সাগর ও শ্বেত সাগরকে সংযুক্ত করার জন্য 152 মাইল দীর্ঘ ষ্ট্যালিনস্ খাল কাটানো হয়েছে। 80 মাইল দীর্ঘ ভল্গা খাল মস্কোভা ও ভল্গা নদী দু'টিকে যুক্ত করেছে; ফলে কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের সঙ্গে মস্কো শহরের যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে ওদেশে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিভিন্ন নদীর মধ্যে যোগসাধনের একটি বৃহৎ খাল কাটার কাজ চলছে। ফ্রান্সের সেইন, লো-আর্, রোন্, গারন্ ও তাদের উপনদীগুলি বিভিন্ন খাল দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। ফলে সেদেশে 40 হাজার মাইল নাব্য জলপথ গড়ে উঠেছে। জার্মানির 61 মাইল দীর্ঘ কিয়েল খাল ও 41 মাইল দীর্ঘ এলব্ খাল বিভিন্ন নদীর সাহায্যে 5 হাজার মাইল দীর্ঘ নাব্য জলপথ সৃষ্টি করেছে। অথচ আমাদের এই নদীমাতৃক দেশে রেলপথ, সড়কপথ ও বিমানপথের তুলনায় জলপথে অতি কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। এমন কি ইংরেজ আমলে বিভিন্ন নদীর মধ্যে সংযোগকারী যে নাব্য খাল কাটা হয়েছিল, সেগুলিও আজ মৃত। [72 ও 77 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন—হুগলী নদীর নাব্যতা গত কয়েক দশকে কিভাবে কমে যাচ্ছে?

উত্তর—হুগলী নদীর মাঝে 350 ফুট থেকে 600 ফুট বিস্তৃত একটি গভীরতর প্রণালী আছে, যে নাব্য প্রণালীতে সমুদ্রগামী জাহাজগুলি চলাচল করে পাইলটদের সাহায্য নিয়ে। সাধারণভাবে জাহাজের তলদেশ নদীগর্ভ থেকে কমপক্ষে 3 ফুট উঁচুতে (clearance-এ) থাকলে তবেই সেই জাহাজ নদীতে চলাচল করতে পারে। অতএব নদীর নাব্যতা তার গভীরতা থেকে 3 ফুট কম। বর্ষাকালে জোয়ারের জলতল উঁচু হয়ে নদীর নাব্যতা সর্বোচ্চ হয়। হুগলী নদীতে জোয়ারের সময় কলিকাতা পর্যন্ত যে গভীরতার বা ড্রাফটের জাহাজ চলাচল করতে পারে, তাকে কলিকাতায় হুগলী নদীর নাব্যতা বলা যেতে পারে। এ হিসাবে চল্লিশের দশকে বিশ্বযুদ্ধের সময় 27 ফুট ড্রাফটের জাহাজ কলিকাতা বন্দরে যাতায়াত করত। পঞ্চাশের দশকে কলিকাতায় হুগলী নদীর নাব্যতা ছিল 26 ফুট, ষাটের দশকে তা কমে হয় 25 ফুট এবং সত্তরের দশকে তা দাঁড়ায় 24 ফুটে। তারপর 1975 সালে ফরাক্কা প্রকল্পের দ্বারা 40 হাজার কিউসেক গঙ্গাজল আনায় কলিকাতার কাছে হুগলী নদীর জলতল 3 ফুট উঁচু হয়ে ওঠে। [58 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] ফলে কলিকাতায় নদীর নাব্যতা

হঠাৎ 3 ফুট বেড়ে 27 ফুটে পরিণত হয়। কিন্তু হুগলী নদী ভরাট হওয়ায় গত 8 বৎসরে সেই নাব্যতা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র 24 ফুটে। অথবা ফরাক্কা প্রকল্প রূপায়ণের পূর্বে হুগলী নদীর গর্ভ যেখানে প্রতি দশকে স্বাভাবিকভাবে 1 ফুট হারে উঁচু হয়ে উঠছিল, ফরাক্কা প্রকল্প রূপায়ণের পর মাত্র 8 বৎসরে সেখানে নদীগর্ভ 3 ফুট উঁচু হয়ে গেছে। অর্থাৎ 40 হাজার কিউসেক গঙ্গাজলে আনীত পলিই হুগলী নদীকে দ্রুততর হারে ভরাট করে দিচ্ছে। [59 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

এছাড়া ফরাক্কা প্রকল্প রূপায়ণের পর হলদিয়া বন্দরের কাছে হুগলী নদীর গভীরতা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। সেখানে নদীর মাঝে গড়ে উঠেছে নতুন এক বিশাল চর, যাকে বলা হয় নয়াচর। বর্তমানে নয়াচরের পূর্বদিকে হুগলী নদীর গভীরতর প্রণালী আছে। ফলে গত এক দশকে হলদিয়ায় নদীর নাব্যতা 36 ফুট থেকে কমে 28 ফুটে দাঁড়িয়েছে। 25 কোটি টাকা ব্যয়ে নয়াচরের উত্তর ও দক্ষিণ বরাবর বাঁধ (Guide-wall) দিয়ে নদীর জলপ্রবাহকে নয়াচরের পশ্চিমে হলদিয়া বন্দরের দিকে সরিয়ে আনার জন্য একটি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এতে হলদিয়ার দিকে হুগলী নদীর গভীরতা বাড়বে ঠিকই, কিন্তু জলপ্রবাহ ব্যাহত হওয়ায় নদীর অন্যত্র ভরাট হয়ে যাবে এবং জলনিকাশী ক্ষমতা কমে যাওয়ায় দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ প্রবল প্লাবনের কবলে পড়বে। আর যদি কখনও হুগলী মোহানায় সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস (Tidal wave) ওঠে, হলদিয়ায় নদীর বিস্তার হঠাৎ কমে যাওয়ায় সেই জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে, যা হলদিয়া বন্দরের ধ্বংসের কারণ হবে।

প্রশ্ন—ফীডার ক্যানালকে সংস্কার করে ফরাক্কা ব্যারাজের সাহায্যে 3-4 লক্ষ কিউসেক বন্যা আনলে হুগলী নদী কি পুনরুজ্জীবিত হবে ?

উত্তর—ফরাক্কায় গঙ্গার জলের গতি বন্যার সময় সেকেণ্ডে 16 ফুট হয়ে থাকে। কিন্তু নদীর ডানতীর থেকে কেটে আনা ফীডার ক্যানালের পথ গঙ্গাপথের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না থাকায় ঐ পথে জলের গতি সেকেণ্ডে 8 ফুটের অধিক হবে না। অতএব ফীডার ক্যানালের পথে গঙ্গার জলের গতি হঠাৎ প্রায় অর্ধেক হওয়ায় দ্রুতহারে পলি ঝরে পড়ে ভাগীরথী-হুগলী ভরাট হয়ে যাবে। মনে রাখা দরকার নদীখাত গড়ে তোলার জন্য জলের পরিমাণ নয়, ধীর জলপ্রবাহ নয়, জলের গতিই সবচেয়ে বড় ভূমিকা গ্রহণ করে। এছাড়া ব্যারাজ নদীর জলতল উঁচু করে থাকে নদীতে জলের গতিকে কমিয়ে দিয়ে বা স্তব্ধ করে। কাজেই ব্যারাজের সাহায্যে নদীখাতের অবনতি ছাড়া উৎকর্ষ হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য ফরাক্কা ব্যারাজের ডানতীরে খালের স্লুইস (Head Regulator) দিয়ে জল না এনে যদি মূল ব্যারাজের 10-12টি

স্লুইসের জল পূর্বলব্ধ গতিসমেত সরাসরি ভাগীরথী-হুগলীর খাতে আনা যায়, তবে হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবন সম্ভব হতে পারে।

প্রশ্ন—হুগলী মোহানা একটি সামুদ্রিক খাড়ি। খাড়ি গড়ে ওঠার জন্য নদীপথে নেমে আসা জলের কোন প্রয়োজন আছে কি ?

উত্তর—হুগলী মোহানা থেকে সুবর্ণরেখা মোহানা পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলায় 80 মাইল দীর্ঘ এক বালুকাময় তটভূমি আছে, যেখানে রসুলপুরের নদী ছাড়া কোন নদী নেমে আসেনি। ঐ তটভূমি জোয়ার-ভাঁটায় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে সমুদ্র থেকে উঠে আসা পলিতে গড়ে উঠেছে এবং নদী না থাকায় খাড়ির অস্তিত্ব নেই সেখানে। এতেই বোঝা যায় যে, খাড়ি সৃষ্টির জন্য উচ্চভূমি থেকে নেমে আসা জল বা নদীর প্রয়োজন আছে। কাজেই হুগলী মোহানা থেকে মেঘনা মোহানা পর্যন্ত গঙ্গার বদ্বীপ অঞ্চলে যে অজস্র খাড়ি দেখতে পাই ; সেখানে কোন-না-কোন সময়ে গঙ্গার কোন শাখা, প্রশাখা বা উপশাখার অস্তিত্ব ছিল বা বর্তমানে আছে বলা যেতে পারে। এছাড়া কখনও কোন খাড়ি গঙ্গার সঙ্গে সংযোগ হারালে তা দু'তীরভূমি থেকে ধুয়ে আসা ও সমুদ্র থেকে উঠে আসা পলিতে দ্রুত ভরাট হয়ে যায়। কাজেই খাড়িগুলিতে সারা বৎসরে যে পলি জমে, তা সরিয়ে দিতে বন্যার জলের বা উচ্চভূমি থেকে নেমে আসা জলের একান্ত প্রয়োজন।

উচ্চভূমি থেকে বন্যার জল না পেলে নিম্নাংশে নদীগর্ভ বা খাড়ি যে কত দ্রুত ভরাট হয়ে যায়, তার অন্যতম উদাহরণ হল চব্বিশ পরগণা জেলার বিদ্যাধরী নদী ; বামনঘাটায় যে নদীগর্ভের গভীরতম অংশটির অবস্থান (Lowest river-bed level) ছিল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1883 সালে −58·69 ফুট, 1904 সালে—29·71 ফুট, 1936 সালে +5·75 ফুট এবং বর্তমান নদীগর্ভ দু'তীরভূমির চেয়েও উঁচু।

প্রশ্ন—হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবনে গঙ্গার বন্যার জল ছাড়া দামোদরের বন্যার জলের প্রয়োজন কেন ?

উত্তর—উনবিংশ শতাব্দীতে ভাগীরথী, জলঙ্গী ও চূর্ণীর পথে গঙ্গা থেকে বর্ষাকালে 3 লক্ষ কিউসেক জলপ্রবাহ আসত আর দামোদরের পথে নামত 4-5 লক্ষ কিউসেকের বন্যা। ঐ বন্যাগুলির জল হুগলী মোহানার পলি সরিয়ে দিয়ে নদীকে গভীর রাখত। কিন্তু উৎস থেকে গেঁওখালি পর্যন্ত ভাগীরথী-হুগলীর মাইল প্রতি গড় ঢাল যেখানে মাত্র 3 ইঞ্চি, দুর্গাপুর থেকে গেঁওখালি পর্যন্ত দামোদরের পথের গড় ঢাল সেখানে মাইল প্রতি 1 ফুট। আবার গেঁওখালি থেকে নদীপথে 275 মাইল দূরবতী ভাগীরথীর উৎসে গঙ্গার জলের গতি বন্যার সময় যেখানে সেকেণ্ডে 16 ফুট, সেখানে গেঁওখালি

থেকে মাত্র 140 মাইল দূরবর্তী দুর্গাপুরে দামোদরের বন্যার জলের গতি সেকেণ্ডে 25 ফুট। কাজেই নদী-উপত্যকার ঢাল, পথের দূরত্ব ও সরলতা এবং জলের গতি সবদিক থেকে দামোদরের বন্যার জলের খাত কাটানোর ক্ষমতা গঙ্গার বন্যার চেয়ে বহুগুণ বেশী। একারণে হুগলী মোহানার পলি সরিয়ে দিতে গঙ্গার বন্যার চেয়ে দামোদরের বন্যার গুরুত্ব অধিক।

প্রশ্ন—গঙ্গার অন্যান্য মোহানা থেকে হুগলী ও মাতলা মোহানা এত গভীর কেন ?

উত্তর—উপকূলভূমিতে সামুদ্রিক খাড়ি সৃষ্টিতে ও তা বজায় থাকতে উচ্চভূমি থেকে নেমে আসা জলের একান্ত প্রয়োজন আর সেই বন্যার জলের গতি যত তীব্র হবে, খাড়িতে পলি জমার হার তত কম হওয়ায় খাড়ি গভীর রয়ে যাবে। সৌভাগ্যবশত ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে আছে ছোটনাগপুরের মালভূমি, যেখান থেকে ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদরের পথে তীব্র গতির বন্যা নেমে আসে ভাগীরথীতে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত দামোদর নদ খাড়ি, বাঁকা বা বেহুলা নদীর পথ ধরে ত্রিবেণীর কিছু উত্তরে ভাগীরথীতে পতিত হত। তারপর ভাগীরথী ও দামোদরের মিলিত ধারা ত্রিবেণী থেকে তিনটি পথে বয়ে যেত—গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী। গঙ্গা ও সরস্বতী কলিকাতার কাছে বেতড়ে মিলিত হয়ে আবার দ্বিধা বিভক্ত হত। এদের জলরাশি নিম্নাংশে বর্তমান হুগলী মোহানা দিয়ে নামত। আবার ভাগীরথী ও দামোদরের বন্যাগুলির একাংশ যমুনার পথ ধরে এগিয়ে চলত এবং যমুনার শাখানদী সুন্তী, নোনাগাঙ, কুলটিগাঙ প্রভৃতির খাত ধরে বিদ্যাধরী নদীতে সঞ্চারিত হয়, যা নিম্নাংশে মাতলা নদীতে তার জলধারার একাংশ ঢেলে দিত। একারণে মাতলা-বিদ্যাধরীর খাত এককালে গভীর ছিল। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত হুগলী নদীতে শুধু ভাগীরথী, জলঙ্গী ও চূর্ণীর পথে গঙ্গার জল আসত না, তার সঙ্গে ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ ও কংসাবতীর পাহাড়ী বন্যাগুলি নামত। ফলে যখন ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টি হত, তখন একযোগে দামোদরের পথে 4-5 লক্ষ কিউসেক ও অন্যান্য তিনটি নদীপথের প্রত্যেকটিতে 1·5 লক্ষ কিউসেক হারে মোট ৪-9 লক্ষ কিউসেকের হঠাৎ তীব্রগতির বন্যা ভাগীরথী-হুগলীতে নামত। এ কারণে হুগলী মোহানার সমুদ্রের গর্ভ সহজে ভরাট হতে পারে নি এবং তা গঙ্গার অন্যান্য মোহনা [মাতলা মোহানা ব্যতীত] থেকে গভীর রয়ে গেছে। সেজন্য যেখানে হুগলী নদীপথে কলিকাতা পর্যন্ত সমুদ্রগামী জাহাজ আসতে পারে, সেখানে গড়াই-মধুমতী এমন কি মেঘনার পথে বড় জাহাজ যাতায়াত করতে পারে না।

প্রশ্ন—হুগলী নদীকে বাঁচিয়ে না তুললে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কিরূপ হবে ?

উত্তর—দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ নদীই পূর্ব বা পশ্চিম থেকে এসে হুগলী নদীতে তাদের জলরাশি ঢেলে দিয়েছে, অর্থাৎ হুগলী নদীকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ধমনী বলা চলে। পশ্চিমবঙ্গের দশটি জেলা ও বিহারের ছোটনাগপুরের মালভূমির এক বিরাট অঞ্চল নিয়ে প্রায় 30 হাজার বর্গমাইল এলাকার একমাত্র জলনিকাশী পথ হল এই হুগলী নদী। এছাড়া এই নদীর তীরে গড়ে উঠেছে পূর্বভারতের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চল ও বন্দর কলিকাতা এবং হলদিয়া। কাজেই হুগলী নদীকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের প্রাণস্বরূপ বলা যায়। হুগলী নদীকে বাঁচিয়ে না তুলে ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, যমুনা, কংসাবতী প্রভৃতি যে কোন নদীসংস্কার প্রকল্প গ্রহণ করলে, তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। হুগলী নদীর মৃত্যু হলে শুধু শিল্পাঞ্চলসহ কলিকাতা ও হলদিয়া বন্দর দুটি ধ্বংস হবে তাই নয়; [অবশ্য কলিকাতা থেকে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত 75 মাইল দীর্ঘ জাহাজ-চলাচলের উপযোগী একটি খাল দ্বারা কলিকাতা বন্দরটিকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব।] ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে বিভিন্ন নদীপথে নেমে আসা বন্যার জলে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ডুবে থাকবে এবং ভবিষ্যতে জলাভূমিতে পরিণত হয়ে মনুষ্য-বাসের অনুপযোগী হয়ে উঠবে। এতে এই অঞ্চলের প্রায় 5 কোটি মানুষ তাদের জীবন ও জীবিকা হারাবে। কাজেই পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্ব-ভারতের উন্নয়ন প্রকল্পে হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। অতীতে হুগলী মোহানায় বা সামুদ্রিক খাড়িতে ঝরে পড়া পলি জমাট বাঁধার আগেই বর্ষাকালে ধুয়ে যেত পূর্বে আলোচিত সাতটি নদীর বন্যায়। কাজেই হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবনের জন্য অনুরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে অবিলম্বে; [ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত] কারণ হুগলী মোহানা এতই বিস্তৃত ও গভীর যে, এই মোহানার গর্ভে পলি একবার জমাট বেঁধে গেলে তা সরিয়ে দেওয়া প্রায় অসম্ভব। মনে রাখতে হবে, হুগলী নদী একটি নদী নয়, সাতটি নদীর সমাহার,—সেই সাতটি নদী হল, ভাগীরথী, জলঙ্গী, চূর্ণী, ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর ও কংসাবতী। এ যেন সাত রঙে রঙা এক সুদৃশ্য রামধনু। সেই সাতটি নদী থাকবে না, অথচ হুগলী নদী থাকবে; এ আশা কি দুরাশা নয় ?

N.B. 69 পৃষ্ঠার মানচিত্রটি রেণেলের মানচিত্র অবলম্বনে অঙ্কিত। উহা মূল মানচিত্রের প্রতিলিপি নহে। 105 পৃষ্ঠায় 22 ছত্রে (40) পরিবর্তে (403) হবে।

1 হেক্টর = 2·47 একর = 7·3 বিঘা, 1 একর = 4,840 বর্গগজ,

1 একর ফুট = 43,560 ঘনফুট, 1 কিউসেক = সেকেণ্ডে 1 ঘনফুট।